'তৃতীয় বিশ্ব' শব্দটাই এমন সংবেদনশীল ; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য, তাদের সমস্যা এমনই গভীর আর ব্যাপক যে সে-সম্পর্কে এখানে আলোচনা করার কোথাও কোনো অবকাশ নেই। তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনাও এত স্বল্প পরিসরে কখনও সম্ভব নয়। কেননা 'তৃতীয় বিশ্ব' শব্দটারই মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে বিতর্কের বীজ। তৃতীয় বিশ্ব বলতে কি বোঝায়, কাদের নিয়ে এই তৃতীয় বিশ্ব ? এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার ভৌগোলিক সীমারেখার দ্বারা চিহ্নিত দেশগুলোই যদি তৃতীয় বিশ্ব হয়, তাহলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো সাহিত্য কি তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের উন্নততর দেশগুলোর তুলনায় অনগ্রসর দেশগুলোই যদি তৃতীয় বিশ্ব হয়, তাহলে চীন ও জাপানের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে কি তৃতীয় বিশ্বের অংশীদার হওয়া সম্ভব ? প্রাজ্ঞজনের পক্ষে এই সব বিতর্কের সমাধান নিশ্চয়ই সম্ভব, আমরা শুধু তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য সম্পর্কে তার চরিত্রলক্ষণকেই বেশি প্রাধান্য দিতে চেয়েছি।

খুব সংক্ষেপে বলা যায়—স্পেনের গৃহযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তামাম দুনিয়া জুড়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে, তারই প্রতিফলন দেখি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়—মননে, গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে যা ঐশ্বর্যময়। বিপুল এই ঐশ্বর্যের কতটুকুকে স্থান দেওয়া সম্ভব এই একটি মাত্র সংকলনে, যেখানে একমাত্র আফ্রিকা মহাদেশেরই দেশের সংখ্যা পঞ্চষট্টি এবং তৃতীয় বিশ্বের একশোরও বেশি। আর একটা দেশের একটি মাত্র গল্প কখনই তা প্রতিনিধিস্থানীয় হতে পারে না। আবার একশোটা দেশের একশোটা একক সংকলন যথেষ্ট নাও মনে হতে পারে। ফলে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়। তাই 'তৃতীয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প' বলতে, সাধারণ অর্থেই, সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধিস্থানীয় কিছু লেখকের ভালো গল্পকেই বোঝাতেই চেয়েছি, যাতে পাঠককে তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা গড়ে দেওয়া যায়, কেননা বাংলায় এই ধরনের সংকলন এটাই প্রথম। আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বৈপ্লবিক চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত রূঢ় বাস্তবধর্মী, জীবনমুখীন গল্পগুলোকেই বেশি প্রাধান্য দিতে, তবে অনন্য আঙ্গিকে ভিন্ন স্বাদের গল্পগুলোকেও একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

আপাতত ল্যাটিন আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশ থেকে মোট আটাশটা দেশের ছোট-বড় গল্প নিয়ে এই সংকলন। আগ্রহী পাঠকদের ভাল লাগলে ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি খণ্ডে 'তৃতীয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প' প্রকাশের ইচ্ছে রইলো।

অসিত সরকার
দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

শিকারী

অলিভ শ্রেইনার

দক্ষিণ আফ্রিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক অলিভ এমিলি অ্যালবার্টিনা শ্রেইনারের জন্ম ১৮৬২ সালে কেপ প্রদেশের একটি যাজক পরিবারে। শৈশব এবং ছাত্রজীবন কাটে এখানেই। ১৮৮১-১৮৮৯ পর্যন্ত লণ্ডনে বসবাস করেন। ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত 'দি স্টোরি অফ্ অ্যান আফ্রিকান ফার্ম' গ্রন্থটি তাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতীয় দর্শনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল এই প্রতিভাময়ী সাহিত্যিকের মৃত্যু ঘটে ১৯২০ সালে। 'ড্রিম' ১৮৯১ এবং 'স্টোরিস' ১৯২০ তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন।

সে এক উপত্যকার দেশ। সেই উপত্যকায় ছিলো এক শিকারী। প্রতিদিন সে বন-মোরগ শিকার করতে জঙ্গলে যেতো। ঘটনাচক্রে একদিন সে বিরাট এক হ্রদের কাছে গিয়ে হাজির হলো। সেখানে পাখি আসবে বলে সে যখন শরবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, তখন বিশাল এক ছায়া এসে পড়লো তার ওপরে—জলের মধ্যে একটা প্রতিবিম্বও দেখতে পেলো সে। শিকারী আকাশ পানে তাকালো, কিন্তু জিনিসটা ততোক্ষণে চলে গেছে। তবু জলের আরশিতে দেখা সেই প্রতিবিম্বটা দেখতে পাবার এক জলন্ত বাসনা মানুষটাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেললো। সারাটা দিন সে চোখ খোলা রেখে অপেক্ষা করে রইলো। রাত এলো, কিন্তু সে আর ফিরে এলো না। শূন্য থলে আর বিষণ্ণ মন নিয়ে বাড়িতে ফিরে গেলো শিকারী, মুখে কোনো কথা নেই। সঙ্গী-সাথীরা এসে তার নিশ্চুপতার কারণ জানতে চাইলো, মানুষটা কোনো জবাব দিলো না—একা একা বসে ভাবতে লাগলো আপন মনে। তারপর এলো তার বন্ধু। বন্ধুকে সে বললো, 'আজ আমি এমন একটা জিনিস দেখেছি যা এর আগে আর কোনোদিনও দেখিনি। দেখলাম, বিশাল একটা সাদা পাখি রুপোলি ডানা ছড়িয়ে অনন্ত নীল আকাশে উড়ে চলেছে। সেই থেকে মনে হচ্ছে, আমার বুকের মধ্যে যেন একটা দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমি যা দেখেছি তা শুধু একটা উজ্জ্বল দীপ্তি, একটা ঝলমলে ঐশ্বর্য—জলের বুকে একটা প্রতিবিম্ব। কিন্তু এখন আমি ওকে যেমন আপন করে অধিকার করতে চাই, পৃথিবীতে আর কোনো কিছুই তেমন করে চাই না।'

বন্ধুটি হাসলো। বললো, 'ওটা জলের বুকে ঝলসে ওঠা আলোর রেখা মাত্র। কিংবা তোমার নিজেরই চিন্তার ছায়া। আগামী কালই তুমি ওকে ভুলে যাবে।'

কিন্তু কাল, তারপর পরশু, তারপর তার পরের দিনও শিকারী বৃথাই একা একা ঘুরে বেড়ালো। খুঁজে মরলো বনেজঙ্গলে, হ্রদের ধারে আর শরবনের গভীরে। তবু কোথাও তাকে খুঁজে পেলো না। কোনো বুনো পাখিই সে আর শিকার করলো না। করে কি লাভ?

'কিসে এতো কষ্ট পাচ্ছে মানুষটা?' সঙ্গীরা বলাবলি করে।

'ও পাগল হয়ে গেছে,' একজন জবাব দেয়।

'না, ওর অবস্থা তার চাইতেও খারাপ।' অন্য একজন বলে, 'আমরা কেউই যা দেখিনি, ও তা দেখতে চায় এবং তা দেখে ও নিজেকে একটা আজব মানুষ করে তুলতে চায়।'

সবাই তখন বলে, 'তাহলে এসো, আমরা ওর সঙ্গ ত্যাগ করি।'

শিকারী তাই একা একাই ঘুরে মরে।

একদিন রাতে বড়ো নিবিড়-বিষণ্ণ মনে কাঁদতে কাঁদতে সে যখন এক ছায়াময় অঞ্চল দিয়ে হেঁটে চলেছে তখন মানবপুত্রের চাইতে সুন্দর আর দীর্ঘতর চেহারার এক বৃদ্ধ তার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'কে তুমি?' জিগেস করলো শিকারী।

'আমি 'প্রাজ্ঞতা', কিন্তু কেউ কেউ আমাকে 'জ্ঞান' বলে।' বৃদ্ধ বললেন, 'সারাটা জীবন আমি এই উপত্যকার দেশেই রয়েছি, কিন্তু বহু-বেদনায় বাঁকিত থাকলে কেউ আমাকে দেখতে পায় না। যে চোখ আমাকে দেখবে, তাকে অশ্রু দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। যে মানুষ যেমন দুঃখ ভোগ করে, আমি তার সঙ্গে তেমনি করে কথা বলি।'

শিকারী তখন কেঁদে কেঁদে বললো, 'তুমি তো কতো দীর্ঘ দিন ধরে এখানে বাস করছো। তুমি আমাকে বলে দাও, যে বিশাল বুনো পাখিটাকে আমি নীল আকাশের বুকে উড়ে যেতে দেখেছি, সে কোন্ পাখি? সবাই আমাকে বিশ্বাস করাতে চায়, ওটা একটা স্বপ্ন—ওটা আমার নিজেরই চিন্তার ছায়া।'

বৃদ্ধ মৃদু হাসলেন, 'তার নাম 'সত্য'। যে তাকে একবার দেখেছে, সে আর কোনোদিনও শান্ত হতে পারে না—মৃত্যু পর্যন্ত তাকে কামনা করে।'

শিকারী চিৎকার করে বললো, 'তুমি বলে দাও, কোথায় গেলে আমি তার সন্ধান পাবো।'

কিন্তু বৃদ্ধ বললেন, 'তুমি এখনও যথেষ্ট দুঃখভোগ করোনি।'

তিনি চলে গেলেন। শিকারী তখন নিজের বুকের ভেতর থেকে তার কল্পনার মাকুটা বের করে, তা দিয়ে তার বাসনার সুতো কাটলো। তারপর সারারাত বসে

বসে সেই সুতো দিয়ে একটা জাল বুনলো। সকালবেলা সেই সোনালি রঙের জাল সে খোলা জমিতে বিছিয়ে দিয়ে তার মধ্যে কয়েক দানা সহজ-বিশ্বাস ছড়িয়ে দিলো। ওগুলো তার বাবা তার জন্যে রেখে গিয়েছিলেন, এতোদিন ওগুলো সে বুকপকেটেই রেখে দিয়েছিলো। ওগুলোকে দেখতে গোল গোল ছত্রাকের মতো, ওগুলোকে মাড়িয়ে গেলে বাদামি রঙের ধুলো ওড়ে। এরপর কি হয় দেখার জন্যে শিকারী মানুষটা সেখানেই বসে রইলো।

জালে প্রথমে এলো একটা তুষার-ধবল পাখি। মিটিমিটি তার চোখ। সুন্দর একটা গান গাইলো সে। গাইলো: 'এক মানব-দেবতা! এক মানব দেবতা! এক মানব-দেবতা!' তারপর এলো কালো রঙের এক রহস্যময় পাখি। সুন্দর দুটি কালো চোখ মেলে সে যেন আত্মার অন্তঃপুর পর্যন্ত দেখে নিতে পারে। সে শুধু গাইলো: 'অমরত্ব!'

শিকারী ওদের দুজনকে হাতে তুলে নিয়ে বললো, 'এরা নিশ্চয়ই সত্যের সুন্দর পরিবারের প্রতিনিধি।'

তারপর এলো আরও এক পাখি। সবুজ আর সোনালি তার রঙ। হাটেবাজারে চিৎকৃত কণ্ঠস্বরের মতো কর্কশ গলায় সে গাইলো: 'মৃত্যুর পরে পুরস্কার! মৃত্যুর পরে পুরস্কার!'

শিকারী বললো, 'তুমিও সুন্দর, কিন্তু ততো সুন্দর নও।'

ওই পাখিটাকেও তুলে নিলো সে।

শস্যকণাগুলো শেষ না হওয়া অব্দি আরও অনেক পাখি এলো শিকারীর জালে। ঝলমলে তাদের রঙ। সুন্দর গান শোনালো তারা। শিকারী তখন সব কটা পাখিকে একত্রে জড়ো করে, 'নতুন ধর্মমত' নামে শক্তপোক্ত একটা লোহার খাঁচা তৈরি করে, তাতে তার সবকটা পাখিকে রেখে দিলো।

তখন দেশের সমস্ত মানুষ নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে সেখানে এলো। চিৎকার করে তারা বললো, 'ওগো, মহান শিকারী! ওগো, আশ্চর্য মানুষ! আহা, কি অপূর্ব পাখি! ওহো, কি সুন্দর গান!'

কেউ জিগেস করলো না পাখিগুলো কোত্থেকে এসেছে, কি করে ওদের ধরা হয়েছে। তারা শুধু শিকারীর সামনে নাচলো আর গাইলো। শিকারীও খুব খুশি। সে বললো, 'সত্য নিশ্চয়ই এদের মধ্যে আছে। যথাসময়ে সে পালক খসিয়ে ফেলবে, তখন আমি তার তুষার-ধবল রূপটি দেখতে পাবো।'

কিন্তু সময় কেটে যায়। সবাই নাচে-গায়, অথচ শিকারীর মনটা ক্রমশ ভারি হয়ে ওঠে। কাঁদার জন্যে বুড়োদের মতো সে গুঁড়ি মেরে অন্যদের কাছ থেকে দূরে

সরে যায়। সেই ভয়ঙ্কর বাসনাটা ফের তার বুকের মধ্যে জেগে ওঠে। একদিন সে একা একা বসে কাঁদছে, হঠাৎ প্রাজ্ঞতা সেখানে এসে হাজির। শিকারী তখন বৃদ্ধকে জানালো, এতোদিন সে কি করেছে।

প্রাজ্ঞতা তাই শুনে বিষণ্ণ হাসলেন।

'অনেক মানুষই সত্যকে ধরার জন্যে ওই জাল পেতেছে, কিন্তু কোনোদিনই তাকে ধরতে পারেনি।' বৃদ্ধ বললেন, 'সহজ-বিশ্বাসের শস্যকণা সে গ্রহণ করে না, বাসনার জালে তার পা বাঁধা যায় না, এই উপত্যকার দেশে সে কোনোদিনও নিঃশ্বাস গ্রহণ করে না। যে পাখিগুলোকে তুমি ধরেছো, তারা মিথ্যার সন্ততি। ওরা সুন্দর, ওরা মনোরম—কিন্তু তাহলেও ওরা মিথ্যা। সত্যের সঙ্গে ওরা সম্পর্কবিহীন।'

শিকারী তখন অসীম তিক্ততায় চিৎকার করে বললো, 'তবে কি এই দুরন্ত আগুনে জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হবার জন্যে আমি নিশ্চল হয়ে বসে থাকবো?'

'শোনো,' বৃদ্ধ বললেন, 'এতোদিনে তুমি অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছো, অনেক কান্না কেঁদেছো। তাই আমি যা জানি তা তোমাকে বলছি, শোনো। সত্যের সন্ধানে যে বেরুবে তাকে কুসংস্কারের এই উপত্যকাগুলোকে চিরদিনের মতো ত্যাগ করে চলে যেতে হবে—এখানকার সামান্যতম জিনিসও সে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। একা একা তাকে নেমে যেতে হবে শর্তবিহীন চরম অস্বীকার আর অগ্রাহ্যের দেশে। সেখানে প্রলোভনকে প্রতিরোধ করে তাকে প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। তারপর আলো ফুটলে, সেই আলো অনুসরণ করে তাকে চলে যেতে হবে রসহীন উজ্জ্বল সূর্য-রশ্মির দেশে। সেখানে তার সামনে জেগে উঠবে কঠোর বাস্তবের দুর্গম পর্বতমালা। সেই পাহাড়গুলো তাকে পেরিয়ে যেতে হবে—তার ওধারেই আছে সত্য।'

'অভিযাত্রী তখন শক্ত করে তাকে আঁকড়ে ধরবে,' শিকারী উঁচু গলায় বললো, 'দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরবে সত্যকে!'

প্রাজ্ঞতা মাথা নাড়লেন, 'সে কোনোদিনই তাকে দেখতে পাবে না, ধরতেও পারবে না। এখনও সময় হয়নি।'

'তাহলে কি কোনো আশাই নেই?' শিকারী চিৎকার করে উঠলো।

'আছে,' প্রাজ্ঞতা বললেন। 'কোনো কোনো মানুষ ওই দুস্তর পাহাড়গুলোতে উঠেছে। নগ্ন পাহাড়ের বৃত্তের পরে বৃত্ত পেরিয়ে গেছে তারা। সেই সুউচ্চ বন্ধুর অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো সত্যের ডানা থেকে খসে পড়া এক-আধটা রুপোলি-শুভ্র পালকও কুড়িয়ে নিয়েছে।' দৈববাণী-ঘোষকের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ, তারপর আকাশের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন, 'কোনো মানুষ যদি যথেষ্ট পরিমাণে সেই রুপোলি পালক কুড়িয়ে নিয়ে তা দিয়ে

সুতো কাটতে পারে এবং সেই সুতো দিয়ে যদি সে কোনো জাল বুনতে পারে—তবে সেই জালেই সত্যকে ধরা যেতে পারে। সত্য বিনা অন্য কিছু দিয়েই সত্যকে ধরা যায় না।'

শিকারী উঠে দাঁড়ালো, 'আমি যাবো।'

'ভালো করে শুনে নাও,' প্রাজ্ঞতা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'যে এই উপত্যকাগুলো ছেড়ে চলে যায়, সে আর কোনোদিনও এখানে ফিরে আসতে পারে না। সীমান্তের ওধারে গিয়ে সাত দিন সাত রাত্রি কেঁদে কেঁদে রক্তের অশ্রু বইয়ে দিলেও সে আর কোনোদিন এধারে পা ফেলতে পারবে না। একবার ছেড়ে যাবার অর্থ, চিরতরে পরিত্যক্ত হওয়া। যে পথে তুমি যাবে সে পথ-পরিক্রমায় কোনো পুরস্কার নেই। যে যায়, সে স্বেচ্ছায় যায়—নিজের মধ্যে জমে থাকা অপার প্রেমের তাগিদে যায়। কর্মই তার পুরস্কার।'

'আমি যাবো!' শিকারী বললো, 'কিন্তু তুমি আমাকে বলে দাও, ওই পাহাড়-গুলোতে গিয়ে কোন্ পথ ধরে আমি চলবো?'

'আমি যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত জ্ঞানের সন্তান। অনেক মানুষ যে পথ মাড়িয়ে গেছে, আমি শুধু সেই পথ ধরেই চলতে পারি। ওই পাহাড়গুলোতে খুব কম মানুষেরই পদচিহ্ন পড়েছে। ওখানে পৌঁছে প্রত্যেকেই নিজের মতো করে পথ খুঁজে নেয়। তখন আমার কণ্ঠস্বর সে আর শুনতে পায় না। আমি তাকে অনুসরণ করতে পারি, কিন্তু তার আগে আগে যেতে পারি না।'

প্রাজ্ঞতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শিকারী ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর খাঁচাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে সবল দুই বাহুর চাপে ভেঙে ফেললো খাঁচার গরাদগুলোকে—অমসৃণ লোহার আঘাতে ছিন্ন হলো তার মাংসপেশী।...কখনও-সখনও গড়ার চাইতে ভাঙা অনেক বেশি কঠিন হয়ে ওঠে।

শিকারী একে একে তার পাখিগুলোকে খাঁচা থেকে বের করে উড়িয়ে দিলো। কিন্তু সেই সুন্দর কালো পাখিটাকে হাতে ধরে সে তার অপরূপ কালো চোখ দুটির দিকে তাকাতেই পাখিটা নিচু পর্দায় গম্ভীর সুরে বলে উঠলো, 'অমরত্ব!'

শিকারী তখন বললো, 'আমি ওকে ত্যাগ করতে পারবো না। ও ওজনে ভারি নয়, ও কিছু খায় না—আমি ওকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবো। ওকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।' পাখিটাকে বুকের কাছে রেখে, নিজের চাদর দিয়ে ওকে ঢেকে নিলো সে।

কিন্তু বুকের কাছে লুকিয়ে রাখা পাখিটা ক্রমশ ভারি, আরও ভারি হতে হতে শেষ অব্দি একেবারে সীসের মতো ভারি হয়ে উঠলো। ওকে নিয়ে সে আর চলতে

পারে না। ওকে নিয়ে তার পক্ষে ওই উপত্যকা ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। ফের পাখিটাকে বের করে ওর দিকে তাকালো সে।

'ওগো সুন্দর, আমার প্রাণের আপন—তোমাকে কি আমি নিজের কাছে রাখতে পারবো না?' বিষণ্ণ মনে হাতের মুঠো খুলে দিলো শিকারী, 'যাও! হয়তো সত্যের সঙ্গীতের মধ্যে একটা সুর তোমার গানের মতো হবে। কিন্তু আমি তা কোনোদিন শুনবো না।'

বিষণ্ণ মনে সে তার হাতের মুঠো খুললো আর পাখিটা চিরদিনের মতো তার কাছ থেকে উড়ে চলে গেলো।

তারপর কল্পনার মাকু থেকে বাসনার সুতোগুলো বের করে শিকারী সেগুলোকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো, শুধু শূন্য মাকুটা রেখে দিলো নিজের বুকের মধ্যে—কারণ সুতোগুলো সে ওই উপত্যকায় বুনেছে, কিন্তু মাকুটা এসেছিলো কোনো এক অজানা দেশ থেকে।

উপত্যকা থেকে চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো মানুষটা, কিন্তু তখনই গজন করতে করতে ছুটে এলো সকলে।

'নির্বোধ, নিচ, উন্মাদ!' ওরা চিৎকার করে বললো, 'কোন সাহসে তুই তোর খাঁচা ভেঙে পাখিগুলোকে উড়িয়ে দিয়েছিস?'

শিকারী কিছু বললো, কিন্তু কেউ তার কোনো কথা শুনলো না।

'সত্য! কে সে? তাকে তুই খেতে পারবি? পান করতে পারবি? কে দেখেছে তাকে? তোর পাখিগুলো ছিলো বাস্তব, সবাই তাদের গান শুনেছে। কিন্তু সত্য?' ওরা উচ্চকিত স্বরে বললো, 'হায়রে নির্বোধ, ইতর, নাস্তিক—তুই বাতাসকে কলুষিত করে তুলছিস!'

কেউ কেউ গর্জে উঠলো, 'এসো, আমরা ওকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারি!'

অন্যেরা বললো, 'ও যা করেছে তাতে আমাদের কি এমন এসে-গেছে? যেতে দাও হতছাড়া বুদ্ধুটাকে!'…তারা চলে গেলো, কিন্তু অন্যেরা নুড়ি আর কাদা তুলে ছুঁড়ে মারতে লাগলো তার দিকে। শেষ পর্যন্ত কেটে-ছড়ে যাওয়া কালশিরে পড়া শরীরটাকে নিয়ে শিকারী গুঁড়ি মেরে অরণ্যে ঢুকে পড়লো। তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে তার চতুর্দিক জুড়ে।

যেতে যেতে যেতে ছায়া গাঢ়তর হলো—মানুষটা তখন যে সীমান্তে গিয়ে পৌঁছলো, তার ওধারেই চিররাত্রির দেশ। সেখানে পা ফেলে মানুষটা দেখলো, কোথাও কোনো আলো নেই। অন্ধকারে যেদিকে সে হাত বাড়ায়, প্রতিটা শাখাই ভেঙে পড়ে। পায়ের নিচে অঙ্গারের আস্তরণ। প্রতিটা পদক্ষেপেই তার পা ডুবে

যায়, অতি সূক্ষ্ম ভস্মের রেণু হালকা মেঘের মতো উড়ে এসে তার মুখে ছড়িয়ে পড়ে। চতুর্দিকে অন্ধকার। একটা পাথরের ওপরে বসে দু হাতের অঞ্জলিতে মুখ ঢাকলো শিকারী, আলোর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে লাগলো সেই অস্বাকার আর অগ্রাহ্যের দেশে।

তার হৃদয়েও তখন রাত্রির ছায়া।

তারপর শিকারীর ডান দিক আর বাঁ দিকের জলাভূমি থেকে হিমেল কুয়াশারা উঠে এসে তাকে ঘিরে ফেললো। রেণু রেণু বৃষ্টির কণা ঝরতে লাগলো অন্ধকারে, জমে উঠলো তার চুলে আর পোশাকে। মানুষটার হৃৎস্পন্দনের গতি তখন মন্থর, অসাড়তা ছড়িয়ে পড়ছে তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জুড়ে। চোখ তুলে মানুষটা দেখলো, দুটো খুশিয়াল আলোর বিন্দু নাচতে নাচতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে, ক্রমশ আরও কাছে। কি উষ্ণ, কি উজ্জ্বল! যেন আগুনে-নক্ষত্রের মতো নাচছে ওরা। অবশেষে ওরা তার সামনে এসে দাঁড়ালো। সেই বিকিরিত শিখা দুটির একটার কেন্দ্রবিন্দু থেকে একটি হাস্যময়ী রমণীর মুখ ফুটে উঠলো—তার গালে টোল, মাথায় ধূমায়িত হলদে চুল। অন্যটির কেন্দ্রে খুশিয়াল হাসির তরঙ্গ—ঠিক সুরাপাত্রের বুদ্বুদের মতো। ওরা নাচতে লাগলো শিকারীর সামনে এসে।

'কে তোমরা?' শিকারী প্রশ্ন করলো, 'কে তোমরা এসেছো আমার এই নিঃসঙ্গতা আর অন্ধকারে?'

'আমরা যমজ ভোগ-বাসনা,' ওরা উঁচু গলায় বললো। 'আমাদের পিতার নাম 'মানব প্রকৃতি' আর 'অপরিমিতা' আমাদের মা। আমরা নদী-পাহাড়ের সমবয়সী, আমাদের বয়স পৃথিবীর প্রথম মানুষটির সমান। কিন্তু আমাদের মৃত্যু নেই।' ওরা হাসলো।

'এসো, আমি দু হাত দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরি!' প্রথম জন চিৎকার করে বললো, 'আমার হাত কোমল আর উষ্ণ। তোমার হৃৎপিণ্ড এখন হিমায়িত হয়ে গেছে, কিন্তু আমি তাকে স্পন্দিত করে তুলবো। এসো আমার কাছে!'

'আমি আমার উষ্ণ জীবনধারা তোমার মধ্যে ঢেলে দেবো,' দ্বিতীয় জন বললো। 'তোমার মস্তিষ্ক এখন অসাড়, প্রাণহীন হয়ে আছে তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো। কিন্তু তুমি দেখো, তারা এক দুরন্ত মুক্ত-জীবনে প্রাণময় হয়ে উঠবে। এসো, তোমার মধ্যে ঢালতে দাও আমার জীবনধারা!'

'তুমি আমাদের সঙ্গে এসো, আমাদের সঙ্গে বাঁচো।' ওরা উচ্ছকিত স্বরে বললো, 'তোমার চাইতে অনেক বেশি মহত্তর হৃদয় প্রতীক্ষা করবে বলে এই অন্ধকারে এসে বসেছে। কিন্তু শেষ অব্দি তারা আমাদের কাছেই এসেছে, আমরাও তাদের কাছে

গিয়েছি। তারা কোনোদিনও আমাদের ছেড়ে যায়নি, কোনোদিনও না। অন্য সব কিছুই মোহ-বিভ্রান্তি—শুধু আমরাই আসল, আমরাই বাস্তব। সত্য আসলে একটা ছায়া, কুসংস্কারের উপত্যকা একটা প্রহসন মাত্র, পৃথিবীটা ভস্ম দিয়ে গড়া আর গাছ-পালাগুলো ক্ষয়িষ্ণু। কিন্তু আমরা···ছুঁয়ে ছাখো, আমরা প্রাণময়। ধরে ছাখো, কি উষ্ণ আমরা! এসো, আমাদের কাছে এসো! এসো আমাদের সঙ্গে!'

ক্রমশ তারা কাছে, আরও কাছে এসে শিকারীর মাথার চারধারে ভেসে বেড়াতে লাগলো। শিকারীর কপালে জমে থাকা হিমবিন্দুগুলো এবারে গলে গেলো, উজ্জ্বল আলো ঝলসে উঠলো তার চোখ দুটিতে, হিমায়িত রক্তস্রোত ফের ছুটতে লাগলো তার সর্বাঙ্গের শিরায় শিরায়।

'হ্যাঁ, যাবো! কেন আমি এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে বসে বসে মরবো?' শিকারী চিৎকার করে বললো, 'ওরা উষ্ণ, ওরা আমার হিমায়িত রক্তকে তরল করে দিয়েছে!' ওদের দিকে হাত বাড়ালো সে।

কিন্তু তখনই মুহূর্তের মধ্যে তার সামনে তার প্রেয়সীর ছবি জেগে উঠলো, বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ফের নেমে এলো তার শরীরের পাশে।

ওরা চিৎকার করে বললো, 'এসো, আমাদের সঙ্গে এসো।'

কিন্তু মানুষটা দু হাতে মুখ লুকোলো। বললো, 'তোমরা আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছো, আমার হৃদয়কে উষ্ণ করেছো। কিন্তু আমি যা চাই, তোমরা আমাকে তা দিতে পারবে না। আমি তাই অপেক্ষা করবো—মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। তোমরা যাও!'

মানুষটা নিজের করতলে মুখ ঢেকে রাখলো, ওদের কোনো কথাই সে শুনবে না। ফের যখন সে চোখ তুলে তাকালো, তখন ওরা দুজনে দুটি ঝিলমিলে নক্ষত্র হয়ে অনেক দূরে উধাও হয়ে গেছে।

গড়িয়ে চললো দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ রাত।

কুসংস্কারের উপত্যকা যারা ছেড়ে চলে আসে, তাদের প্রত্যেককেই ওই অন্ধকারের দেশ পেরিয়ে যেতে হয়। কেউ তা পেরিয়ে যায় কয়েকদিনে, কেউ থাকে কয়েক মাস বা কয়েক বছর—আর কেউ কেউ ওখানেই মৃত্যুকে বরণ করে।

অবশেষে দিগন্তের কোলে এক টুকরো অস্পষ্ট আলোর দিশা জেগে উঠলো। তাকে অনুসরণ করে ঝলমলে সূর্যরশ্মির দেশে পৌঁছে গেলো শিকারী। এবারে তার সামনে জেগে উঠলো নীরস বাস্তবের রূঢ় পর্বতমালা। তাদের সর্বাঙ্গে রৌদ্রের খেলা, শিখরগুলো হারিয়ে গেছে মেঘমালার আড়ালে। তাদের পাদদেশ থেকে অনেক পথ উঠে গেছে ওপরের দিকে।

এক উচ্ছ্বসিত আনন্দের চিৎকারে মুখর হয়ে উঠলো শিকারী। সব চাইতে সরাসরি পথটা বেছে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে শুরু করলো সে, শিলা আর শৈলশিরায় প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো তার সঙ্গীতের সুর। সে ভাবলো, সবাই অতিরিক্ত বাড়িয়ে বলেছে···আসলে পাহাড়টা তেমন উঁচু নয়, পথটাও তেমন খাড়াই নয়। সামান্য কয়েকটা দিন, কয়েক সপ্তাহ, বড়োজোর কয়েক মাস—তারপরেই চূড়া! একটা নয়—অন্য অভিযাত্রীদের আবিষ্কার করা সবকটা পালকই সে কুড়িয়ে নেবে, জাল বুনবে, সত্যকে জয় করবে···তাকে সে শক্ত করে জড়িয়ে ধরবে, নিজের হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করবে···তাকে আঁকড়ে রাখবে!

ঝলমলে সোহাগী রোদে হেসে উঠলো শিকারী, গান গাইলো উঁচু গলায়। জয় একেবারে কাছাকাছি! কিন্তু একটু পরেই পথটা ক্রমশ খাড়াই হয়ে উঠলো। দম ফুরিয়ে আসতে লাগলো শিকারীর, গান গেলো বন্ধ হয়ে। তার ডান আর বাঁ ধারে এখন শৈবাল-ছত্রাকের চিহ্নবিহীন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাক্ষুসে শিলা, লাভার মতো পাথুরে জমিতে মুখব্যাদান করে রয়েছে নরকের মতো অতলান্ত ফাটল। এধারে-ওধারে কিছু কিছু সাদাটে অস্থির অস্তিত্বও দেখতে পেলো শিকারী। পথটাও ক্রমশ বিলীন হয়ে আসছে—তারপর সেটা একটা অস্পষ্ট রেখা হয়ে উঠলো···শুধু মাঝে মাঝে দু-একটা পদচিহ্ন। তারপর উধাও হয়ে গেলো সেটুকুও। এবারে নিজে থেকেই একটা পথ বেছে নিলো শিকারী, চলতে চলতে গিয়ে হাজির হলো বিশাল এক পাথুরে দেয়ালের সামনে। পাথরটা মসৃণ, কোথাও এতোটুকু ভাঁজ নেই, যতোদূর চোখ যায় সে উঠে গেছে অনন্ত আকাশের দিকে।

'এই পাথুরে দেয়ালে আমি একটা সিঁড়ি গড়ে তুলবো। একবার এই দেয়ালটা পেরিয়ে যেতে পারলেই আমি প্রায় পৌঁছে যাবো সেখানে।' বারের মতো কথা-গুলো বলে মানুষটা কাজ করতে শুরু করলো—তার কল্পনার মাকুটা দিয়ে পাথর কাটতে লাগলো একমনে। কিন্তু অর্ধেক পাথরে মাকু বসানো যায় না। নিচের ধাপ-গুলোর জন্যে সঠিক পাথর বাছা হয়নি বলে অর্ধেক মাস ধরে সে যতোটা সিঁড়ি গড়েছিলো, সেটা ফের ভেঙে পড়ে যায়। মানুষটা তবু কাজ করে যায় আর নিজের মনে বলে, 'একবার এই দেয়ালটাতে উঠতে পারলেই আমি প্রায় সেখানে পৌঁছে যাবো। এই বিরাট কাজটা শেষ হবে তখন।'

অবশেষে একদিন সে ওপরে উঠে এসে চারদিকে তাকালো। দূরে, অনেক নিচে সাদা কুয়াশা কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে কুসংস্কারের উপত্যকাগুলোতে—আর তার মাথার ওপরে রয়েছে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা। পাহাড়গুলোকে আগে অনেক নিচু বলে মনে হয়েছিলো, কিন্তু এখন মনে হলো অনন্ত ওদের উচ্চতা। চূড়া থেকে পাদদেশ

পর্যন্ত একের পর এক পাথুরে দেয়াল বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে তাদের। শাশ্বত সূর্য-রশ্মি খেলা করছে তাদের সর্বাঙ্গে।

শিকারী একটা প্রচণ্ড চিৎকার তুলে মাথা নিচু করে লুটিয়ে পড়লো। ফের যখন সে উঠে দাঁড়ালো তার সারা মুখ তখন সাদা হয়ে গেছে। পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ্যের মধ্যে এগিয়ে চললো সে। এখন সে একেবারে নিশ্চুপ। উপত্যকায় যাদের জন্ম, তাদের পক্ষে এই সুউচ্চ অঞ্চলের হালকা বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া রীতিমতো কঠিন। প্রতিবারই শ্বাস নেবার সময় মানুষটার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো। রক্ত চুঁইয়ে বেরুচ্ছিলো তার আঙুলের ডগা দিয়ে। তবু পরবর্তী পাথুরে দেয়ালটাতে সে কাজ শুরু করলো। এটার উচ্চতা যেন অসীম বলে মনে হলো তার। তবু সে কিছু বললো না। দিনরাত্রি জুড়ে লৌহকঠিন শিলায় সিঁড়ি কাটার প্রচেষ্টায় তার যন্ত্রপাতির আওয়াজ ধ্বনিত হতে লাগলো অবিরাম। বছর কেটে গেলো, তবু সে খেটেই চললো। সর্বদাই তার মনে হচ্ছিলো, দেয়ালটা যেন স্বর্গ অব্দি মাথা তুলে রেখেছে! মাঝে মাঝে সে তাকে সঙ্গ দেবার জন্যে নগ্ন শিলাগুলোর গায়ে একটুকরো শ্যাওলা বা সামান্য একটু ছত্রাকের উপস্থিতি প্রার্থনা করতো। কিন্তু কোনোদিনই তাদের সাক্ষাৎ মেলেনি।

এইভাবে বছরের পর বছর গড়িয়ে চলে। সিঁড়ির ধাপগুলো গুনে গুনে সে বছরের হিসেব রাখে। এক বছরে সামান্য কটা ধাপ—মোটে সামান্য কটা। এখন সে আর গান গায় না। এখন সে আর 'আমি এটা করবো' বা 'সেটা করবো' বলে না। এখন সে শুধু কাজ করে। আর রাত্রিবেলা, অন্ধকার যখন জাঁকিয়ে বসে, তখন পাহাড়ের গুহা-গহ্বর থেকে বিচিত্র সব বন্য মুখ তার দিকে উঁকি মারে। তারা চিৎকার করে বলে, 'কাজ থামাও, নিঃসঙ্গ মানুষ! কথা বলো আমাদের সঙ্গে।'

'কর্মেই আমার মুক্তি,' মানুষটা জবাব দেয়। 'আমি এক মুহূর্তের জন্যে কাজ থামালেই তোমরা আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

ওরা আরও লম্বা করে গলা বাড়িয়ে বলে, 'তোমার পায়ের কাছে ওই গহ্বরটার নিচে তাকাও। দ্যাখো, ওখানে কি পড়ে রয়েছে—সাদা হাড়গোড়! তোমার মতো একজন সাহসী বলিষ্ঠ মানুষ এই পাহাড়ে এসে উঠেছিলো। কিন্তু ওপরের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পেরেছিলো, আর চেষ্টা করা অর্থহীন। বুঝতে পেরেছিলো সত্যকে সে কোনোদিনই ধরতে পারবে না, কোনোদিনই দেখতে পাবে না, কোনো-দিনও খুঁজে পাবে না। তাই সে ওখানে শুয়ে পড়েছিলো—কারণ সে বড়ো ক্লান্ত ছিলো। চিরদিনের মতোই সে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিজে থেকেই ঘুমিয়েছিলো মানুষটা। ঘুম বড়ো শান্তিময়। ঘুমিয়ে পড়লে তুমি আর নিঃসঙ্গ থাকবে না, তোমার

হাতে আর ব্যথা থাকবে না, তোমার বুকে কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না।'

শিকারী দাঁতে দাঁত চেপে মৃদু হাসে, 'আমি আমার সব চাইতে প্রিয় জিনিসগুলোকে হৃদয় থেকে উপড়ে ফেলেছি, একা একা চিররাত্রির দেশে ঘুরে মরেছি, প্রলোভনের হাত থেকে নিজেকে প্রতিরোধ করেছি। যেখানে আমার গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর কোনোদিনও শোনা যায় না, আমি সেখানে বাস করছি—একা একা খেটে চলেছি। কিন্তু এসব কি শুধু ঘুমিয়ে পড়ে তোদের খাদ্য হবার জন্যে, লোভী দানবের দল ?'

শিকারী অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে আর হতাশার প্রতিধ্বনি চোরের মতো দূরে সরে যায়—কারণ বলিষ্ঠ হৃদয়ের সাহসভরা হাসি তাদের পক্ষে মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর।

তবু ফের তারা গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসে, শিকারীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুমি কি জানো, তোমার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে ? তোমার হাত দুটো এখন শিশুর হাতের মতো কাঁপতে শুরু করেছে ? তুমি কি দেখেছো, তোমার মাকুটার তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়ে গেছে ? এই সিঁড়িটা তুমি পার হতে পারলেও, এটা হবে তোমার শেষ সিঁড়ি। পরের সিঁড়িতে আর কোনোদিনই তোমার ওঠা হবে না।'

'আমি তা জানি !' কাজ করতে করতেই জবাব দেয় শিকারী। তার বৃদ্ধ শীর্ণ হাত দুটি দিনের পর দিন অমসৃণ, এবড়ো-খেবড়ো করে পাথর কেটে চলে। তার আঙুলগুলো এখন আড়ষ্ট হয়েছে, বেঁকে গেছে। শক্তি আর সৌন্দর্য বিদায় নিয়েছে মানুষটার শরীর থেকে।

অবশেষে একদিন সেই শিলাশিখর থেকে এক প্রাচীন, কুঞ্চিত, বিশীর্ণ মুখ দূরের দিকে তাকালো। দেখলো, অবিনশ্বর পর্বতশ্রেণী উত্তুঙ্গ পাথুরে দেয়াল নিয়ে শুভ্র মেঘমালার দিকে উঠে গেছে। কিন্তু তার কাজ তখন ফুরিয়েছে। যে সুউচ্চ গিরিচূড়ায় সে সারাটা জীবন পরিশ্রম করে কাটিয়েছে, দুটি ক্লান্ত হাত একত্রে জড়ো করে সে তারই পাশে শুয়ে পড়লো। অবশেষে এবারে তার ঘুমোবার সময় হয়েছে। তার নিচে, উপত্যকার ওপরে, শুভ্র কুহেলির ঘন আস্তরণ। একবার সেই জমাট আস্তরণ সামান্য একটু ছিঁড়ে যেতেই সেই ফাঁক দিয়ে মানুষটার মুমূর্ষু চোখ দুটো একবার তার শৈশবের গাছ-গাছালি আর মাঠ-প্রান্তরের দিকে তাকালো। এতোদূর থেকেও তার মনে হলো, তার কানে যেন তার চেনা সেই বুনো পাখিদের গান ভেসে আসছে···সে যেন তার স্বজাতির গান শুনতে পাচ্ছে, যে গান তারা নাচের সময় গাইতো। মানুষটার মনে হলো, ওই গানের মধ্যে সে যেন তার অতীতের সঙ্গীসাথীদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। সে দেখলো, অনেক দূরে সূর্যকিরণ ঝলমল করছে তার পূর্বজীবনের বাসস্থানটিতে।

শিকারীর দু চোখ জুড়ে অশ্রু ঘনালো। কেঁদে কেঁদে সে বললো, 'হায়! ওখানে যারা মরে, তারা নিঃসঙ্গ হয়ে মরে না।'

তারপর কুয়াশা আবার জমাট বাঁধলো, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো মানুষটা। নিজের মনেই সে বললো, 'বছরের পর বছর আমি কঠিন পরিশ্রম করে তাঁকে খুঁজেছি, কিন্তু তাঁর সন্ধান পাইনি। এই সুদীর্ঘ সময় আমি বিশ্রাম করিনি, অস্থির হইনি, ক্ষুব্ধও হইনি। তবু আমি তাঁর দেখা পাইনি। এখন আমার শরীর থেকে শক্তি বিদায় নিয়েছে। ক্লান্ত নিঃশেষিত হয়ে আমি যেখানে পড়ে রয়েছি, একদিন সেখানে অন্য তরুণ আর সতেজ মানুষরা এসে দাঁড়াবে। আমার তৈরি করা সিঁড়ি দিয়ে তারা ওপরে উঠবে। যে মানুষটা পাথর কেটে সিঁড়ির ধাপগুলো তৈরি করেছে, তার নাম তারা কোনোদিনও জানতে পারবে না। আমার হাতের এবড়ো-খেবড়ো কাজ দেখে তারা হাসবে, পাথর গড়িয়ে পড়লে তারা আমাকে অভিসম্পাত দেবে। কিন্তু আমার পরিশ্রমের ফসলকে ভিত্তি করেই তারা উঠবে—উঠবে আমার তৈরি করা সিঁড়ি দিয়ে! তারা সত্যের সন্ধান পাবে—পাবে আমার মাধ্যমে।…আসলে কোনো মানুষই নিজের জন্যে বাঁচে না, নিজের জন্যে মরে না।'

শিকারীর কুঞ্চিত আঁখিপল্লবের তলা দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সত্য এখন মানুষটার মাথার ওপরে—মেঘের মধ্যে—আবির্ভূত হলেও, মানুষটা তাকে দেখতে পেতো না। তার দু চোখে এখন মৃত্যুর কুহেলি।

'আমার অন্তরাত্মা তাদের খুশিভরা পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে, তারা আসছে।' মানুষটা বললো, 'তারা উঠবেই! তারা উঠবেই!' নিজের বিশুষ্ক হাতখানা সে তার চোখের দিকে তুলে নিলো।'

তারপর ওপরের শুভ্র আকাশ থেকে নিথর বাতাসে আস্তে আস্তে আস্তে কি যেন খসে পড়তে লাগলো। অস্ফুট মৃদু ঝাপটানি তুলে মুমূর্ষু মানুষটার বুকে খসে পড়লো জিনিসটা। হাত দিয়ে জিনিসটাকে অনুভব করলো সে। একটা পালক। পালকটা হাতে নিয়েই চিরদিনের মতো চোখ বুজলো মানুষটা।

অনুবাদ / দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

খোয়াওয়ালা

মিখাইল নুয়ামা

আরবী সাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক মিখাইল নুয়ামার জন্ম ১৮৮৯ সালে লেবাননের বিসকান্তায়, গোঁড়া একটা গ্রীক পরিবারে। প্রথম জীবনে রাশিয়া, পরে আমেরিকার ওয়াশিংটন ও নিউ ইয়র্কে পড়াশোনা করেন। ১৯৩২ সালে লেবাননে ফিরে আসেন। পশ্চিমী আধুনিকতার সঙ্গে ঋজু রাজনৈতিক চেতনা ও সমাজভাবনাকে মিশিয়ে যে কজন সাহিত্যিক আরবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করে তোলেন, মিখাইল নুয়ামা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। গল্প কবিতা প্রবন্ধ উপন্যাস নাটক নিয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা খুব একটা কম নয়। 'কান মা কান,' 'আন্নুর ওয়াদ দায়জুর' 'আবু বাতা' 'আকাবির' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। ১৯৬৮ সালে সব্যসাচী এই কথাশিল্পীর মৃত্যু ঘটে।

আমার বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটা মেরামত হচ্ছে। তার জন্যে ঝাড়া দু ঘণ্টা ধরে ভারি হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভেঙে খোয়া বানানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছি। যেহেতু তার হাতুড়ির ঘা পাথরের চাইতে আমার স্নায়ুর ওপরেই বেশি আঘাত হানছে, তাই মনে মনে স্থির করলাম কুকুরটার ঝাঁকড়া লোমের মধ্যে পোকামাকড় কিছু ঢুকেছে কিনা খুঁজে বার করবো, এবং সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে একত্রিত করে চেষ্টা করবো হাতুড়ির ওই শব্দের মধ্যে কোনো ছন্দ আবিষ্কার করা যায় কিনা। সত্যি বলতে কি, ঘণ্টাখানেক কি তার একটু পরেই দেখলাম সেই শব্দে আমার কান বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে—যেন উৎসুক হয়ে শুনছি কখনও দীর্ঘ কখনও বা সংক্ষিপ্ত, কখনও স্পষ্ট কখনও বা মৃদু, কখনও দ্রুত কখনও বা বিলম্বিত লয়ের সেই অদ্ভুত ছন্দ।

স্বভাবতই, হাতুড়ির শব্দে খোয়া যে ভাঙছে তার সম্পর্কে আমি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম এবং জানলা দিয়ে মাঝে মাঝেই তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। কিন্তু আমার উপস্থিতি সম্পর্কে সে কিছুই জানে না, কেননা তার সামনে পাথরকুঁচির স্তূপ থেকে সে একবারও চোখ তুলে তাকায়নি। প্রকৃতপক্ষে অন্য কারুর উপস্থিতি সম্পর্কেও সে কিছু জানে বলে আমার মনে হয় না। কেননা পথিকেরা যখনই যাওয়া-আসা করছে, কেউ বলছে 'আস্তে', কেউ বলছে, 'একটু দেখে, ভাই,' জবাব দেওয়া তো দূরের কথা, সে কিন্তু ঠোঁট বেঁকিয়ে কিংবা ভ্রূ উঁচিয়ে কারুর দিকে চোখ তুলেও তাকাচ্ছে না। যেন যে রহস্যময়তায় পৃথিবী এখনও নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে

রেখেছে তারই আচ্ছন্ন মোহে সে কাজ করে চলেছে, মুহূর্তের জন্যেও ছন্দপতন ঘটার কোথাও কোনো সম্ভাবনা নেই।

নিশান্তিকার একটু পরেই সে কাজ শুরু করে, সূর্যাস্তের আগে আর থামে না। দিনে দুবার খাবার জন্যে শুধু কয়েক মুহূর্তের বিরতি। আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় কাজটা যেখানে ছেড়ে গিয়েছিলো, পরের দিন সকালবেলায় ঠিক সেখান থেকেই আবার শুরু করে। একরাশ পাথরের ওপর বসে পা দুটোকে সে সামনের দিকে ছড়িয়ে দেয়, তারপর দু পায়ের মাঝে একটা পাথরকে চেপে ধরে ভেঙে টুকরো টুকরো না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ভারি হাতুড়িটা চালিয়ে যায়, তারপর তুলে নেয় আর একটা পাথর, তারপর আর একটা, এমনি ভাবে বেলাশেষের সূর্যটা না ডোবা পর্যন্ত চলবে সারাক্ষণ। আর তখন তার পেছনে একটা মাত্র দিনের পরিশ্রমে জমে উঠবে কুড়ি গজ কিংবা তার চাইতেও বেশি পাথরকুঁচির বেশ বড একটা স্তূপ।

আমি একাধিকবার তার মুখটা দেখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু মাথায় একটা কাপড় জড়ানো থাকায় তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে একবার আমি তাকে হাতুড়িটা একপাশে সরিয়ে রেখে দীর্ঘ দেহটাকে টান টান করে মেলে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙতে দেখেছিলাম। তখন সে মাথার কাপড়টা খুলে কপালের ঘাম মুছছিলো আর আমাকে না দেখেই জানলার দিকে মুখখানা ফিরিয়ে রেখেছিলো। দৈত্যের মতো বিশাল চেহারা, আত্ম-প্রত্যয় আর পৌরুষ-দীপ্ত বলিষ্ঠতায় মেশা হালকা রঙের মুখখানাকে বেশ সুন্দরই বলা চলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাথর কুঁদে মূর্তি গড়ে তোলার মতো নিপুণতা তার আছে, আর নিঃসন্দেহে সেগুলো হতো পৌরাণিক সব বীরদের মূর্তি।

অবশেষে আমার সমস্ত কৌতূহল গিয়ে পড়লো লোকটার ওপর। আমি তাকে শুভেচ্ছা জানালাম, সে কোনো জবাব দিলো না। আমি তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, নিজের কাজ সম্পর্কে সে যেন আরও বেশি মনোযোগী হয়ে উঠলো। তার ছন্দিল হাতুড়ির ঘায়ে পাথরের চাঁইগুলো আখরোটের মতো টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। নিরাশ হয়েই আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম এবং রাস্তা মেরামতির ব্যাপারটা যে দেখাশোনা করছে সেই সর্দারের খোঁজ করলাম। তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর জিগেস করলাম, 'আচ্ছা, ওই যে লোকটা পাথর ভাঙছে, আপনি কি ওর সম্পর্কে কিছু জানেন? আমি ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ও একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। লোকটা বোবা কিংবা কালা নয়তো?'

'না না,' সর্দার জবাব দিলো, 'ও বোবা নয়, কালাও নয়। তবে লোকটা ভারি অদ্ভুত। অবশ্য এর পেছনে একটা কাহিনী আছে…'

'কাহিনী ?' অবাক হয়েই আমি জিগেস করলাম।

'হ্যাঁ, ওর যখন সাঁইত্রিশ বছর বয়েস তখন জেল হয়, কিন্তু পঞ্চান্ন বছর বয়েসেই ও আবার ছাড়া পায়। প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তির মধ্যস্থতায় ওকে বিশেষভাবে ক্ষমা না করা হলে ও কোনোদিনই কারাকুঠরির বাইরে বেরিয়ে আসতে পারতো না। ওকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিলো।'

'কিন্তু ওকে তো দেখলে এখনও পঁয়ত্রিশের বেশি বয়েস বলে মনে হয় না।'

'তা ঠিক। জেলে যাবার আগে যারা ওকে চিনতো, তারা এক বাক্যে স্বীকার করে ও একটুও পালটায়নি। ওর লোহার মতো শক্ত পেশী আর শারীরিক গঠন সত্যিই তারিফ করার মতো। দ্যাখেননি, সকাল থেকে সন্ধ্যের মধ্যে ও কখনও একটুও বিশ্রাম নেয় না ?'

'কবে ও জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে ?'

'সপ্তা দিনেক আগে।'

'ও কি বহুদিন থেকেই এই পাথর ভাঙার কাজ করছে ?'

'হ্যাঁ, ওর বয়েস যখন পঁচিশ, সেই তখন থেকে। এবং এ ব্যাপারে কেউ কখনও ওকে সঙ্গে টেক্কা দিতে পারেনি।'

'কিন্তু ও কি এমন অপরাধ করেছিলো যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি পেতে হয়েছিলো ?'

'নিজের একমাত্র মেয়েকে ও খুন করেছিলো। মেয়েটার বয়েস তখন ষোলো।'

'নিজের মেয়েকে ও খুন করেছিলো !'

'হ্যাঁ। যে হাতুড়ি দিয়ে ও পাথর ভাঙে সেই হাতুড়ি দিয়ে। ঐ হাতুড়ির একটা ঘায়েই মেয়েটাকে শেষ করে দিয়েছিলো।'

'উঃ, কি ভয়ঙ্কর !' দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা করতেই আমি শিউরে উঠলাম। 'কিন্তু ও কেন এমন কাজ করতে গেলো ?'

'সবাই বলে ও নাকি মেয়েটাকে অন্ধের মতো ভালোবাসতো, বিশেষ করে খুব ছোটবেলায় মা মারা যাবার পর থেকে। মেয়েটার কাছে ও ছিলো বাবা মা দুই-ই। ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটা, এমন কি ওর ঘর-সংসারের প্রতি অন্য কেউ যত্ন নিক সেটাও ওর পছন্দ নয়। একটু একটু করে মেয়েটা যত বড় হয়ে উঠতে লাগলো, কিশোরী থেকে তরুণী, ওর দৃষ্টি ততই সতর্ক হয়ে উঠলো পাছে কারো প্রলোভনের ফাঁদে পা দেয় কিংবা কেউ ওর কোনো অনিষ্ট করে।'

'মেয়েটা কি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো ?'

'সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে কেউ কিছুই জানে না। সবাই বলে মেয়েটার বাবা এক-

দিন হঠাৎই কাজ ফেলে ঘরে ফিরে এসেছিলো। সঙ্গে ছিলো ওর ভারি হাতুড়িখানা। ভেতরে ঢুকে দেখলো মেয়েটা পাড়ারই একটা লোচ্চার ওঁচা ছেলের সঙ্গে গল্প করছে, হাতে পরে রয়েছে একটা সোনার ঘড়ি, কানে মুক্তোর দুল। মাথায় সোজা একটা হাতুড়ির ঘায়ে ও মেয়েটাকে ওখানেই শেষ করে দিলো, তারপর রক্তমাখা হাতুড়িখানা নিয়ে পুলিসের কাছে গিয়ে সব কথা স্বীকার করলো। সেই ঘটনার পর থেকে ও আর একটা কথাও বলেনি।'

'বিচারের সময় ও আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো রকম চেষ্টা করেনি?'

'না।'

'কেন মেয়েকে খুন করলো সে কথা কাউকে কিছু বলেনি?'

'কাউকে না।'

'সত্যিই ভারি অদ্ভুত তো! আচ্ছা, সেই ঘটনা ঘটার আগে থেকেই কি আপনি ওকে চিনতেন?'

'হ্যাঁ। আমরা দুজনে একই গ্রামের এবং বয়সেও দুজনে প্রায় সমান।'

'জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর ওর আচার-আচরণের মধ্যে কি কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন?'

'হ্যাঁ, করেছি বইকি। বরাবর এমন কি যৌবনেও, ও খুব কমই কথা বলতো। তবে হাসিখুশি বলতে যা বোঝায়, ও ছিলো অনেকটা সেই ধরনের। আর ওর গানের গলাটাও ছিলো ভারি চমৎকার।'

'ও কি ধর্মভীরু?'

'যদি সেইভাবে বর্ণতে চান বলতে পারেন, তবে আমি ওকে কখনও মসজিদ কিংবা কোনো ধর্মস্থানে যেতে দেখিনি। কেউ ওকে কখনও নোংরা বা আজেবাজে শব্দও উচ্চারণ করতে শোনেনি।'

'এখন ও কি ভাবে বাস করছে?'

'ওর নিজের একটা ছোট বাড়ি ছিলো, সঙ্গে একফালি বাগান। তাতে ছিলো বেশ বড় দুটো ডুমুর গাছ আর কয়েকটা আঙুরলতা। জেল থেকে বেরুনোর পর দেখলো বাড়িটার অবস্থা একেবারে জরাজীর্ণ, সেটাকে ও সারাবার কোনোরকম চেষ্টাই করলো না। এখন ঝাঁকড়া একটা ডুমুর গাছের নিচে শুয়েই রাত কাটাচ্ছে। শীত এলে যে কি করবে আমি নিজেই জানি না।'

'আপনার কি মনে হয় অতীতে যা করেছে তার জন্যে ও অনুতপ্ত?'

'তা আমি কেমন করে বলব বলুন. নিজের কাজের সম্পর্ক ছাড়াও তো আর কখনও কারুর সঙ্গে কথা বলে না? তবে ওর চোখে-মুখে এমন একটা ভাব ফুটে

ওঠে যেটা আগে কখনও দেখিনি।'

'কি রকম?'

'ওর উদাস চোখের দৃষ্টিটাই ভারি অদ্ভুত। ও সাধারণত চোখ তুলে তাকায় না, যদি কখনও আপনার দিকে তাকায়ও, মনে হবে আপনাকে ছাড়িয়ে ওর দৃষ্টি যেন অনেক দূরে কোথাও চলে গেছে। তাছাড়া ওর ঠোঁট দুটো সবসময় কাঁপে, যেন কোনো মাছি বসেছে, ও তাড়াবার চেষ্টা করছে, কিন্তু মাছিটা কিছুতেই যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে আমি ওকে নিজের মনে বিড়বিড় করতে শুনেছি, যেন চাপা স্বরে কাউকে ধমকাচ্ছে। এমনটা ও আগে কখনও করতো না। আমার ভয় হচ্ছে ও হয়তো পাগলই হয়ে যাবে।'

খোয়াওয়ালা সম্পর্কে অনেককিছু জানতে পারার জন্যে সর্দারকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি চলে এলাম। সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ জোরে জোরে কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। দরজা খুলতেই বিস্ময়ে এমন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম যে একটা কথাও বলতে পারলাম না. দেখলাম দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে খোয়াওয়ালা নিজে। ওর এক হাতে হাতুড়ি, অন্য হাতে মরচেপড়া একটা টিনের বালতি। প্রাথমিক সম্ভাষণ কিছু না জানিয়ে ও সরাসরিই জিগেস করলো, 'আমার এই বালতিতে খানিকটা গরম জল দিতে পারেন। মুখ, হাত আর এই হাতুড়িতে রক্ত লেগে আছে, ধোবো।'

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম, তারপর স্তব্ধ-বিস্ময়ে বললাম, 'কই, আপনার মুখে হাতে কিংবা হাতুড়িতে তো কোনো রক্ত লেগে নেই!'

'আছে, আছে,' অদ্ভুত ভঙ্গিতে ও ঠোঁট চেপে হাসলো। 'রাস্তার জন্যে আজ পর্যন্ত যত খোয়া ভেঙেছি সব রক্তে ভিজে গ্যাছে। আমার হাত আর হাতুড়িটা রক্তে ভারি হয়ে উঠেছে। রক্তের জন্যে চোখে প্রায় কিছু দেখতেই পাচ্ছি না। দয়া করে যদি খানিকটা গরম জল…'

বালতিটা ভরে দেবার পর ও নিয়ে চলে গেলো। অন্ধকার হয়ে আসায় শেষ পর্যন্ত ও কোনদিকে গেলো ঠিক বুঝতে পারলাম না।

পরের দিন গেলো, তারপরে আরও দু-তিনদিন, আমি কিন্তু রাস্তায় খোয়া-ওয়ালাকে দেখতে পেলাম না, কিংবা এমন কাউকেও খুঁজে পেলাম না যে অন্তত আমাকে ওর খবরটা দিতে পারবে। ইতিমধ্যে রাস্তা মেরামতির কাজ প্রায় শেষ, হঠাৎ সেই সর্দারকে দেখতে পেয়ে তার দোস্তের খবর জিগেস করলাম। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অত্যন্ত বেদনাহত স্বরে সে জবাব দিলো, 'কি আর বলবো বলুন, সেই যে সমুদ্রে স্নান করতে গেলো আর ফিরে এলো না। সত্যি, এটা খুবই দুঃখজনক, ওর মতন অমন চমৎকার শ্রমিক আমি আর একজনও খুঁজে পাবো না!'

অনুবাদ / অসিত সরকার

জীবন-মৃত্যুর ওপারে

থেসার ভালেজো

শুধু পেরু বা স্পেনীয় সাহিত্য নয়, সমগ্র আধুনিক বিশ্বসাহিত্যেরও এক দুর্বার কবি থেসার ভালেজোর জন্ম ১৮৯২ সালে স্যান্টিয়্যাগোতে। স্পেনের ধ্রুপদী কাব্যরীতিকে ভেঙে, পেরুভিয়ান সাহিত্যে তিনিই প্রথম মদার্নিসমো বা 'আধুনিকতা'র এক নতুন জোয়ার নিয়ে আসেন এবং অনেকটা র্যাঁবোর ভঙ্গিতে একক বৈপ্লবিক দ্যোতনায় তাকে সুপ্রতিষ্ঠিতও করেন। চিরটা-কাল নিজের জীবন, জীবিকা ও চেতনার সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রামী এই অনন্য প্রতিভার মৃত্যু ঘটে ১৯৩৮ সালে, পারিতে, মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে। কবিতা ছাড়া উপন্যাস নাটক স্মৃতিকথাও লিখেছেন। সম্ভবত এটাই তাঁর একমাত্র প্রকাশিত গল্প।

জুলাইয়ের নিথর নিষ্কম্প কাঁটাঝোপ। বাতাস বন্দী হয়ে আছে অতিরিক্ত ফলের বোঝায় অবনত হয়ে থাকা তাদের অসহায় বৃন্তগুলোতে। উত্তরায়ণের পর্বতমালায় কেন্দ্রবিন্দুর মতো জেগে থাকা টিলাগুলোতে ছড়িয়ে আছে অনেক প্রাণহীন মৃত আকাঙ্ক্ষা।···দাঁড়াও, এ সমস্ত এখন নয়। এসব অন্য কোনো সময়ে হবে। এখন··· আহা, কি সুন্দর সে স্বপ্ন !

ওই দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলো আমার ঘোড়া। এগারো বছর অনুপস্থিত থাকার পর অবশেষে আমি আমার জন্মস্থান স্যান্টিয়্যাগোর প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছি তখন। হতভাগা বেচারা পশুটা এগুচ্ছে আর আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে শুরু করে বিশীর্ণ আঙুলগুলো পর্যন্ত কান্নায় আকুল হয়ে উঠছে। হয়তো সেই কান্না আমার হাতে ধরে রাখা লাগামের ভেতর দিয়ে ঘোড়াটার উদ্ধত কান দুটোতেও ছড়িয়ে পড়ছিলো, তারপর নেমে গিয়ে আবার ফিরে আসছিলো ওর খুরের ধাতব ধ্বনির মাধ্যমে। মনে হচ্ছিলো ঘোড়াটা যেন একই জায়গায় নেচে চলেছে ক্রমাগত—এক বিচিত্র নাচের পদবিন্যাসে যাচাই করে নিচ্ছে আমাদের পথ আর সামনের অজানাকে। আমি কাঁদছিলাম আমার মা, দু বছর আগে মরে যাওয়া আমার মায়ের জন্যে—যাঁকে আর কোনোদিনও তাঁর স্বাধীন পুত্রটির ফিরে আসার প্রতীক্ষায় থাকতে হবে না। এই গোটা অঞ্চল, এর সুন্দর আবহাওয়া, পাকা ফসলের মতো লেবুরঙা বিকেল, এখানে-সেখানে পরিচিত দু-একটা বসতবাড়ি সমেত কিছু ভূসম্পত্তি—সমস্ত কিছু একসঙ্গে মিলে আমার মনের গভীরে ঘরে ফেরার জন্যে এক আকুল উচ্ছ্বাসময় আর্তি জাগিয়ে তুলতে শুরু করলো। আমার ঠোঁট দুটো প্রায় কুঁচকে উঠলো, যেন তারা

সদা-সর্বদা দুধে-ভরে-থাকা আমার মায়ের অবিনশ্বর স্তন দুটিতে মুখ গুঁজে দেবে। হ্যাঁ, মৃত্যুর ওপারেও।

শিশুকালে মায়ের সঙ্গে আমি নিশ্চয়ই ওই পথ দিয়ে গেছি। হ্যাঁ, গেছি বইকি! কিন্তু না, মা আমার সঙ্গে ওই গ্রামাঞ্চলে যায়নি—আমি তখন বড্ড ছোটো। বাবার সঙ্গে গিয়েছিলো। তা নিশ্চয়ই অ-নে-ক বছর আগেকার কথা। সেটাও ছিলো জুলাই মাস, স্যান্টিয়্যাগোর উৎসবের কাছাকাছি সময়। ঘোড়ার পিঠে বাবা আর মা। বাবা আগে আগে। হঠাৎ, একটা নাগফণী গাছের সঙ্গে ধাক্কা এড়িয়েই, মোড় ঘুরতে ঘুরতে বাবা চিৎকার করে উঠলেন, 'সাবধান!'

কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, জিন থেকে পথের পাথরে ছিটকে পড়লো আমার মা। সবাই তাঁকে স্ট্রেচারে করে শহরে বয়ে নিয়ে এলো। মায়ের জন্যে আমি কত্তো কাঁদলাম, অথচ কি হয়েছিলো তা কেউ আমাকে বললো না। কিন্তু মা ভালো হয়ে উঠলো। উৎসবের আগের রাতেই মা আবার হাসি আর আনন্দে ভরা। তখন মা আর বিছানায় বন্দী হয়ে নেই। সমস্ত কিছুই তখন সুন্দর।

অথচ মায়ের সেই অসুস্থ শয্যাশায়ী অবস্থা—যখন মা আমার প্রতি আরও বেশি করে ভালোবাসা প্রকাশ করতো, আমার জন্যে অকারণে ব্যস্ত হয়ে উঠতো, বালিশের তলা আর রাত-টেবিলের দেরাজ থেকে আমাকে বেশি বেশি করে মিষ্টি জিনিস দিতো—সেই অবস্থার কথা মনে করে তখন আমি আরও বেশি করে কাঁদছিলাম। কাঁদছিলাম স্যান্টিয়্যাগোর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে—যেখানে গিয়ে আমি দেখবো, মা মরে গেছে···একটা অনাদৃত কবরের গভীরে চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে আছে আমার মা···আর সেই সমাধির ওপরে ফিসফিস করে কানাকানি করছে পাকা সরষের ঝাড়।

দু বছরও হয়নি আমার মা মারা গেছে। লিমাতেই আমি প্রথম আমার মায়ের মৃত্যুসংবাদ পাই। সেখানেই আরও জানতে পারি, ভয়ঙ্কর ওই শোকের যন্ত্রণাকে যথাসম্ভব লাঘব করে নেবার আশায় আমার বাবা আর দাদা অনেক দূরে আমার এক কাকার তালুকে রওনা হয়ে গেছেন। জায়গাটা ম্যারানন নদীর ওপারে, অরণ্যের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে। স্যান্টিয়্যাগো থেকে আমিও সেদিকে যাবো—মাঝখানের উত্তুঙ্গ পাহাড়ি অঞ্চল আর অপরিচিত তাপদগ্ধ অরণ্যের ভেতর দিয়ে আমাকে পেরিয়ে যেতে হবে অন্তহীন পথ।

আচমকা আমার ঘোড়াটা চিৎকার করে উঠলো। হালকা বাতাসে রাশ রাশ ভূষি উড়ে প্রায় অন্ধ করে দিলো আমাকে। একগাদা যবের স্তূপ। তারপরেই স্যান্টিয়্যাগো আমার দৃশ্যপটে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। অস্তগামী সূর্যের আরক্ত প্রভায় মনে হলো যেন আগুন লেগেছে ওখানকার বাড়িগুলোর ছাদে ছাদে। পুবদিকে একটা

লালচে-হলুদ শৈল-অন্তরীপের শেষপ্রান্তে অপরাহ্নের কমলা রঙে রাঙানো সমাধি-ক্ষেত্রটা তখনও আমি দেখতে পাচ্ছি। এতোটা সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই। সান্ত্বনার অতীত এক সীমাহীন বেদনা আমার সমস্ত অস্তিত্বকে যেন অসাড় করে তুললো।

গ্রামে যখন পৌছলাম তখন রাত নেমেছে। যে রাস্তায় আমার বাড়ি, শেষবারের মতো মোড় ঘুরে সেখানে ঢুকতেই দেখি, দরজার কাছে পাথরের বেঞ্চিটাতে কে যেন বসে রয়েছে। একা। একেবারে একা। এতো বেশি একা যে সেই ভয়ঙ্কর একাকীত্ব আমাকে আতঙ্কিত করে তুললো, বিস্মরণে ডুবিয়ে দিলো আমার নিবিড় বেদনাবোধকে। আতঙ্কের এক আশ্চর্য আক্রমণে আমার অশ্রু শুকিয়ে গেলো। আমি সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপরেই আমার দাদা অ্যানজেল বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। মাত্র কয়েকদিন আগেই কি একটা কাজে ও কাকার তালুক থেকে এখানে এসেছে।

সামান্য কিছু খাওয়াদাওয়ার পর সারাটা রাত—ভোর অব্দি আমরা জেগে জেগে কাটিয়ে দিলাম। বাড়ির প্রতিটি ঘর, প্রতিটা বারান্দা আর আস্তাবলগুলো আমি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এলোমেলোভাবে গড়ে ওঠা এই পুরনো বাড়িটাকে কি ভালোই না আমরা বাসতাম! বাড়িটা এমন করে দেখার ব্যাপারে আমার তীব্র আগ্রহকে অ্যানজেল স্পষ্টতই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু জীবনের গভীরতম অতীতের অলৌকিক সাম্রাজ্যে এভাবে ঘুরে বেড়াবার আত্মনিগ্রহকে সে নিজেও রীতিমতো উপভোগ করছে বলে মনে হয়েছিলো আমার।

স্যান্টিয়্যাগোতে থাকাকালীন সামান্য দিন কটা অ্যানজেল একা একা ওই বাড়িতেই বাস করেছে। সে বলেছিলো, মায়ের মৃত্যুর সময় বাড়ির সমস্ত কিছু যে অবস্থায় ছিলো, এখনও ঠিক তেমনিভাবেই আছে। মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে সুস্থ অবস্থায় মায়ের শেষ কটা দিন আর তাঁর শেষ মুহূর্তগুলোর বর্ণনাও অ্যানজেল আমাকে দিয়েছিলো। ভ্রাতৃত্বের নিবিড় আলিঙ্গন ওই সময় কতোবার যে আমাদের হৃদয় বিদ্ধ করেছে!

'এই সেই ভাঁড়ার ঘর! এখানে মিথ্যে করে চোখে জল এনে আমি মায়ের কাছে রুটি চাইতাম।' বলতে বলতে আমি ছোট্ট একটা জীর্ণ দরজা খুলে দিলাম।

এইমাত্র [illegible] সদরে দরজা[illegible] আমি পেরিয়ে এলাম, পেরুর পার্বত্য গ্রামাঞ্চলের অধিকাং[illegible] বাড়ির মতো সেখানে[illegible]টা শান বাঁধানো বেঞ্চি আছে। পেছন দিকে হেলে প[illegible] ওই বেঞ্চিটা নিঃসন্দেহে অ[illegible]ার শিশুকালের সেই বেঞ্চি যেটাকে ইতি-মধ্যে [illegible]সংখ্যবার মেরামতি আর প[illegible]রা করানো হয়েছে। জীর্ণ দরজাটা খোলা

অবস্থায় রেখে আমরা দুজনে ওই বেঞ্চিটাতে গিয়ে বসলাম। সঙ্গে নিয়ে আসা ম্লান লণ্ঠনটাকেও রাখলাম সেখানে। লণ্ঠনের আলো তির্যকভাবে অ্যানজেলের মুখে ছড়িয়ে পড়ছিলো। রাত গড়িয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানজেলের মুখটা প্রতি মুহূর্তেই আরও বেশি করে ফ্যাকাশে হয়ে উঠছিলো। শেষ পর্যন্ত মুখটা একেবারে স্বচ্ছ, যেন আলোকভেদ্য হয়ে উঠেছে বলে মনে হলো আমার। ওকে ওই অবস্থায় দেখে একবার আমি ওর গম্ভীর, দাড়িভরা গালে চুমু দিলাম।

সেই মুহূর্তে হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো। গ্রীষ্মকালে পার্বত্য অঞ্চলে যেমন বজ্রপাত হয়, তেমনি হয়েছে অনেক দূরে কোথাও—কিন্তু ইতিমধ্যে শব্দটা গেছে হারিয়ে। চোখ রগড়ে আমি অ্যানজেলের মুখোমুখি হলাম। অথচ সেখানে কেউ নেই, কিছু নেই। না অ্যানজেল, না লণ্ঠনটা, না সেই বেঞ্চি। অথচ আমি কিছুই শুনতে পাইনি। মনে হলো আমি যেন একটা কবরের মধ্যে রয়েছি…

তারপর ফের আমি আমার দাদা, লণ্ঠন আর বেঞ্চিটাকে দেখতে পেলাম। মনে হলো, অ্যানজেলের মুখটা যেন আগের চাইতে অনেক সতেজ আর শান্ত দেখাচ্ছে। মনে হলো—আমার ভুলও হতে পারে—যেন আগেকার দুঃখ-কষ্ট আর দুর্বলতা সে কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু হয়তো এ আমার ভুল, হয়তো আমার চোখ দুটোই আমার সঙ্গে ছলনা করছে…কারণ অ্যানজেলের এমনধারা পরিবর্তন একেবারে অবিশ্বাস্য।

'এখনও আমি মাকে দেখতে পাই,' আমি বলতে থাকি। 'আমাকে মিঠাই দেবে না বকবে, তা বেচারি কিছুতেই ঠিক করতে পারতো না। বলতো, 'এবারে আমি তোকে ধরে ফেলেছি, শয়তান! তুই কাঁদার ভান করছিস, কিন্তু আসলে তুই হাসছিস'। তারপর তোমাদের সবার চাইতে মা আমাকেই বেশি করে চুমু দিতো, কারণ আমি যে সবার ছোটো!'

সেদিন সেই দুঃখময় রাত্রি-জাগরণের পর অ্যানজেলকে আবার সেই আগেকার মতোই বিধ্বস্ত আর আশ্চর্য রকমের শীর্ণ বলে মনে হয়েছিলো আমার—বিদ্যুৎ চমকের আগে যেমনটি লাগছিলো, ঠিক তেমনি। বিদ্যুতের ওই আকস্মিক ঝলকানি লেগে নিঃসন্দেহে আমার দৃষ্টিশক্তির কোনো গোলমাল হয়ে গিয়েছিলো, তাই ওর মুখে আমি অমন সতেজতা আর উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য দেখতে পেয়েছিলাম—যা আদৌ তখন ছিলো না, থাকতে পারে না।

পরের দিন অ্যানজেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি যখন ঘোড়ায় চেপে কাকার তালুকের দিকে রওনা হলাম, তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। অ্যানজেল যে কাজের জন্যে এসেছিলো সেটা সেরে নেবার জন্যে আরও কয়েকটা দিন স্যান্টিয়াগোতেই থাকবে।

প্রথম দিনের পথযাত্রা শেষ হবার পর একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। সরাইখানার বাইরে একটা শান বাঁধানো বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে বসে আমি বিশ্রাম করছি, হঠাৎ ওখানকার এক বৃদ্ধা আতঙ্কিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির স্বরে জিগেস করলো, 'আপনার মুখে কি হয়েছে গো, বাবু মশাই ? দেখে মনে হচ্ছে সারা মুখে রক্ত…'

আমি এক লাফে উঠে পড়লাম এবং সত্যি বলতে কি আয়নায় দেখলাম, আমার সারা মুখে রক্তের শুকিয়ে যাওয়া প্রলেপের দাগ। সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের ভেতর দিয়ে যেন একটা শিহরণ বয়ে গেলো, ইচ্ছে হলো নিজের কাছ থেকে ছুটে পালাই। রক্ত ? কোত্থেকে এলো ? অ্যানজেল যখন কাঁদছিলো, আমি ওর মুখে নিজের মুখ চেপে ধরেছিলাম।…কিন্তু…না না ! কোত্থেকে এলো এ রক্ত ? আমার বুকের মধ্যে আতঙ্ক আর আকস্মিকতার আঘাত দলা পাকিয়ে উঠলো। মনের সেই অদ্ভুত বিহ্বলতা আমি আর কোনোদিনও অনুভব করিনি। ভাষায় তা প্রকাশ করা যাবে না—আজ না, কোনোদিনও না। এমন কি আজও—এই নির্জন ঘরে বসে লেখার সময়ও—আমার মনে পড়ে যাচ্ছে আমার মুখে সেই বাসি রক্তের প্রলেপ, সরাই-খানার সেই বৃদ্ধা, সেদিনের সেই দিন আর কান্নায় মুখর হয়ে ওঠা আমার দাদা—আমার মৃতা মা যাকে চুমু দেয়নি…

…ওই শেষ লাইনগুলো লেখার পর ঠাণ্ডা ঘামে নেয়ে উঠে আমি হাঁফাতে হাঁফাতে বারান্দায় ছুটে গিয়েছিলাম, এমনই বীভৎস সেই রক্তের স্মৃতি।

…অবিস্মরণীয় সেই কুটিরে দুঃস্বপ্নের সেই রাত—এক অর্থহীন যুক্তির কলহে আমার মৃতা মায়ের স্মৃতির প্রতিমা সেখানে বারবার অ্যানজেলের সঙ্গে বদলে যাচ্ছিলো আর তার অশ্রুতে ঝরে পড়ছিলো অজস্র চুনীর রক্তিমতা।

আমি আমার যাত্রাপথে এগিয়ে চললাম এবং শেষ অব্দি পাহাড় পর্বত আর তপ্ত অরণ্য ছাড়িয়ে, ম্যারানন পার হয়ে এক সপ্তাহ বাদে একদিন সকাল বেলায় কাকার তালুকের উপকণ্ঠে এসে পৌছলাম। দূরের বজ্রপাতের আওয়াজে থেকে থেকে প্রতি-ধ্বনিত হয়ে ওঠে সেখানকার মেঘলা আকাশ আর মাঝে মাঝে তারই ফাঁক দিয়ে ফুটে বেরোয় সোনা রোদের ঝিলিমিলি।

সদর দরজায় ঘোড়া বেঁধে রাখার খুঁটিটার কাছেই আমি ঘোড়া থেকে নামলাম। পাহাড়ী কুয়াশার বিষণ্ণ নৈঃশব্দের মধ্যে কয়েকটা কুকুর ডেকে উঠলো। এবারে আমি ফিরে এসেছি, কতো বছর বাদে ফিরে এসেছি অরণ্যের গভীরে দাঁড়িয়ে থাকা এই নির্জন প্রাসাদে !

মুরগীগুলোর সাবধানী-সঙ্কেতের মতো চিৎকার-চেঁচামেচিকে ছাপিয়ে একটা

কণ্ঠস্বর ভেসে এলো···পাহারাদার কুকুরগুলোকে কে যেন ভেতরে সামলে রাখছে। যতো আশ্চর্য বলেই মনে হোক, আমার কেঁপে কেঁপে ওঠা ক্লান্ত ঘোড়াটা যেন সেই কণ্ঠস্বরটাকে শুঁকছে বলে মনে হলো। তারপরেই সে তার কান দুটোকে প্রায় সোজা-সুজি সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বারবার চিৎকার করতে শুরু করলো···পেছনের পা দুটোকে ওপরের দিকে তুলে আমার হাত থেকে লাগাম ছিনিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগলো অবিরাম। সদরের বিশাল দরজাটা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। আমি নিশ্চয়ই যন্ত্রচালিতের মতো দরজাটাতে আঘাত করেছিলাম, তাই ভেতর থেকে ফের সেই কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো এবং পরমুহূর্তে মেরুদণ্ড ঠাণ্ডা করানো শব্দ তুলে সেই বিশাল দরজা খুলে যেতেই আমার ছাব্বিশ বছর বয়সের কাছে সেই বেজে-ওঠা কণ্ঠস্বর চিরদিনের মতো থেমে গেলো—আমি পড়ে রইলাম অনন্তকালের দিকে তাকিয়ে। দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ হয়ে গেলো আবার।

সমস্ত সম্ভাবনাকে ছাপিয়ে যাওয়া, জীবন-মৃত্যুর সমস্ত নিয়ম-কানুন ভেঙে দেওয়া এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটার কথা মুহূর্তের জন্যে ভেবে দেখুন। অবিশ্বাস্য আর অনন্তের মধ্যে আশা আর বিশ্বাসের কথা, স্থানকালের অনস্বীকার্য বিচ্ছিন্নতা—সবই স্বরহীন অচেনা ঐকতানে গড়া এক মেঘলা নীহারিকা, যা মানুষকে বিস্মিত করে তোলে।···

মা আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিলো।

'বাছা, তুই বেঁচে আছিস?' আমাকে দেখে মা অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলো, 'তুই প্রাণ ফিরে পেয়েছিস?···ওগো স্বর্গের ঠাকুর, এ কি দেখছি আমি?'

মা! আমার মা! দেহ আর আত্মা নিয়ে মা এখনও বেঁচে আছে! এতো ভীষণভাবে বেঁচে আছে যে মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার মনে হলো, আচমকা আমি যেন নাকের সামনে দুটো শিলাখণ্ড দেখতে পেলাম। ধ্বংসস্তূপ থেকে খসে পড়া ওই শিলা দুটো ক্রমশ আমার বুকের ওপরে নেমে আসতে লাগলো···তাদের চাপে আমি একটা বুড়ো মানুষের মতো কুঁজো হয়ে গেলাম। মনে হলো ভাগ্যের এক আশ্চর্য খেলায় আমার মা যেন এইমাত্র জন্ম নিলো আর আমি যেন অনেক দূর অতীতের দিন থেকে ঠিক সেই সময়টিতেই ফিরে এলাম, যার ফলে মায়ের প্রতি আমি এখন পিতার বাৎসল্য অনুভব করছি।

হ্যাঁ, আমার মা-ই ছিলো সেখানে। পরনে পুরোপুরি কালো পোশাক। জীবন্ত। আদৌ মৃত নয়। কিন্তু তা কি সম্ভব ছিলো? না। কি করে তা হতে পারে? অসম্ভব! ওই মহিলা আমার মা নন। হতে পারেন না। আমাকে দেখে উনি কি বলেছিলেন? উনি কি মনে করেছিলেন আমি মরে গেছি?

'সোনা মানিক আমার !'…চিরদিনই আমার আসার বা যাবার সময় যে আনন্দ-ময় কান্নার উন্মাদনা নিয়ে মা আমার সামনে এসে দাঁড়াতো, ঠিক তেমনিভাবেই আমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরার জন্যে দু চোখে উদ্গত অশ্রু নিয়ে উনি আমার দিকে ছুটে এলেন।

আমি পাথর হয়ে গেলাম। দেখলাম, উনি দুই স্নেহময় বাহু মেলে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ক্ষুধিতের মতো আমাকে চুমু দিচ্ছেন, যেন আমাকে খেয়ে ফেলতে চাইছেন…ফোঁপাতে ফোঁপাতে আমাকে কতো সোহাগের কথা বলছেন, যা আর কোনোদিনও আমার অস্তিত্বের গভীরে বৃষ্টি হয়ে নামবে না।…আচমকা আমার অভিব্যক্তিহীন মুখটা নিজের করপুটে তুলে নিয়ে উনি আমার মুখোমুখি তাকালেন, প্রশ্নের দাপটে শ্বাসরোধ করে তুললেন আমার। কয়েক মুহূর্ত পরে আমিও কাঁদতে শুরু করলাম, কিন্তু আমার অভিব্যক্তির কোনো পরিবর্তন হলো না এমন কি আমি একটু নড়াচড়াও করলাম না। আমার অশ্রু যেন শিলামূর্তির চোখ থেকে চুঁইয়ে আসা সুবিশুদ্ধ জল।

শেষ পর্যন্ত কোনোক্রমে আমি আমার আত্মার সমস্ত বিকিরিত আলোগুলোকে একত্রিত করলাম। কয়েক পা ফিরে গেলাম পেছনের দিকে। তারপর, হে ঈশ্বর, আমি আমার মাকে চোখের সামনে ফুটে উঠতে দেখলাম যে মাকে আমার মন কিছুতেই মেনে নিতে রাজি নয়, যাকে সে অস্বীকার করে, যাকে সে ভয় পায়। ঈশ্বর জানেন কোন পবিত্র লগ্নে আমি তাঁর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম, কিন্তু সেই মুহূর্ত পর্যন্ত আমার কাছে তা অজানা ছিলো। নেহাইতে আছড়ে পড়া হাতুড়ির মতো, জরায়ুর বন্ধন ছিন্ন করে জন্মের মুহূর্তে শিশুর প্রথম কান্নার মতো—যে কান্নার মাধ্যমে শিশু মাকে জানিয়ে দেয় সে জীবন্ত অবস্থায় বাইরের পৃথিবীতে যাচ্ছে, যে কান্নার মাধ্যমে সে মায়ের কাছে এক সঙ্কেতধ্বনি রেখে যায় যার সাহায্যে ভবিষ্যতে তারা পরস্পর পরস্পরকে চিনে নিতে পারবে চিরদিন ঠিক তেমনি করে মায়ের পরিপূর্ণ উপস্থিতিতে আমি এক নিঃশব্দ চিৎকারে মুখর হয়ে উঠলাম। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি গুঙিয়ে কেঁদে উঠলাম।

'কক্ষণো না ! কিছুতেই না ! আমার মা বহুদিন আগে মরে গেছে। এ হতে পারে না…'

আমার কথায় উনি ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। যেন ওঁর সন্দেহ হলো, আমি সত্যি সত্যিই আমি কি না। তারপর ফের উনি আমাকে নিজের বুকে টেনে নিলেন। আমরা দুজনে মিলে এতো কান্না কাঁদলাম যা কোনো জীবিত প্রাণী আজ অব্দি কাঁদেনি—কাঁদবেও না কোনোদিন।

ঠিক সেই মুহূর্তে রক্তের যে দাগ আমি আমার মুখে দেখেছিলাম, তার স্মৃতি অন্য এক পৃথিবী থেকে ভেসে আসা সঙ্কেতের মতো আমার মনের মধ্যে জেগে উঠলো।

'বাছা আমার!' মহিলা ফিসফিসিয়ে বললেন, 'তুই কি আমার সেই মরা-ছেলে, যাকে আমি নিজের চোখে কফিনের মধ্যে শুয়ে থাকতে দেখেছিলাম? হ্যাঁ, তুই-ই তো। তুই তো সে! আমি ভগবানে বিশ্বাসী। আয়, আমার বুকে আয়! তুই কি বুঝতে পারছিস না, আমি তোর মা? একবার তাকা আমার দিকে! ভালো করে তাকিয়ে ভাখ। আমাকে ছুঁয়ে ভাখ, বাছা! তুই বিশ্বাস করছিস না, আমি তোর মা --এও কি সম্ভব?'

ফের আমি মহিলাকে ভালো করে দেখলাম। সাদা চুলে ঢাকা ওঁর প্রাচীন মাথাটা স্পর্শ করলাম। কিন্তু না, আমি কিছুই বিশ্বাস করলাম না।

'হ্যাঁ, আমি আপনাকে দেখেছি···আপনাকে ছুঁয়েছি!' আমি জবাব দিলাম, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। এতোগুলো অসম্ভব ঘটনা কিছুতেই ঘটতে পারে না!'

তারপর প্রাণপণ অট্টহাসিতে আমি মুখর হয়ে উঠলাম।

অনুবাদ / দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ফরাসী বন্দীশালার একটি দৃশ্য

জঁা রিস্

লম্বা একটা সারির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন বৃদ্ধ আর একটি শিশু। সবাই অপেক্ষা করছে কখন অনুমতিপত্র দেখিয়ে ভেতরের ঘরটায় প্রবেশ করতে পারবে, যেখানে নির্দিষ্ট দিনে গরাদ-ঘেরা ছোট ছোট এক-সারি খুপরির মধ্যে দিয়ে কয়েদীরা পনের মিনিটের জন্যে তাদের বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে কথা বলতে পারে।

দুর্বলভাবে, অথচ ঐকান্তিক ইচ্ছায় বৃদ্ধ ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। অসভ্যের মতো চিৎকার করে কারারক্ষী যখন তাকে নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়ার কথা বললো, বৃদ্ধ তখনও সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

'পেছিয়ে যাও বলছি!' কারারক্ষী ধমকে উঠলো। 'তুমি আমার কথা বুঝতে পারছো না? তুমি কি ফরাসী নও?' বৃদ্ধ মাথা নাড়লো। 'ও, সেই জন্যে!' বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কথাটা বলে রক্ষী বৃদ্ধকে সারির দিকে ঠেলে দিলো। বৃদ্ধ হতচকিত হয়ে কয়েক পা পেছিয়ে গেলো, তারপর দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

বৃদ্ধের চেহারাটা বেশ নম্র আর সৌম্য। ছোট ছোট করে ছাঁটা পাকা গোঁফ। কিন্তু ওর পোশাকের অবস্থা খুবই করুণ, মাথায় টুপি নেই, গলায় একটা লাল রুমাল জড়ানো। প্রায় ছানি পড়ে আসা একজোড়া ঘোলাটে চোখ।

সঙ্গের ছেলেটি খুবই ছোট, কাঠির মতো শীর্ণ হাত-পা। এক হাতে বৃদ্ধকে শক্ত

করে আঁকড়ে ধরে বড় বড় বাদাম। চোখ মেলে কারারক্ষীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সারিতে ওর মতো আরও কয়েকটা শিশু রয়েছে।

একজন মহিলার সঙ্গে রয়েছে দুটি বাচ্ছা—একটি কোলে, অন্যটি মার ঘাঘরা আঁকড়ে রয়েছে। সমস্ত ভিড়টাই নিশ্চুপ আর কি যেন একটা আশঙ্কায় থমথমে। নত মুখে মেয়েরা একে অপরের দিকে চোরা চোখে তাকাচ্ছে, মেয়েরা সাধারণত যেমনটা করে—বৈরীতায় নয়, বরং ওদের তাকানোর সেই ভঙ্গিতে সখ্যতারই একটা আভাস ফুটে উঠছে।

ওরা যেখানে অপেক্ষা করছে, সেই হলঘর থেকে সোজা ওপরে উঠে গেছে একটা সিঁড়ি। সিঁড়ির শেষ প্রান্ত থেকে চলে গেছে সুদীর্ঘ একটা ঢাকা-বারান্দা। চুনকাম থাকা সত্ত্বেও বারান্দাটা কেমন যেন গা-ছমছমে আর অন্ধকার। এখানে ওখানে দেওয়ালের গা ঘেঁষে সান্ত্রীরা সব বসে রয়েছে। স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে ওদের মনে হচ্ছে বিশাল এক একটা লোমশ মাকড়শার মতো।

যারা অপেক্ষা করছে তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা খুবই কম। আর মেয়েদের প্রায় সবারই অবস্থা চাবকে ঠাণ্ডা করে দেওয়ার মতো, কেবল সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি তরুণীর সাজসজ্জা খুবই সপ্রতিভ ধরনের। ওরা নিজেদের মধ্যে হাসছে, গল্প করছে, ওদের কালো চোখের অভিব্যক্তিতে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব।

সারিবদ্ধ জনতাকে ভয়চকিত মনে হলেও, ওরা খুব একটা অখুশী নয়। দেওয়ালের গায়ে গুটিসুটি হয়ে রয়েছে একজন বৃদ্ধা। নিজের মনেই সে মুচকি মুচকি হাসছে। সুন্দর দেখতে কোনো ঈশ্বরের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ মর্যাদায় দাঁড়িয়ে থাকা রক্ষীটা পা বদল করার সময় নিজের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। ওই লোকটাই ন্যায়, সততা আর দুর্বৃত্তকে শাস্তি দেবার মতো অমোঘ এক শুভ শক্তির প্রতিভূ তার। অনাবৃত ঢালু কপালটায় ফুটে উঠেছে একটা অবিলোপী ভ্রূকুটি, ভারি চোয়ালটা ঝুলে এসেছে সামনের দিকে। বেশ লম্বা আর বলিষ্ঠ চেহারা। উৎসুক চোখে সে তরুণী দুটির দিকে তাকাচ্ছে আর বুক ফুলিয়ে গোঁফ চোমরাচ্ছে।

সারিটা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। চোখে পড়ছে টেলিফোনের সারি সারি বক্সের মতো ছাদবিহীন ছোট ছোট খুপারগুলো।

মাথার ওপরের চাতালটায় দেখা যাচ্ছে অন্য একজন সান্ত্রীর কুচকাওয়াজের ভঙ্গিতে যাওয়া-আসা-করা পা দুটোকে। সে কান পেতে শুনছে নিচের কথাবার্তা, সব কণ্ঠস্বর মিশে যেটা অন্তহীন একটা গুঞ্জনের মতো মনে হচ্ছে।

প্রথম রক্ষীটি তার ঘড়ির দিকে তাকালো, তারপর ভয়ঙ্কর রকমের উৎকট শব্দে দরজাগুলো সব খুলে দিতে লাগলো। চোখে মুখে বিহ্বলতার ভাব নিয়ে বাইরে

বেরিয়ে এলো একটা জনস্রোত, ওদের দেখা করার সময় শেষ হয়ে গেছে। রক্ষী ইশারায় অপেক্ষমান দলটাকে এগিয়ে গিয়ে যার যার জায়গা নেবার কথা বললো। তার সামনে দিয়ে যাবার সময় সেই কালো চোখ একটি তরুণীর দিকে সে কটমট করে তাকালো, কিন্তু আসন্ন সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি হিসেবে ছোট আয়নার দিকে তাকিয়ে মুখে পাউডার ঘষতে ব্যস্ত থাকার ফলে মেয়েটা ওসব কিছু লক্ষ্যই করলো না।

প্রতিটা ছোট ছোট খুপরির অন্য প্রান্তে তখন এসে দাঁড়িয়েছে এক একজন কয়েদী, গারদ আঁকড়ে রীতিমতো কষ্ট করে দর্শনার্থীর সঙ্গে কথা কইছে আর প্রায় প্রতিটা শব্দেই চমকে উঠছে। কেননা পনেরো মিনিট সময় তার কাছে মারাত্মক রকমের সংক্ষিপ্ত এবং প্রতিনিয়তই সতর্ক থাকতে হচ্ছে কখন রক্ষী তাকে সরে যেতে বলবে। পাছে রক্ষীর গলা ঠিকমতো শুনতে না পায় সেই ভয়েই সে তটস্থ।

আবার শুরু হয়ে গেলো সেই ক্লান্তিকর গুঞ্জন। ওপরতলার রক্ষীটি হাই তুললো। বাইরের রক্ষীটি উদাস চোখে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে গোঁফ চোমারাচ্ছে। অনুমতিপত্র নিয়ে নতুন আর একটা দল এসে দাঁড়ালো সিঁড়ির সামনে। রক্ষীটি ভারিক্কী চালে এগিয়ে এসে ওদের সার বেঁধে দাঁড়াবার হুকুম দিলো।

পনেরো মিনিট শেষ হয়ে যেতেই আবার দরজাগুলো খুলে দেওয়া হলো।

পাশ দিয়ে ফিরে যাবার সময় রক্ষীটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো কালো চোখ সেই মেয়েটার দিকে। মেয়েটাও সোজা চোখ তুলে তাকালো। ওর চোখের দৃষ্টিতে তখন অবজ্ঞা বা প্রলোভনের কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। অস্ফুট হেসে, প্রকৃতপক্ষে মেয়েটাকে পথ দেবার জন্যে রক্ষাকে সামান্য একটু পেছিয়েই যেতে হলো।

আগের চাইতে আরো বিহ্বল ভঙ্গিতে, ক্লান্ত দেহটাকে টানতে টানতে বৃদ্ধ এলো সবার পেছনে। বন্দীশালার ফটকে সবাইকে অনুমতিপত্র জমা দিতে হয়, কিন্তু বৃদ্ধ কিছু লক্ষ্য না করেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। অনুমতিপত্র যে জমা নিচ্ছিলো, পদস্থ সেই কর্মচারীটি চিৎকার করে উঠলো, 'এই যে মশাই, আপনার অনুমতিপত্রটা!' বৃদ্ধ আঁতকে উঠলো। ওর ঘোলাটে চোখ দুটো তখন জলে ভরে উঠেছে। অনুমতিপত্রটা যখন ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো, চকিতে হাত নাড়তে নাড়তে দুর্বোধ্য ভাষায় সে কি যেন সব অনর্গল বলতে লাগলো।

থমকে দাঁড়িয়ে একজন মহিলা ওকে ব্যাখ্যা করে বোঝালো যে পরের বারে দেখা করতে আসার সময় চাইলেই অনুমতিপত্রটা আবার ফেরত পাওয়া যাবে, কিন্তু বৃদ্ধ সেসব কিছুই বুঝতে পারলো না।

ফটকের সান্ত্রীটি হাঁক ছাড়লো, 'যাও যাও; সরে যাও সব।'

বাইরে তখন পারিতে ফেরার ট্রাম ধরার জন্যে সবাই তাড়াহুড়ো করছে।

হাসি-খুশিতে উচ্ছল তরুণী দুটি দৃপ্ত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। বৃদ্ধ মাথা নিচু করে বিষাদময় ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে আর নিজের মনেই বিড়বিড় করছে। ছোট ছেলেটা খুদে খুদে পায়ে লাফাতে লাফাতে চলেছে ওর পাশাপাশি—তার তিনটি পদক্ষেপ বৃদ্ধের একটা পদক্ষেপের সমান। বড় বড় বাদামী চোখ মেলে সে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে দুর্বোধ্য পৃথিবীটার দিকে।

অনুবাদ / অসিত সরকার

আগুন

ইয়ন চিন গন

আধুনিক কোরিয়ান সাহিত্যে বাস্তববাদী কথাশিল্পীদের মধ্যে ইয়ন চিন গন (১৯০০-১৯৪৩) বিশেষ ভাবে চিহ্নিত। প্রথমে টোকিওর একটি উচ্চবিদ্যালয়, পরে সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। কিন্তু স্বল্লায়ু জীবনে তিনি লিখেছেন খুব কম, অবরোধের সময় জাপানী নিষেধাজ্ঞার ফলে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছেন আরও কম। তবু মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনা, সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি যে নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'কোরিয়ার মুখগুলি' ১৯২৬ গল্পগ্রন্থে তা সত্যিই তুলনাবিহীন।

মাসখানেক হলো সুনির বিয়ে হয়েছে। এই সবে ও পনেরোয় পা দিয়েছে। ওর অস্ফুট মানসিকতায় কেবলই মনে হয় দম বন্ধ হয়ে আসছে, যেন ভারি একটা পাথর চাপানো রয়েছে বুকের ওপর। পাথর সাধারণত হিমেল, কিন্তু সুনির বুকের ওপর যেটা চেপে থাকে, সেটা ঘুঘুর মতো নরম, স্যাঁতসেঁতে আর সুসংবদ্ধ, মোসুমার দমকা বাতাসের মতো শ্বাসরোধী আর একশো মনের চাইতেও বেশি ভারি। তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো সুনি হাঁফিয়ে ওঠে। তারপরেই শুরু হয়ে যায় দুর্বিষহ যন্ত্রণা—ছিঁড়েখুঁড়ে নিষ্পেষিত করে ওর কটিতট, ব্যথায় থর থর করে কাঁপতে থাকে শ্রোণী-দেশ। লোহার একটা মুগুর যখন দাবড়ে বেড়ায় ওর দেহের গভীরে, শক্ত করে চেপে ধরে বুকটাকে, ওর মুখখানা হাঁ হয়ে যায়, প্রবলভাবে আক্ষিপ্ত হতে থাকে সারা দেহ। স্বাভাবিকভাবে এই তীব্র যন্ত্রণা ওকে জাগিয়ে তুলতে পারতো, কিন্তু সারা-দিনের অক্লান্ত পরিশ্রম—মাথায় করে কলসীতে জল বয়ে আনা, ধান ভানা, জল-কলের জন্যে পাখা ঘোরানো, চাষের জনমজুরদের জন্যে ধানক্ষেতে খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়া, প্রভৃতি নানান কাজ ওকে এমনই ক্লান্ত করে তুলতো যে কোনো কিছুই ওকে আর জাগিয়ে রাখতে পারতো না। তা বলে ও যে গভীর ঘুমিয়ে পড়তো তা কিন্তু নয়। 'আমি মরে যাবো, এই মুহূর্তে মরে যাবো, যদি যন্ত্রণাটা আরও বেড়ে ওঠে। আমাকে চোখ মেলতেই হবে।' সুনি নিজের মনেই বলতো, কিন্তু কিছুতেই চোখ মেলতে পারতো না, যেন ও দুটো আঠার মতো জুড়ে গেছে। গাঢ় তন্দ্রাচ্ছন্নতার বিশৃঙ্খল স্রোতটাকে ও কিছুতেই ঠেলে সরিয়ে দিতে পারতো না। ইতিমধ্যে হাঁ হয়ে গেছে মুখখানা, আক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে সারা শরীর; দাঁতে দাঁত চেপে সুতীব্র যন্ত্রণা-

টাকে ও সহ্য করার চেষ্টা করছে। একটু পরে দুঃস্বপ্নে ভারি হয়ে থাকা চোখের পাতা দুটো একটু একটু করে মেলতে পারলো, আর তখনই দেখতে পেলো স্বামীর মুখটাকে, ঠিক ওর মুখের ওপরে, ভাতের হাঁড়ির বেশ বড় গোল একটা সরার মতো। লোকটার কালো মুখখানা চারপাশের আবছা আঁধারের সঙ্গে মিশে থাকলেও, সাদা চোখ দুটো যেন জ্বলছে এবং যেটা ও স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলো—হলদে ছোপধরা ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত আর অর্ধেক ফাঁক হয়ে থাকা লালায় ভেজা পুরু ঠোঁট। গাঢ় বাদামী দুটো কাঁধের মাঝখানে তার সরার মতো বড় মুখখানা ক্রমশ বড় হতে হতে সয়াবীনের একটা ঝাড়, এমন কি ঘরটাকেও ছাড়িয়ে গেলো। নাভি থেকে উঠে আসা একটা আতঙ্ক আর দেহাভ্যন্তরের প্রতিটা অঙ্গকে মুচড়ে ধরা তীব্র যন্ত্রণায় বিহ্বল হয়ে সুনি এখন কাঁপছে, যে অনড় ঘুম ওর ঘাড়টাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে ও এখন ছটফট করছে। তারপরেই বুঝতে পারলো ব্যাপারটা কি ঘটেছে।

অবশেষে যন্ত্রণা থেকে ও যখন মুক্তি পেলো, গ্রীষ্মের স্বল্পায়ু রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দৈত্যের মতো বিশাল চেহারাটাকে ও ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখলে, তারপর বেরিয়ে গেলো। সুনি যখন বুঝতে পারলো লোকটা মাঠের কাজে বেরিয়ে গেছে, তখনই ও হাফ ছেড়ে বাঁচলো, যেন এই প্রথম সম্পূর্ণ জেগে উঠলো। কালো কালির মতো অন্ধকারে মোড়া কাগজের জানলাটা এখন সবে ধূসর হতে শুরু করেছে, মেঝেতে পাতা হলুদ মাদুরের বিনুনা করা প্রান্তগুলো চোখে পড়ছে। কলুঙ্গিতে রাখা আয়নার উজ্জ্বলতা, মাথার কাছে দেওয়ালে ঝোলানো নোংরা জামাকাপড়—এ সবই প্রমাণ করে দিচ্ছে এটা ওর শত্রুপুরী। 'কিন্তু আমি এই মাদুরটার ওপর এলুম কি করে?' সুনি এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ভাবার চেষ্টা করলো, 'গতরাত্রে আমি তো অন্য একটা জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম! নৈশ-নির্যাতন এড়াবার জন্যে, বাসন-কোসন মাজার পর ও খামারবাড়ির এক কোণে লুকিয়েছিলো। মাটিতে চট বিছিয়ে ধানের দুটো বস্তার গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিলো। কিন্তু পা দুটো ছড়াতে না ছড়াতেই গভীর ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তারপর কেমন করে ও আবার এই শত্রুপুরীতে প্রবেশ করলো? লোলুপ চোখে লোকটা নিশ্চয় বাড়ির প্রতিটা আনাচে কানাচে ওকে খুঁজেছে, দেখতে পেয়ে বলিষ্ঠ বাহুতে ওকে বয়ে এনেছে এই শত্রুপুরীতে, তারপর বৈরী নির্যাতনে মিটিয়ে নিয়েছে নিজের প্রয়োজন।

নিজের স্বপ্নিল আবেশটুকুকে আরও স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারার আগেই তন্দ্রাচ্ছন্নতার একটা বিশৃঙ্খল জোয়ার ওর বিবশ দেহটাকে সম্পূর্ণ তলিয়ে দিয়েছে।

'এখনও ওঠার সময় হলো না?' চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করার ভঙ্গিতে শাশুড়ী

বলে উঠলো, 'মাড়ি ফোটাবি কখন ?'

বুড়ির চিল-চেঁচানি শেষ হবার আগেই সুনি লাফিয়ে উঠলো। এক হাতে চোখ রগড়ে অন্য হাতে স্বামীর ছাড়িয়ে নেওয়া কাপড়-চোপড় পরতে লাগলো। ভোরের দিকে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম নাকি ? ওর অবস্থাটা ঠিক সেনাপতির আদেশের অপেক্ষায় উৎকীর্ণ হয়ে থাকা সৈনিকের মতো। তাই ঘুমের মধ্যেও শাশুড়ীর গলা শুনে ওকে আতঙ্কিত হয়ে উঠতে হয়।

সুনি যখন বারান্দায় এসে দাঁড়ালো, তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। মরা মানুষের চোখের মতো ভুতুড়ে চাঁদটা আবছা কুয়াশার মধ্যে অনেকটা ডুবে গেছে।

সোজা রান্নাঘরে এসে সুনি আগুন জ্বালালো, তারপর গত রাত্রেই প্রস্তুত করে রাখা পাত্রটা উনুনে চাপিয়ে দিলো। গ্রীষ্মকাল, তবু নিশান্তিকার হাওয়ায় একটা হিমেল ভাব রয়েছে, তাই আগুনের উত্তাপটুকু ওর ভালোই লাগলো। দেবদারুর শুকনো ডালপালা থেকে নেচে ওঠা রক্তিম শিখাগুলোর দিকে ও নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলো। অস্বচ্ছন্দ ভরা রাতটা শেষ হলো, সুনির জন্যে শুরু হলো নানান কাজে ঠাসা আর একটা দিন।

মাড়ি ফোটানোর পর, সকালে ভাত রান্নার জন্যে ওকে জল আনতে যেতে হলো। কলসীটা মাথায় বসিয়ে দু হাত দিয়ে ধরে রাখার সময় ভোরের হিমেল হাওয়া ধীরে ধীরে নেমে এসে ওর বাহুসন্ধি দুটোকে একেবারে বিবশ করে দিলো। ঝরনার ধারে কলসীটা নামিয়ে রেখে সুনি আড়মোড়া ভাঙলো। পাহাড় আর শৈলশিরাগুলো কুয়াশায় ঢেকে গেছে, যেন কোনো স্বপ্নের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাষীদের খুশিতে উপচে দিয়ে গত কয়েক দিনে সুপ্রচুর বৃষ্টি হয়েছে, ধানের ক্ষেত-গুলো ভরে রয়েছে কানায় কানায় ; শুভ্র কুয়াশায় জমাট-বাঁধা পারার মতো ওগুলো ঝিকমিক করছে আর সদ্য-রোয়া সবুজ ধানের চারাগুলো যেন ঘুমন্ত চোখ ঢুলছে। এই রকম একটা স্থবির দৃশ্যাবলীর মধ্যে কেবল ঝরনাটাকেই যা মনে হচ্ছে জেগে রয়েছে, বয়ে চলেছে মিষ্টি একটা ঘুমপাড়ানিয়া সুরে। ভালো করে দেখবে বলে সুনি পাড়ের আরও কাছে এগিয়ে গেলো। জলটা সম্পূর্ণ জেগে ওঠা চোখের মণির মতো স্বচ্ছ। কলসীটা ও ঝুপ করে স্রোতের মধ্যে ডুবিয়ে দিলো, আর নদীর বুকের ক্ষতটাকে বুজিয়ে দেবার জন্যে চারপাশ থেকে বৃত্ত রচনা করে ধেয়ে এলো জলস্রোত। ক্ষত তেমন মারাত্মক নয় বুঝতে পেরে, জলের বুকে আরো কয়েক গভীর বৃত্ত রচনা করে স্রোতটা আবার ফিরে গেলো। সুনি জল ভরতে লাগলো।

প্রথম কলসীটা ভরার পর ও দ্বিতীয় কলসীটাও ভরলো···আর তখনই চোখে পড়লো এক ঝাঁক চাঁদা মাছ খেলতে খেলতে চলে গেলো ওর হাতের সামনে দিয়ে।

ওদের এই উচ্ছল বেপরোয়া ভঙ্গিটাকে সুনি হিংসে করে। বহুদিন চুপিসাড়ে সুনি ওদের ধরার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ওরা খুব সহজেই পালিয়ে গেছে। আজও কয়েকবারের উর্বর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, কয়েকটা পাথর তুলে নিয়ে ঝাঁকগুলোর দিকে এলোপাথাড়ি ছুঁড়লো। তাতে শুধু ছিটকে আসা জলে ওর মুখ আর পোশাকই ভিজলো। সুনির কান্না পেয়ে গেলো। পাথর কোনো কার্যকরী অস্ত্র নয় দেখে ও আবার জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে মাছ ধরতে লাগলো। এবার হতভাগ্য একটা চাঁদা ওর আঁজলার মধ্যে বন্দী হলো। আঙুলের ফাঁক দিয়ে জলটা চলে যেতেই মাছটা ওর তালুর মধ্যে লাফাতে লাগলো। সুনি বেশ মজা পেলো। কিন্তু একটু পরেই বেচারি একেবারে নেতিয়ে পড়লো, সুনি ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো মাটিতে। দু-একবার ছটফট করেই মাছটা মরে গেলো। সুনিশ্চিত হবার জন্যে সুনি আঙুল দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো। কয়েক মুহূর্ত আগেও যেটা বেঁচে ছিলো, লাফাচ্ছিলো, এখন সেটা মৃত্যুলীন। নিজের এই দুষ্কৃতির জন্যে সুনি আতঙ্কে শিউরে উঠলো, কেবলই মনে হতে লাগলো মৃত মাছটার আত্মা ওর চারপাশে ঘোরাফেরা করছে। তাড়াতাড়ি জল নিয়ে ও ঘরে ফিরে চললো, কিন্তু সারাক্ষণই ওর মনে হতে লাগলো পেছন থেকে কে যেন ওর চুল টেনে ধরছে।

প্রাতরাশ শেষ হতে না হতেই ওকে জাঁতায় যব পেষাইয়ের কাজে বসতে হলো। কোমর পিঠ ধরে এসেছে, হাত দুটো ব্যথায় ভারি হয়ে উঠেছে, তবু ওকে পেষাইয়ের কাজ করতে হলো।

স্বামীর সঙ্গে ক্ষেতে যারা ধানের চারা রুইছে, সেই জনমজুরদের জন্যে দুপুরের খাবার রান্না করে ওকে মাঠে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। ভাত আর তরকারি বোঝাই কাঠের বারকোশটার ভার মাথায় এমন ভাবে চেপে বসে, মনে হয় কচ্ছপের মতো ও বোধহয় মাটির নিচে সেঁধিয়ে যাবে। ওর সারা শরীর যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়। মাথায় ভারি বোঝা নিয়ে টলমলে পায়ে ও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

মেঘবিহীন ঝকঝকে নীল আকাশ থেকে নিদাঘের নগ্ন সূর্যটা ঝরিয়ে চলেছে একটা জলন্ত উত্তাপ। বাচ্চাদের মতো জল ছিটিয়ে মাটির সন্তানেরা ধরিত্রীর উর্বর বুকে রোপণ করে চলেছে আগামী দিনের স্বপ্ন। ঝুঁকে পড়ে কাজ করার সময়, পিঠের কাছে পোশাকের ফাঁক দিয়ে স্পষ্টই চোখে পড়ছে রোদে পোড়া তামাটে চামড়া। কপাল থেকে ঘামের ফোঁটাগুলো মুছে নেওয়ার ফলে চোখেমুখে লেগে রয়েছে ঘন লালচে মাটির ছোপ। যন্ত্রণায় হাড় পর্যন্ত টাটিয়ে ওঠা সত্ত্বেও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চারাগুলো সব পুঁতে ফেলা যায়, সেই সংকল্প নিয়ে ওরা হাত চালিয়ে যাচ্ছে আর উচ্ছল স্বরে উপচে ওঠা ফসলের গান গাইছে।

দুপুরের উলঙ্গ সূর্যটা ঢেলে চলেছে তার জ্বলন্ত উত্তাপ। পায়ে মাড়ানো সবুজ ঘাসগুলো আবার মাথা তুলে আলোর উজ্জ্বল বর্শাফলকের মাঝে হাসছে। আনন্দ আর গানে জীবনকে প্রাচুর্যে ভরিয়ে তোলার জন্যে চলেছে মানুষের এক দুর্মর প্রচেষ্টা। সংক্ষেপে বলা যায়, এটা এমনই একটা জগৎ যেখানে উপচে উঠছে শৌর্য, যেখানে ভঙ্গুর শারীরিক অসুস্থতাকে অবজ্ঞার চোখেই দেখা হয়। অথচ সুনি এমনই দুর্বল, ঘরের বাইরে চোখ-ধাঁধানো এই আলোর সমুদ্রে বুক ভরে স্বচ্ছ বাতাসটুকুও নেবার ক্ষমতা ওর নেই। সারা শরীর ঝিমঝিম করছে, মাথাটা ঘুরছে। যদিও ঘেমে নেয়ে উঠেছে, তবু কেমন যেন শীত-শীত লাগছে। সুনি লাফিয়ে সবে যখন একটা গর্ত পেরুতে যাবে, জলে সূর্যের আলো এমন ঝিকমিক করে উঠলো যে ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। আর হঠাৎই, সকালে যে চাঁদা মাছটাকে মেরে-ছিলো, সেটা বিরাট একটা তিমির আকার ধারণ করে ওর পথ আগলে দাঁড়ালো, নিজের মনে সচকিত আর্তনাদ করে সুনি যে মুহূর্তে পালাবার চেষ্টা করলো, ওর মনে হলো চুলের মুঠি ধরে কে যেন ওকে ঘোরাচ্ছে। পর পর কয়েকটা ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জন শুনতে শুনতে ও মূর্ছা গেলো।

একটু পরে নিজেকে সামলে নিলো বটে, কিন্তু ওর চেতনা তখনও স্বচ্ছ হয়নি। বিহ্বল একটা অবস্থার মধ্যে ও কেবল এইটুকু স্মরণ করতে পারলো—মাথায় খাবারের পাত্র নিয়ে ও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলো, জলে সূর্যের আলো পড়ে ঠিকরে উঠছিলো আর চাঁদামাছের মৃত আত্মাটা ওর পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিলো। কিন্তু খাবারের পাত্রটা গেলো কোথায়? চারদিকে চোখ মেলে তাকাতেই সুনি ভয়ে আঁতকে উঠলো, দেখলো শ্বশুরপুরীর সেই ঘরটাতেই ও শুয়ে রয়েছে। চকিতে ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। আয়ত দু চোখে তখনও জড়িয়ে রয়েছে ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো একটা বিহ্বল আতঙ্ক।

উঠোনে শুকতে দেওয়া গম মেলতে মেলতে শাশুড়ী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাকালো। ভাত-তরকারি নষ্ট করে ফেলার জন্যে সুনিকে যাও বা ক্ষমা করা যায়, কিন্তু অল্প কয়েকটা অবশিষ্ট থাকা চীনামাটির বাসন ভেঙে ফেলার দুঃখ বুড়ি কিছুতেই ভুলতে পারছে না। অথচ মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া এবং এই সবে সামলে ওঠা কিশোরী বউটিকে সে গায়ের ঝাল মিটিয়ে কিছু বলতেও পারছে না।

'এখনই উঠে আসার দরকার ছিলো কি? শুয়ে থাকলেই তো পারতিস? যা যা, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়!' মনে হলো নরম করে বলতে পারার জন্যে শাশুড়ীকে রীতিমতো কষ্ট করতে হলো।

সুনি তবু টলমলে পায়ে উঠোনে নেমে এলো।

'বললুম না ঘরে গিয়ে বিছনায় শুয়ে থাকতে!' এবার শাশুড়ীর গলার স্বর আরও চড়ে উঠলো।

স্বনি বললো, 'না না, আমি ঠিক আছি।'

ওর কাছে শত্রুর ঘরে ঢোকার চাইতে মরা ঢের ভালো।

'ফের আমার মুখের ওপর চোপা! এ সংসার কি তোর নিজের খেয়াল-খুশি মতো চলবে নাকি?' ভেতরের বিদ্বেষটাকে আর কিছুতেই চাপতে না পেরে বুড়ি পাখাটা নিয়ে তেড়ে এলো স্বনির দিকে।

'নির্লজ্জ, বেহায়া কোথাকার! আমার কেনা সাধের বাসনগুলো ভেঙেও তোর স্বস্তি হয়নি? এখন এসেছিস কাজ দেখাতে!' পাখার বাঁট দিয়ে বুড়ি অন্ধের মতো স্বনির মাথায় পিঠে পায়ে মারতে লাগলো। স্বনি কিন্তু কোনো ব্যথা অনুভব করলো না, বরং ক্লান্ত শ্রান্ত দেহটাতে কেমন যেন অপার্থিব একটা তৃপ্তিই অনুভব করলো।

'এমন ঢ্যাটা মেয়ে আমি বাপের জন্মেও দেখিনি! চোখে এক ফোঁটা জল নেই!' ক্লান্ত না হয়ে ওঠা পর্যন্ত বুড়ি সমানে পিটিয়ে গেলো, তারপর পাখাটা এক সময়ে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, 'দূর হ আমার সামনে থেকে! যা, রান্নাঘরে গিয়ে ভাত বসা।'

শাশুড়ীর নির্দেশমতো রান্নাঘরে গিয়ে স্বনি চাল ধুতে বসলো।

একটু পরেই সূর্য অস্ত গেলো। ঘুপসি রান্নাঘরটায় এমন আঁধার ঘনিয়ে উঠলো মনে হলো যেন রাত। আতঙ্ক জড়ানো ভয়ঙ্কর আর একটা রাত হাঁ-মুখ করে তেড়ে আসছে ওর দিকে। সূর্যাস্তের পর থেকে এই ভয়টাই ওকে সব চাইতে বেশি করে পেয়ে বসে। রাতের আতঙ্কের থেকে মুক্তি পাবার পরিকল্পনা ওর প্রতিবারেই ব্যর্থ হয়েছে, তবু ক্ষীণ একটা আশাকে ও আগলে রেখেছে বুকের নিভৃতে। এখন নতুন কোনো পরিকল্পনার হদিস না পেয়ে ও নিজের মনেই বিলাপ করতে লাগলো: বাবা-মারা রয়েছে কত যোজন মাইলই না দূরে, কি দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেই না কাটছে ওর দিন আর রাত্রি, আজ কি নির্মম ভাবেই না শাশুড়ীর হাতে মার খেতে হলো! অতল দুঃখে ওর গলার স্বর বুজে এলো, চোখের কোল থেকে নেমে এলো অশ্রুধারা। সেই অঝর অশ্রুধারা মুছতে গিয়ে ওর হাত দুটো কেবলই ভিজে উঠতে লাগলো। ঠিক সেই সময় পেছন থেকে কে যেন ওর কাঁধ ধরে নাড়া দিলো। কিছু না ভেবে স্বনি মুখ ফেরালো, আর তখনই মনে হলো হৃৎপিণ্ডটা বুঝি এখুনি ছিটকে বেরিয়ে আসবে। দেখলো ঝুঁকে পড়ে স্বামী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। লোকটা মাঠ থেকে কখন ফিরে এসেছে ও টেরই পায়নি। স্বভাবের পক্ষে বেমানান হওয়া সত্ত্বেও তার রোদে-পোড়া, কাদামাখা মুখখানায় নিশ্চয় ফুটে উঠেছিলো কোনো কোমল অভিব্যক্তি, কিন্তু শিকারী বাজের থাবায় বন্দী ছোট্ট একটা ভীরু পাখিরই মতো দম

বন্ধ হয়ে আসা সুনির সেই কোমল অভিব্যক্তিকে তারিফ করার কোনো মানসিকতাই তখন ছিলো না।

'এই, কাঁদছো কেন ? চুপ করো। কেঁদো না।' বিশাল চেহারার লোকটা পাশে বসে ওকে সান্ত্বনা দিলো, সরার মতো চওড়া হাতে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিলো, তারপর চলে গেলো।

স্বামীকে দেখে সুনি আরও বেশি কুঁকড়ে গেলো। বুকের ওপর চেপে বসা সেই ভারি পাথর, সারা দেহটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলা সেই লোহার মুগুরের আতঙ্কই ওর চোখের জলের উৎসধারাটাকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছে; ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে রাতটাকে এড়িয়ে চলার যাকিছু ফন্দী। না, ও যে ঠিক রাতটাকে ভয় পায় তা নয়, ভয় পায় শত্রুপুরীর ওই ঘরটাকে। চোখের জল মুছিয়ে দেবার পর লোকটা কি সোজা গিয়ে ঢোকেনি ওই ঘরটাতে ? ওই ঘরটা ছাড়া তো আর এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে লোকটা ওর ওপর অমন করে নির্যাতন করতে পারে! আচ্ছা, কোনোভাবেই কি ওই ভয়ঙ্কর ঘরটা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না ? এতদিন পর্যন্ত ঘরটাকে এড়াবার সব চেষ্টাই ওর ব্যর্থ হয়েছে, তবু কোনো না কোনো উপায় ওকে খুঁজে বার করতেই হবে।

হাঁড়িতে ভাত ফুটে এসেছে। সরাটা তোলার সময় হঠাৎই ওর নজর পড়লো উনুনের পাশে রাখা দেশলাই-বাক্সটার ওপর। চকিতে অদ্ভুত একটা পরিকল্পনা ঝিলিক দিয়ে উঠলো ওর মনের মধ্যে। দেশলাই-বাক্সটা তুলে নেবার সময় স্পষ্টতই ওর হাত কেঁপে উঠলো, তবু কোনোদিকে না তাকিয়ে ওটাকে ও লুকিয়ে ফেললো বুকের মধ্যে। আশ্চর্য, কেন এই পরিকল্পনাটা এত দিন ওর মাথায় আসেনি! সুনি নিজের মনেই মুচকি মুচকি হাসলো।

সেই রাতেই খিড়কির দিকের চালায় আগুন ধরে গেলো। দেখতে দেখতে খড়ের চালের সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে। সুনি তখন ঘরের বাইরে কাঁটা-ঝোপটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর মুখখানা কখনও এমন আশ্চর্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি, খুশিতে দুলে উঠছে বুক, উদ্বেল আনন্দে নেচে উঠছে সারা শরীর।

অনুবাদ / অসিত সরকার

কোনো এক শরৎ সন্ধ্যায়

ল্যাংস্টন হিউজ

শুধু নিগ্রো নয়, আধুনিক বিশ্বসাহিত্যেরও এক দুর্লভ কবি, নাট্যকার ও কথাশিল্পী ল্যাংস্টন হিউজের জন্ম ১৯০২ সালে মিসৌরির জোপলিন শহরে। বিশ্বের বহু দেশ বহু শহরে যেমন বাস করেছেন, তেমনি কাজ করেছেন নানা ধরনের। জীবনের বিচিত্রতম এইসব অভিজ্ঞতাকে তিনি ব্যবহার করেছেন সাহিত্যের নানান শাখায়। বিশ্বের প্রধান ত্রিশটিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর রচনা। ১৯৬৭ সালে 'হারলেম রেঁনেশা'র অন্যতম প্রতিভাবান এই শিল্পীর মৃত্যু ঘটে মাত্র পঁয়ষট্টি বছর বয়সে।

বিল যখন প্রায় কিশোর, তখন থেকেই ওদের মধ্যে ভাব-ভালোবাসা ছিলো। রাত্রির বহু নির্জনতা ওরা দুজনে একসঙ্গে হেঁটে, গল্প করে কাটিয়েছে। তারপর দুজনের মধ্যে অত্যন্ত সাধারণভাবেই ছাড়াছাড়ি ঘটে গেছে। মেয়েটা বিয়ে করেছে এমন একজনকে যাকে মনে করেছিলো বুঝি ভালোবাসে। মেয়েদের সম্পর্কে একটা তিক্ত ধারণা নিয়েই বিল নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলো।

গতকাল, ওয়াশিংটন স্কোয়ার ধরে হেঁটে যাবার সময়, বহু বছর পর মেয়েটাই প্রথম ছেলেটাকে দেখতে পেলো।

'আরে, বিল ওয়াকার না!' স্তব্ধ বিস্ময়ে মেয়েটি বলে উঠলো।

বিল থমকে দাঁড়ালো। প্রথমে সে মেয়েটাকে চিনতেই পারেনি, মনে হলো কেমন যেন বুড়িয়ে গেছে।

'এ কি, মেরি, তুমি! কোত্থেকে আসছো?'

অনবধানেই মেরি মুখটাকে এমনভাবে তুললো যেন চুমু চাইছে। বিল কিন্তু হাতটা বাড়িয়ে দিলো। মেয়েটি তার হাতটা চেপে ধরলো নিজের মুঠোর মধ্যে, তারপর বললো, 'আমি তো এখন নিউ ইয়র্কেই থাকি।'

'ও!' শোভন ভঙ্গিতে বিল হাসলো। পরক্ষণেই তার দু ভ্রূর মাঝে ফুটে উঠলো অস্পষ্ট একটা ভ্রূকুটি।

'তুমি কোথায় আছো, কি করছো, এসব ভাবলে সত্যিই আমার খুব অবাক লাগে, বিল।'

'আমি এখন ওকালতি করি। ডাউনটাউনে একটা অফিস খুলেছি।'

'বিয়ে করেছো?'

'হ্যাঁ। দুটি বাচ্ছাও আছে।'

'ওমা, তাই নাকি!'

পার্কের মধ্যে ওদের পাশ দিয়ে বহু লোক যাওয়া-আসা করছে। ওরা কাউকেই চেনে না। তখন প্রায় সায়াহ্ন। বেলাশেষের সূর্যটা সবে ডুবছে। হিম হিম একটা ভাব জড়িয়ে রয়েছে।

'আর তোমাদের খবর কি?' হালকাভাবেই বিল জিগেস করলো।

'আমাদের তিনটে বাচ্ছা। আমি কলম্বিয়ায় বারসারের অফিসে কাজ করি।'

'তোমাকে কিন্তু ভীষণ··· (বিল বলতে চাইলো—বুড়ো দেখাচ্ছে) যাগ্‌গে, তারপর?'

মেরির বুঝতে কোনো অসুবিধে হলো না। ওয়াশিংটন স্কোয়ারে এই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ওর মনে হলো ও যেন সেই অতীত দিনগুলোতে ফিরে গেছে। বিল যখন ওহিওতে ছিলো, ও তার চাইতে অনেক অনেক বুড়িয়ে গেছে। এখন ও আর আদৌ তরুণী নয়। অথচ বিল সেই আগেরই মতো তরুণ রয়েছে।

'আমরা সেন্ট্রাল পার্ক পশ্চিমে থাকি,' মেরি বললো। 'যে কোনো একদিন এসে দেখে যেও না।'

'নিশ্চয়ই। তোমরাও এসে একদিন আমাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া কোরো। যে কোনো দিন রাত্তিরে। তোমরা এলে লুসিলি আর আমি সত্যিই খুব খুশি হবো।'

পার্কের মধ্যে গাছের পাতাগুলো আলতো খসে পড়ছে। বাতাস ছাড়াই খসে পড়ছে। ঘনিয়ে উঠছে শরতের সন্ধ্যা। সব কিছুই মেরির কেমন যেন বিষণ্ণ মনে হচ্ছে।

'আমাদেরও খুব ভালো লাগবে, বিল।'

হঠাৎ সারাটা পঞ্চম সরণী ধরে আলো জ্বলে উঠলো, যেন নীলিম হাওয়ায় কুহেলীঘেরা উজ্জ্বলতার দু-সারি মালা।

মেরি বললো, 'আমার বাস এসে পড়েছে।'

বিল তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো, 'বিদায়, মেরি।'

'তুমি কিন্তু···' মেরি কিছু বলতে চাইলো, বাসটা কিন্তু ততক্ষণে গড়াতে শুরু করেছে। রাস্তার বাতিগুলো আড়াল পড়ছে, পরক্ষণেই আবার ঝলমল করছে, আবার আড়াল পড়ছে। বাসে উঠে কথা বলতে ও ঠিক ভরসা পেলো না, ভয় হলো পাছে যদি কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে না পারে।

হঠাৎ বেশ জোরেই ও চেঁচিয়ে উঠলো, 'বিদায়, বিল!' কিন্তু বাসের দরজা

ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে।

বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। বাইরে, ওদের দুজনের মাঝে লোকজন যাওয়া-আসা করছে, রাস্তা পেরুচ্ছে, যাদেরকে ওরা কেউই চেনে না। লোকজন আর নির্জনতা। বিলকে ও আর দেখতে পেলো না। তখনই মনে পড়লো বিলকে নিজের ঠিকানাটা দিতে ভুলে গেছে, বিলের ঠিকানাটাও জিগেস করা হয়নি, এমন কি তাকে বলাও হয়নি যে ওর বড় ছেলেটারও নাম বিল।

অনুবাদ / অসিত সরকার

কুঁজো দাউদ

সাদেক হেদায়েত

আধুনিক পারস্য সাহিত্যের দিকপাল সাদেক হেদায়েতের জন্ম ১৯০৩ সালে তেহরানে। উচ্চ শিক্ষার জন্যে ১৯২০ সালে ফ্রান্সে যান। পরবর্তীকালে বেশ কয়েক বছর বম্বেতেও কাটান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু মূল্যবান ভাবনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে আধুনিক পারস্য সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধশালী করে তোলেন। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনী নাটক সমালোচনা অনুবাদ নিয়ে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা যে সুপ্রচুর তা কিন্তু নয়, তবু সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনা এবং ভাষার অনন্যতায় তাঁর ছোট গল্পগুলি আজও নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। ১৯৫১ সালে মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে অকৃতদার চিরবিষণ্ণ এই মানুষটি আত্মহত্যা করেন পারিতে। 'অন্ধ পেঁচা' ১৯৩৬ তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস এবং 'জীবন্মৃত' ১৯৩০, 'তিন ফোঁটা খুন' ১৯৩২ এবং 'হারানো কুকুর' ১৯৪৩ তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন।

'না না, এ ধরনের কাজ আমি আর কখনও করবো না। আসলে আমাকে আশা করাটাই ছেড়ে দিতে হবে! অন্যকে যেটা আনন্দ দেয়, আমার জন্যে সেটা দুঃখ-কষ্ট ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনে না। নাঃ, সত্যিই আমি আর কখনও…' নিজের মনেই বলতে বলতে দাউদ হাতের হলদে ছড়িটা বার বার মাটিতে গিঁথছিলো। রীতিমতো কষ্ট করে সে হেঁটে চলেছে, যেন দেহের ভারসাম্যতা বজায় রাখতে তার খুবই অসুবিধে হচ্ছে। শীর্ণ দুটি কাঁধের মাঝখান থেকে বিরাট মাথাটা ঝুঁকে এসেছে সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসা উঁচু বুকটার ওপর। সারা মুখে বিতৃষ্ণায় ভরা নিস্তেজ একটা অভিব্যক্তি—পাতলা ঠোঁট দুটো সুসংলগ্ন, সংকীর্ণ একজোড়া বাঁকানো ভ্রূ, চোখের পাতা দুটো আনত, ফ্যাকাশে চামড়ার নিচে স্পষ্ট হয়ে ওঠা চোয়ালের হাড়। কিন্তু কুঁজো পিঠের ওপর রেশমী কামিজ, মাথায় উঁচু টুপি, অদ্ভুত রকমের গাম্ভীর্য আর স্থির সংকল্প নিয়ে সে যেভাবে ছড়িখানা মাটিতে গিঁথছে—দূর থেকে দেখলে তাকে হাস্যকর কোনো বস্তুর মতোই মনে হয়।

শহর থেকে আসা রাজপথের ওপর পহলবী এভিনিউ থেকে বাঁক নিয়ে সে দৌলৎ ফটকের দিকে এগিয়ে চলেছে। সূর্য প্রায় অস্তগামী। তখনও বেশ গরম রয়েছে। তার বাঁ দিকে সারি সারি পাকা দেওয়াল, সূর্যাস্তের ভঙ্গুর আভা জড়ানো ইটের থামগুলো নিঃশব্দে আকাশের দিকে মুখ উঁচিয়ে রয়েছে। ডানদিকে, সাম্প্রতিক জলে

ভরিয়ে তোলা গড়টার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা অসমাপ্ত বাড়ি। তুলনামূলক ভাবে জায়গাটাকে নির্জনই বলা চলে, শুধু মাঝে মধ্যে দু-একটা মোটর বা ঘোড়ায়-টানা গাড়ি—রাস্তার দুধারেই নতুন করে বসানো উৎসধারার সঙ্গে সংযোগকারী নলের সাহায্যে জল ছিটানো সত্বেও ছোট ছোট ধুলোর মেঘ উড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

নিজেরই ভাবনার মধ্যে মগ্ন হয়ে দাউদ হেঁটে চলেছে। ছোটবেলা থেকে সে বরাবরই হাসি অথবা করুণার বস্তু। তার মনে পড়লো একবার ইতিহাস পড়ানোর সময় মাস্টারমশাই যখন বলেছিলেন যে স্পার্টানরা তাদের বিকলাঙ্গ বা রুগ্ন শিশুদের মেরে ফেলতো, ক্লাসের সমস্ত ছেলেমেয়েরা তখন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে ফিরে তাকিয়ে ছিলো। সেদিন নিজেকে তার ভীষণ নিঃসঙ্গ আর রিক্ত মনে হয়েছিলো। কিন্তু এখন মনে হয় সারা পৃথিবী জুড়েই এই আইন চালু করা উচিত, অন্তত আর কিছু না হোক, বিকৃতদের বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত। সে ভালো করেই জানে তার থ্যাবড়া মুখ, ঠেলে বেরিয়ে আসা চিবুক, গর্তে ঢোকা চোখ, হাঁ হয়ে থাকা মুখ—তার যা কিছু বিকৃতি সে সবই পেয়েছে বাবার কাছ থেকে। মৃত্যুশয্যায় বাবার চেহারাটা তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বেশি বয়েসে উপদংশ রোগাক্রান্ত অবস্থাতেই বাবা বিয়ে করেছিলেন। ফলে তার সব ছেলে-মেয়েরাই জন্মেছিলো হয় অন্ধ নয়তো বিকলাঙ্গ অবস্থাতে। দু বছর আগে মারা যাওয়া তার এক ভাই ছিলো মূক এবং জড়। হয়তো তারা ভাগ্যবানই ছিলো।

কিন্তু মানবিক যা কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, এ পৃথিবী আর নিজের সম্পর্কে অসুখী একটা ধারণা নিয়ে সে-ই কেবল টিকে গেছে। বলতে গেলে এক রকম নিঃসঙ্গতার মধ্যেই সে বড় হয়ে উঠেছে। স্কুলে সে কখনও খেলাধুলোয় অংশ নিতে পারেনি, অথচ হাসি-ঠাট্টা, দৌড় প্রতিযোগিতা, বল খেলা, ব্যাঙ-লাফানো প্রভৃতি আরও অনেক খেলা তার সমবয়েসীদের খুশিতে উদ্বেল করে তুলতো। প্রতিযোগিতার সময় সে স্কুল-প্রাঙ্গণের এক কোণে বই মুখে দিয়ে চুপটি করে বসে থাকতো আর চোরা চোখে ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য করতো। সাধারণত সে অসম্ভব খেটে পড়াশোনা করতো যাতে অন্তত অন্যদের চেয়ে ভালো ফল পেতে পারে। দিনরাতই সে খাটতো। শুধুমাত্র এই কারণে দু একজন অলস সহপাঠী তার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করতো যদি তার খাতা থেকে প্রশ্নের জবাবগুলো টুকে নেওয়া যায়। কিন্তু সে ভালো করেই জানতো এই বন্ধুত্বের স্থায়ীত্বকাল নির্ভর করতো শুধু যতটুকু আদায় করে নেওয়া যায় তার ওপরেই। সে হিংসে করতো হাসান খাঁকে, যাকে দেখতে খুব সুন্দর আর সব সময় বেশ ভালো ভলো পোশাক পরতো। অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা

তার সঙ্গেই বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টা করতো। শুধু দু-একজন শিক্ষকই যা তার প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন, কিন্তু সেটা তার পড়াশোনার জন্যে নয়, বরং বলা যায় তার প্রতি করুণা করেই। শেষ পর্যন্ত, তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব আর হতাশায় লেখাপড়াটাও সে শেষ করতে পারেনি।

এখন সে সম্পূর্ণই নিঃস্ব। সবাই তাকে এড়িয়ে চলে। পুরনো বন্ধুরা তার সঙ্গে হাঁটতে লজ্জা পায়। 'এই, দ্যাখ দ্যাখ, কুঁজোটাকে দ্যাখ!' মেয়েদের এই ধরনের মন্তব্যই তাকে সব চাইতে বেশি দমিয়ে দেয়। কয়েক বছর আগে সে বার দুয়েক বিয়ের কথা ভেবেছিলো, দুবারেই তাকে বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। মেয়ে দুটির মধ্যে একটির নাম জিবাঁদী, ফিসারাবাদের খুব কাছাকাছিই থাকতো। পরস্পরের বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে, এমন কি মেয়েটা তার সঙ্গে কথাও বলেছে। কোনো কোনো দিন সন্ধ্যেবেলায় স্কুল থেকে ফেরার পথে সে মেয়েটাকে দেখতে যেতো। যে জিনিসটা তার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে—মেয়েটার ঠোঁটের কোণে একটা তিল আছে। পরে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে নিজের চাচীকে যখন মেয়ের বাড়িতে পাঠিয়েছিলো, জিবাঁদী তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছিলো, 'কেন, দেশে কি ছেলের এতই অভাব যে, হতকুচ্ছিত একটা কুঁজোকে বিয়ে করতে হবে?' এতে ওর বাবা-মা ওকে খুবই গঞ্জনা দিয়েছিলো, তবু ও কিছুতেই বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়নি। দাউদ কিন্তু মেয়েটাকে এখনও ভালো বাসে। যৌবনের সেই অনন্য স্মৃতিটাকে সে আজও আগলে রেখেছে বুকের মধ্যে।

জেনে কিংবা না জেনে পুরনো সেই স্মৃতির মোহে সে প্রায়ই ফিসারাবাদের আশেপাশে ঘুরতো। সবকিছুর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে সাধারণত সে একাই ঘুরতে বেরুতো, যতটা সম্ভব ভীড় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতো। পথে যখনই কেউ হাসতো কিংবা অন্যের কানে ফিসফিসিয়ে কিছু বলতো, সে ভাবতো ওরা বুঝি তাকে নিয়েই মজা করছে। জল্লাদের সামনে বলির পাঁঠার মতো অত্যন্ত করুণ ভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে সে শুধু একবার অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাতো, তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে যেতো। হাঁটতে হাঁটতেই পথচারীদের সম্পর্কে তার চেতনা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতো, তার সম্পর্কে ওরা কি ভাবছে কল্পনা করে নিতেই টান টান হয়ে উঠতো মুখের মাংসপেশী।

গড়টার পাশ দিয়ে দাউদ মন্থর পায়ে হেঁটে চলেছে আর ছড়ির প্রান্ত দিয়ে জলের ওপর আঘাত করছে। তার ভাবনাগুলো এলোমেলো আর তীব্র উত্তেজনায় ভরা। সে দেখলো পাথরে ছড়ির শব্দে লোমশ একটা কুকুর তার দিকে মুখ তুলে তাকালো। রোগগ্রস্ত মুমূর্ষু প্রাণীটার নড়ার ক্ষমতা নেই, কেননা পরক্ষণেই ওর মাথাটা এলিয়ে পড়লো মাটিতে।

ব্যথাহত বুকে দাউদ ঝুঁকে দাঁড়ালো। জ্যোৎস্নালোকে কুকুরটা একবার চোখ মেলে তাকালো। দাউদের মনে হলো জীবনে এই প্রথম সে যেন কোনো নিষ্পাপ, সরল দৃষ্টির দেখা পেলো। ভাগ্য ওদের দুজনকেই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে, আবর্জনার মতোই ওরা পরিত্যক্ত, নিজেদের কোনো ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও ওরা সমাজ থেকে বিচ্যুত। তার ইচ্ছে হলো পাশে বসে, শহরতলীর এই প্রান্তে লুকবে বলে নিজের দুঃখ-কষ্টকে যে এতদূর পর্যন্ত টেনে এনেছে, সেই কুকুরটাকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে, ওর নরম বুকে মাথা রাখে।

পরক্ষণেই তার মনে হলো পথ চলতে গিয়ে কেউ যদি দেখে ফেলে, ওরা তখন তাকে আরও বেশি বিদ্রূপ করবে। ইউসুফাবাদ তোরণের মধ্যে দিয়ে আসার সময় সূর্যাস্ত ছিলো, এখন ভারি সুন্দর আর নিটোল একটা চাঁদ উঠছে আকাশের কোলে। তারই উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে অসমাপ্ত বাড়ি, এলোমেলো ইঁটের স্তূপ, গাছ আর ছাদে ঘেরা শহরটার ছায়াচ্ছন্ন বীথি, দূরের আরক্তিম পাহাড়ী চূড়াগুলো। তার চোখের সামনে যেন মেলে ধরেছে আবছা ধূসর একটা অবগুণ্ঠন। আশেপাশে জনপ্রাণীর কোনো চিহ্ন নেই। দূরে গড়টার ওপার থেকে ভেসে আসছে কার যেন চাপা গলায় গাওয়া একটা গানের সুর।

দুঃখ-বেদনায় এমনই আপ্লুত, এত ক্লান্ত যে দাউদ কিছুতেই মাথাটাকে উঁচু করে রাখতে পারছে না, চোখ দুটো টনটন করছে, মাথার ভারে মনে হচ্ছে দেহটা বুঝি নুয়ে পড়বে। ছড়ির ওপর ভর রেখে সে নর্দমা পেরিয়ে অন্য পারে গেলো। কোনো কিছু না ভেবে পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে গিয়ে বসলো রাস্তার এক ধারে। আর ঠিক তখনই সে হঠাৎ বুঝতে পারলো খুব কাছেই বসে রয়েছে একটা মেয়ে, মুখখানা ওড়নায় ঢাকা। চকিতে দ্রুত হয়ে উঠলো ধমনীর প্রত্যেকটা রক্তস্রোত।

এতটুকু ভূমিকা না করে মেয়েটা তার দিকে ফিরে হাসতে হাসতে জিগেস করলো, 'কি ব্যাপার হোসাঙ, এতক্ষণ কোথায় ছিলে বলো তো?'

মেয়েটার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে দাউদ অবাক হয়ে গেলো। এটা কেমন করে সম্ভব যে তাকে দেখেও মেয়েটা সঙ্কোচে সরে গেলো না! তার মনে হলো পৃথিবীটাকে যেন তার পায়ের কাছে উজাড় করে দেওয়া হয়েছে—মেয়েটা তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। কিন্তু এত রাত্তিরে মেয়েটা এখানে কি করছে? হয়তো ভ্রষ্টা। হয়তো প্রেমিকের খোঁজে এসেছে। তবু, সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে দাউদ মনে মনে ভাবলো, 'যাই হোক না কেন, অন্তত কথা বলার মতো তো কাউকে খুঁজে পেয়েছি। হয়তো ও আমাকে দু-দণ্ড শান্তি দিতে পারবে।'

তাই আবেগ ভরা গলায় সে বললো, 'আমার মতো তুমিও কি একা? আমি

বরাবরই একা। আমার সারাটা জীবনই কেটেছে নিঃসঙ্গতার মধ্যে।'

তার কথা শেষ হবার আগেই মেয়েটা চকিতে ফিরে রঙিন চশমার মধ্যে দিয়ে তাকালো। 'কে আপনি ? আমি ভেবেছিলুম বুঝি হোসাঙ। ও যখনই এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, নানা রকমের রঙ্গতামাশা করে।'

শেষের দিকের কথাগুলো দাউদ শুনতে পেলো না, এমন কি মেয়েটা কি বলছে ভালো করে বুঝতেও পারলো না। আসলে সে কিছু বুঝতেই চায়নি। কত কাল, যেন কত যুগ পর কোনো মেয়ে তার সঙ্গে কথা কইছে। সে দেখলো মেয়েটা বেশ রূপসীই। তার সারা শরীর বেয়ে নেমে এলো ঘামের হিমেল স্রোত।

কোনো রকমে সে বললো, 'আমি হোসাঙ নই। আমার নাম দাউদ।'

হাসতে হাসতে মেয়েটি বললো, 'কিছু দিন হলো চোখ দুটো ভীষণ জ্বালাচ্ছে, তাই ভালো দেখতে পাই না। ও, তুমি দাউদ। মানে কুঁজো দাউদ! (দাউদ ঠোঁট কামড়ালো।) গলাটা শুনেই চেনা-চেনা মনে হয়েছিলো। আমি জিবাঁদা। তুমি আমাকে চিনতে পারছো না ?'

মুখের এক পাশ থেকে বেণীটা সরিয়ে নিতেই ওর ঠোঁটের কোণের সেই তিলটা দাউদ স্পষ্ট দেখতে পেলো। তীব্র যন্ত্রণায় দলা-পাকানো কি যেন একটা আটকে গেলো তার গলার মধ্যে, কপাল থেকে ঝরে পড়লো কয়েক ফোঁটা ঘাম। চার পাশে তাকিয়ে দেখলো—কেউ নেই। থেমে গেছে সেই গানের সুর। শুধু হৃৎপিণ্ডটা এমন পাগলের মতো নাচছে যে নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। অশ্রু-অবরুদ্ধ গলায় একটা শব্দও উচ্চারণ না করে সে উঠে দাঁড়ালো, থর থর করে কাঁপছে সারা শরীর। ছড়িটা তুলে নিয়ে, ভারি আর এলোমেলো পায়ে, যেদিক থেকে এসেছিলো সেই পথেই আবার ফিরে চললো।

বুজে আসা গলায় সে বিড়বিড় করে বললো, 'মেয়েটা তাহলে জিবাঁদা! আমাকে দেখতে পায়নি। হোসাঙ ওর স্বামী না প্রেমিক কে জানে ? না না, এ কাজ আমি আর কখনও করবো না! আমাকে সব আশাই ছেড়ে দিতে হবে! নাঃ আমি আর কখনও…'

কুকুরটার কাছে ফিরে এসে সে ওর পাশে বসলো, মাথাটা রাখলো ওর নরম বুকে। কুকুরটা তখন মরে গেছে।

অনুবাদ / অসিত সরকার

পথের ধারে

দার্সি অ্যাজামবুজা

ব্রাজিলের নামকরা সাহিত্যিক দার্সি পেরিইরা দ্য অ্যাজামবুজার জন্ম ১৯০৫ সালে রিও গ্রাঁদ দো সালের এনক্রুজিলাদা শহরে। পোর্তো অ্যালেগরিতে আইন নিয়ে পড়াশোনো করেন। পরবর্তীকালে সাধারণ আইনজীবী থেকে শুরু করে বিচারপতির পদেও অধিষ্ঠিত থাকেন, এবং রিও গ্রাঁদ দো সাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনাও করেন। ১৯২৫ সালে, মাত্র কুড়ি বছর বয়েসে প্রকাশিত প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নো গ্যালপাও' অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ব্রাজিলে আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম স্মারক গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। নিচের গল্পটি এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত।

গ্রামগঞ্জের ভেতর দিয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ যেতে যেতে উধাও হয়ে যাওয়া ব্ল্যাক হিল রোড দিয়ে যে সব মুসাফির গেছে, তারা প্রত্যেকেই বুড়ো চিকো পেদ্রোর বাড়িটা চেনে। বাড়িটা একটা টিলার ওপরে। মালভূমির তরঙ্গিত বন্ধুর বুকে সবুজ গালচেতে মোড়া বিশাল বিশাল সুগোল শিলাস্তূপের মতো জেগে উঠেছে টিলাগুলো। বাঁধাকপির মতো ফুলে-ফেঁপে ওঠা ডুমুর গাছ আর পেছন দিকের সতেজ কমলালেবু গাছগুলোর মুকুটের ফাঁক দিয়ে বহু দূর থেকেই চিকো পেদ্রোর সদা-খোশমেজাজী ঝলমলে সাদা বাড়িটা চোখে পড়ে। বাড়ির একপাশে কুঞ্জলতার অপরূপ এক মাচান। গ্রীষ্মে-বসন্তে মাচান উপচে সেই পুষ্পিত লতাগুচ্ছ ঝাঁপিয়ে পড়ে ...থারির বেড়ার গায়ে, সুরভিত করে তোলে চতুর্দিক। অন্য পাশে বাগানের বেড়াঝোঁপের গা দিয়ে ছোট্ট একটা পথ চলে গেছে চিকো পেদ্রোর বিখ্যাত জলের কুণ্ডের দিকে। বাড়ির সামনের দিকে বিকেলের ছায়া পড়ে। সেখানে দেয়ালের সঙ্গে লাগোয়া একটা বেঞ্চ। আবহাওয়া ভালো থাকলে বুড়ো চিকো পেদ্রো একটা কেতলি নিয়ে সেখানে গিয়ে বসতো, বসে বসে মদ খেতো আর ধূমপান করতো। পথচারীরা বর্ণসঙ্কর ওই বৃদ্ধ রাখালের—নিজের ভাষাতেই তার বয়েস আশি বছর—ওই শান্ত সৌম্য মূর্তিটি দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো এবং তারা প্রায় সকলেই বুড়োর সঙ্গে এক চুমুক 'মাতে' পান করে যেতো। চার-পাঁচ ক্রোশ ব্যাসার্ধের মধ্যে অন্য কোনো বাড়িঘর না থাকায় মুসাফিরদের কাছে ওই সুবিস্তৃত নির্জন গ্রামাঞ্চলে চিকো পেদ্রোর বাড়িটা ছিলো একটুকরো স্বর্গের মতো। পরিচিত বা অপরিচিত সমস্ত ফেরিওলারা—যাদের

খচ্চরের পা খোঁড়া হয়ে গেছে, যাদের গাড়ি-টানা ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বা গাড়ির অংশবিশেষ ভেঙে গেছে, যারা গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে আসা জন্তুজানোয়ারগুলোকে কোথাও সাময়িকভাবে রাখতে চায়—তারা সকলেই চিকো পেদ্রোর কাছে গিয়ে হাজির হতো এবং যথাযথ সাহায্যও পেতো। তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ফের রওনা হবার সময় চিকো পেদ্রোর স্ত্রী গরমের দিন হলে এক পেয়ালা কফি, একফালি তরমুজ আর শীতের দিনে ছোটো এক গ্লাস তালের রস নিয়ে তাদের সামনে গিয়ে হাজির হতো। সমস্ত কিছুই মাগনায়—শুধু মধুর ব্যবহার আর উপকার করার বাসনাতেই সবকিছু করা। সবাই বুঝতো, শুধুমাত্র মিষ্টি ব্যবহার আর পরোপকারের মধ্যেই পুরস্কার খুঁজে পায় ওরা দুজনে।

কখনও কখনও কেউ হয়তো বলতো, 'এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না, মিঃ চিকো পেদ্রো! ঘোড়ার-সাজের নতুন চামড়ার ফিতেটার জন্যে আপনি আমার কাছে কতো পাবেন, বলুন।'

'ও কথা ভুলে যান, বন্ধু—ওটার কোনো দাম নেই। কোনোদিন আমার হয়তো কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে, তখন আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।'

আবার কেউ হয়তো বলতো, 'মিঃ চিকো পেদ্রো, ঘোড়াটাকে আমি যে কবে আপনার কাছে ফেরত পাঠাতে পারবো, জানি না। তার চাইতে বরং একটা বন্দোবস্ত করে নেয়া যাক। ঘোড়াটার জন্যে আপনি কতো নেবেন?'

'না বন্ধু, ওটার কোনো দামটাম নেই। আপনি বরঞ্চ গাঁয়ে পৌঁছে ওকে ছেড়ে দেবেন, ও ঠিক বাড়িতে চলে আসবে।'

উদার-বদান্যতার জন্যে মানুষটাকে প্রায়ই বিবেকবর্জিতদের শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ কোনোদিন তার কাছে সাহায্য চেয়ে বিমুখ হয়নি।

শীতের বর্ষাঘন হিমেল রাতে নদীর অগভীর অংশগুলো ফুলে-ফেঁপে ওঠায় যাদের নদী পেরোতে দেরি হয়ে যেতো, তারা সকলেই চিকো পেদ্রোর দরজায় টোকা দিতো। এবং তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে তাদের স্বাগত জানানো হতো, তাদের ঘোড়াগুলোকে গাড়ি থেকে খুলে খোঁয়াড়ে রাখা হতো আর তাদের গাড়িগুলোকে রাখা হতো ছাউনির তলায়। বাড়ির বৃদ্ধা কর্ত্রী চিররুগ্না হওয়া সত্ত্বেও তখন বিছানা ছেড়ে উঠে, আধ ডজন অতিথির জন্যে ধূমায়িত গরম কফি নিয়ে হাজির হতো।

'আপনারা কক্ষণো ইতস্তত করবেন না,' পরের দিন সকালে চিকো পেদ্রো তাদের বলতো, 'পরেরবার এদিক দিয়ে যাবার সময় এখানে এসে অবশ্যই এক পাত্তর মাতে খেয়ে যাবেন।'

মানুষটার উদার আতিথেয়তায় খুশি আর উষ্ণ হয়ে অতিথিরা যখন রওনা হতো,

তখনই তাদের মনে আবার ফিরে আসার আগ্রহ জেগে উঠতো। গভীর আন্তরিক অনুরাগ নিয়ে তারা ফিরে ফিরে তাকাতো ওই বৃদ্ধ মানুষটার দিকে—যার ঢিলেঢালা পাতলুন চামড়ার কোমরবন্ধের সাহায্যে কোমরের সঙ্গে আঁট করে বাঁধা, হাতে লাউয়ের খোলায় ভরা মাতে, মাথায় ধপধপে সাদা চুল, বুকের ওপরে ছড়ানো অজস্র দাড়ি—অসীম স্নেহভরে হাত নেড়ে যে বিদায় জানাতো তার এক দিনের বন্ধুদের।

ভারি ভালো মানুষ ওই বৃদ্ধটি···ওই চিকো পেদ্রো।

কিন্তু কিছুদিন ধরে এক বিষাদের ছায়া তার জীবনকে অন্ধকার করে তুলেছে। অথচ আগে তার জীবন ছিলো বালুর বুক দিয়ে বয়ে চলা নদীর মতোই শান্ত। মানুষটাকে এখন নিরুৎসাহী বলে মনে হয়, কোনো আলোচনাতেই আজকাল সে আর কোনো অংশ নেয় না বলা চলে।

কারণ, তার ছেলে।

তার একমাত্র বংশধর, তার দীর্ঘ জীবনের একমাত্র ফসল ওই ছেলেটি আজ তার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোকে দুঃখ আর লজ্জায় ভরিয়ে তুলেছে।

সেদিন সকালে কাঠের বেঞ্চিটাতে বসে মাতে পান করতে করতে দূরান্তের কোলে হারিয়ে যাওয়া দূরের হালকা-সবুজ প্রান্তরের দিকে তাকিয়েছিলো চিকো পেদ্রো। ঘনরঙা আকাশের বুকে সূর্যটা তখন ক্রমশ উঠে আসছে। শুধুমাত্র সাদা বাষ্পের মতো এক টুকরো দীর্ঘ অথচ হালকা মেঘ বিচ্ছিন্নতা এনে দিয়েছে আকাশের গাঢ় নীলিমায়। কাছের টিলাগুলোতে পশুগুলো চরে বেড়াচ্ছে শান্তভাবে। মাদি ভেড়ার ছোট্ট একটা দল বাড়ির ডান দিকে উতরাইয়ের কাছে খানিকটা জায়গা সাদা করে রেখেছে। কুঞ্জলতার মাচান আর ঝোপঝাড় থেকে ঝিঁঝি ডাকছে কর্কশ স্বরে। জলের কুণ্ডটাকে ঘিরে রাখা চেরি গাছগুলো থেকে ভেসে আসছে ঘুঘুর করুণ কান্না। উঠোন থেকে একটা মোরগ ডেকে উঠছে মাঝেমাঝে। আলোর মমতা গায়ে মেখে পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। ভোরের বাতাসে হেসে উঠেছে গ্রীষ্ম-শেষের সবটুকু মধুরিমা। স্থবির ধ্যানস্থ ডুমুর গাছ দুটো পালা করে থেকে থেকে বাতিল চিন্তার মতো এক-একটা শুকনো পাতা খসিয়ে ফেলছে নির্লিপ্ত অবহেলায়।

বৃদ্ধ চিকো পেদ্রো মাতে পান করতে করতে এই অপরূপ শোভাময় গ্রামাঞ্চলের দিকে মন ফিরিয়ে আনলো—যা গত আশি বছর ধরে তার গ্রামীণ সত্তাকে এক নিবিড় প্রশান্তিতে ভরিয়ে রেখেছে। মাতে পান করতে করতে সে চিন্তা করতে লাগলো সেই সমস্ত ঘটনার কথা, যা আজ এই বৃদ্ধ বয়সে তার কাছে রীতিমতো কঠিন বোঝা হয়ে উঠেছে।

কি করে এমন হলো? চিরটাকাল সে সুভদ্র শৃঙ্খলায় জীবন কাটিয়েছে। আর ওই বৃদ্ধা তো একজন সাধিকার মতোই নিষ্পাপ। অথচ তাদের মাধ্যমে কি করে জন্ম নিলো ওই অশিষ্ট পশুটা? তাদের ছেলে, শিশুকালে যে অমন শান্ত আর বাধ্য ছিলো, সে কিনা একটা দস্যু হয়ে গেলো!···ব্যাপারটাকে যেন একটা বিরাট মিথ্যা বলে মনে হয়।···সবই শুরু হয় ছেলেটা ফৌজে নাম লেখাবার পর থেকে। কুসংসর্গ। ফৌজে থাকার সময়ই বারবার বিবাদ বিসম্বাদ করার জন্যে তার কয়েদ হয়েছে। ফৌজ ছাড়ার পর সে আরও খারাপ হয়ে যায়। সেই থেকে সে আর বাড়িতে ফেরেনি, বাবা-মার কোনো খবরও নিতে চায়নি। তখন থেকেই সে শুরু করে দেশময় দাপিয়ে বেড়ানো, মদ খাওয়া আর জুয়াখেলা। তারপর একের পর এক অসংখ্য লজ্জাজনক জঘন্য অপরাধ। সত্যিকারের প্রথম বর্বর লড়াইতে সে একজন ঠেলাচালককে খুন করে ফেলে এবং বিরোধীরা তার একটা চোখ উপড়ে নেয়। তারপর চার বছর কয়েদখানায় কাটিয়ে সে ফিরে আসে 'কাণা জনি' নাম নিয়ে—হয়ে ওঠে গুণ্ডা আর জুয়াড়ি। সর্বদা একদল চামচা তাকে ঘিরে থাকতো। পুলিস লক্ষ্য রাখলেও বারবারই সে মারপিটে জড়িয়ে পড়তো, বিশেষ করে ঘোড়দৌড়ের মাঠ আর পানশালাগুলোতে। প্রায় প্রতি মাসেই চিকো পেদ্রো এমন কোনো না কোনো মারপিট বা ঠগ-জোচ্চুরির খবর পেয়েছে, যার সঙ্গে তার ছেলে জড়িত। খবরগুলো পেয়ে খুবই দুঃখ পেতো ওই বুড়ো মানুষটা—নিজের দীর্ঘ জীবনে যে কোনোদিনও কোনো লজ্জাজনক কাজ করেনি, প্রত্যেকে যাকে ভালোবাসে আর শ্রদ্ধা করে আন্তরিকভাবে।.

শেষ পর্যন্ত কাণা জনি একটা মারাত্মক অপরাধ করে ফেললো। একটি মেয়েকে সে অসম্মান করেছিলো—সেই মেয়েটির বাবাকে খুন করে সে উরুগুয়েতে পালিয়ে যায় এবং ছ বছরেরও বেশি সময় সেখানেই লুকিয়ে থাকে। সেটা বরঞ্চ ভালোই হয়েছিলো, কারণ তাতে বুড়ো মানুষটা একটু নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেয়েছিলো। কিন্তু এখন, বিপ্লব শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে, কাণা জনি আবার দেশে ফিরে এসেছে এবং তার ভয়ঙ্কর কার্যকলাপের কথা এখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে। দেশের যে অঞ্চল দিয়ে তার দলবল যায়, সেখানেই নৃশংসতা আর আতঙ্কের চিহ্ন রেখে যায়। সবাই তার ঠাণ্ডা মাথায় খুনখারাবি, লুঠতরাজ, ধর্ষণ-বলাৎকার আর সমস্ত রকমের বর্বরতার কথা বলাবলি করে। অন্যান্য জায়গা থেকেও ওই একই ধরনের খবরাখবর আসে। মুসাফিররা চিকো পেদ্রোর সঙ্গে মাতের পাত্রে চুমুক দিতে দিতে আলোচনার আবশ্যিক বিষয়বস্তু—বিপ্লব—নিয়ে কথাবার্তা বলে এবং তারপর প্রসঙ্গক্রমে কুখ্যাত কাণা জনির কিছু কিছু সাম্প্রতিক নতুন দুষ্কর্মের খবরও শোনায়, কারণ তারা কেউই

জানে না জনি ওই দয়ালু বৃদ্ধেরই সন্তান। ওই বেদনাদায়ক খবরগুলো শোনার সময় চিকো পেদ্রো সর্বদা চুপ করেই থাকে। ইদানীং সে জানতে পেরেছে, জনি যে দলে ছিলো সেই দল থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। উটকো লোকজন নিয়ে জনি এখন নতুন দল গড়ে তুলেছে এবং সেই দলও অতি দ্রুত নতুন নতুন নিষ্ঠুরতার চরমে পৌঁছে গেছে। এক সপ্তাহ আগে জনি গবাদি পশু প্রজননের একটা প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ চালিয়ে, সেখানে স্ত্রী এবং দুই মেয়ের উপস্থিতিতে এক বৃদ্ধের গলা কেটে ফেলেছে। মহিলাদের তখন বেঁধে রেখে ওই বীভৎস নারকীয় দৃশ্য দেখতে বাধ্য করা হয়েছিলো। পরে ওদের মধ্যে একটি মহিলা পাগল হয়ে গেছে।

মুসাফিররা নিজেদের অজ্ঞাতে এই সমস্ত কাহিনীর মাধ্যমে বৃদ্ধ চিকো পেদ্রোকে আহত করে তোলে। শোকে-দুঃখে-লজ্জায় চিকো পেদ্রো এখন এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে গেছে যে এখন কাউকে তার বাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেই সে শঙ্কিত হয়ে ওঠে—যদিও আতিথেয়তার জন্যে তার বাড়ির দরজা এখনও সর্বদাই খোলা। এই সমস্ত ভয়ঙ্কর সংবাদ সে তার স্ত্রীর কাছ থেকে যথাসাধ্য লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু অনিবার্যভাবে বৃদ্ধা সমস্ত কিছুই জেনে ফেলেছে। বেচারি এখন অনবরত শুধু কাঁদে, নিদারুণ মর্মযন্ত্রণায় এখন সে প্রায় মুমূর্ষু।

এইভাবে নিজের জীবনের কালো ছায়াটার কথা চিন্তা করছিলো চিকো পেদ্রো। মাতের পাত্রে চুমুক দিতে দিতে এবং সিগারেট টানতে টানতে ইতিমধ্যে সে এক ঘণ্টারও বেশি সময় কাটিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে তার স্ত্রী কুঁজো হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চামড়ায় মোড়া একটা টুল দরজার কাছে এনে রেখেছে। মহিলার মাথার চুলগুলো তুলোর মতো সাদা। একটিও কথা না বলে সে টুলটাতে বসে, হাতের সেলাইটার দিকে মুখ নামালো। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নিশ্চুপ হয়ে রইলো বহুক্ষণ। দীর্ঘদিন একসঙ্গে জীবন কাটিয়েছে দুজনে—এখন বিনা বাক্যব্যয়েই ওরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারে, একে অন্যের কথা বুঝে নিতে পারে।

ভোরের শান্ত নরম বাতাসে পুষ্পিত কুঞ্জলতার মৃদু সৌরভ। ঝিঁঝিঁ পোকাগুলো পাগলের মতো চিৎকার করে চলেছে একটানা। কাছের যে টিলাটা দিয়ে রাস্তা চলে গেছে, আচমকা সেখান থেকে টিটিভ পাখিরা গান গেয়ে উঠলো এবং ঠিক তখুনি এক পথিককে দেখা গেলো সেখানে। লোকটার গায়ে একটা সাদা রঙের পঞ্চো। ঘোড়ায় চেপে ধীর গতিতে চিকো পেদ্রোর বাড়ির দিকেই এগিয়ে আসছিলো সে।

লোকটাকে দেখেই চিনতে পারলো চিকো পেদ্রো। হাই স্লোপের জেফেরিনো, নিঃসন্দেহে নিজের গাঁয়ে ফিরছে মানুষটা। স্ত্রীকে বাড়ির ভেতরে যেতে দেখে চিকো

পেদ্রো বললো, 'ছেলেটির জন্যে কেতলি আর লাউয়ের খোলাটা দিয়ে যেও।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসাফিরটি পৌঁছে গেলো। একটা ডুমুর গাছের গায়ে লাগানো ধাতব আংটাতে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে সে বললো, 'শুভ সন্ধ্যা, চিকো পেদ্রো! কেমন আছো?'

'ভালো। তোমার কাজে লাগার জন্যে তৈরি হয়েই আছি। তুমি কেমন আছো, বন্ধু?'

পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো ওরা। বৃদ্ধের এগিয়ে দেওয়া কুর্সিতে বসে জেফেরিনো গায়ের পঞ্চোটাকে একদিকের কাঁধের ওপরে ছুঁড়ে দিলো। তারপর কথাবার্তা বলতে শুরু করলো দুজনে। প্রথমে ওরা খরা নিয়ে আলোচনা করলো—সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে যার অবসান হয়েছে। তারপরে উঠলো ইদানিং গবাদি পশুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়া রোগটার কথা। এবং সবশেষে সেই বাধ্যতামূলক প্রসঙ্গ। আগন্তুক যে সমস্ত সংবাদ এবং গুজব শুনেছে, তা চিকো পেদ্রোকে বললো। যুদ্ধ এবং কয়েকজন পারস্পরিক বন্ধুর মৃত্যুসংবাদও শোনালো। আরও জানালো, সাধারণ মানুষের ধারণা, গৃহযুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে চলবে না।

এরই মধ্যে একটি নিগ্রো বালক এসে বৃদ্ধের দিকে গরম জল ভরা লাউয়ের খোলাটা এগিয়ে দিলো। তারপর জেফেরিনোর দিকে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'আমাকে আশীর্বাদ করুন, স্যার।'

'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

গৃহস্বামী মাতের প্রথম পাত্রটি তৈরি করার অবকাশে জেফেরিনো বললো, 'পরশু দিন হাই স্লোপে একটা লড়াই হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি! কাদের মধ্যে?'

'ঠিক জানিনে, তবে পুরো ঘটনাটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। ন্যাভেরয়োর সঙ্গে আমি তখন পশু-প্রজনন কেন্দ্রের পাঁচালিটা ধরে যাচ্ছিলুম। রাস্তার ডান দিকের টিলাটায়—মানে নদীটা যেখানে হেঁটে পার হওয়া যায়—মানে আমি কোন জায়গাটার কথা বলছি বুঝতে পারছো তো? সেখানে জঙ্গলের ধারে আমরা একটা শিবির দেখতে পেলুম। দলটা ছোটোই…কম বেশি জনা তিরিশেক লোক। আমরা বুঝতে চেষ্টা করছিলুম, ওরা কারা। তা এমন সময় দেখি, অন্য একটা দল—বোধহয় শ দুই লোক—খোলা মাঠের দিক থেকে কাঁটা তারের বেড়া কেটে এগিয়ে আসছে। পাহাড়ের আড়াল দিয়ে বেড়ালের মতো চুপিচুপি ওরা ক্রমশই এগিয়ে আসছিলো। শিবিরের লোকগুলো যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলো, তখন ওদের দূরত্ব বারো মিটারেরও কম। ছোটো দলের লোকগুলো তক্ষুণি ঘোড়ায় চেপে নালাটা পেরিয়ে,

উলটো দিকে গিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়ালো। জায়গাটা কি রকম সরু, তা তো তুমি জানোই।

'ল্যাতেরিয়ো আর আমি অনেক দূরে—টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলুম। হঠাৎ একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেলো। দেখলুম কি, মোজেস—মানে আরব-ব্যবসায়ীটা—মাল বোঝাই খচ্চরটাকে সামনে নিয়ে রাস্তা ধরে সোজা নালাটার দিকে এগিয়ে চলেছে। লোকটাকে সত্যিই খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো আর আমার ধারণা, চারদিকের কোনো কিছুই সে লক্ষ্য করেনি। যেই গুলিগোলা চলতে শুরু করলো, অমনি সে এক লাফে খচ্চরটার পিঠে উঠে পড়লো আর খচ্চরটা মালপত্তর ছড়াতে ছড়াতে ছুটতে লাগলো পাগলের মতো।

'সংখ্যায় বেশি বলে যারা ভরসা করে এগিয়ে এসেছিলো, এবারে তারা আরও দ্রুত এগুতে লাগলো—মনে হলো ওরা নালাটা পার হতে চায়। কিন্তু অন্য দলটা অজস্র ধারায় তাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে লাগলো। ব্যাপারটা মোটেই ছেলেখেলা নয়। এদিক থেকে গুলি আসছে তো ওদিক থেকেও গুলি ছুটছে। অন্ধকার নেমে আসা অব্দি এই-ই চলতে থাকলো সর্বক্ষণ।

'তারপর বড়ো দলটা নিজেরাই দু ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। একটা দল গুলি চালিয়ে নালার দিকটা আটকে রাখলো, অন্যেরা নদী পার হবার মতো একটা সুবিধে-জনক জায়গার খোঁজে আস্তে আস্তে জঙ্গলের পাড় ঘেঁষে এগুতে লাগলো যাতে পেছন দিক দিয়ে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করা যায়। ঘটনাটা নির্ঘাত ঠিক তাই-ই ঘটেছিলো, তবে আমরা আর সেটা দেখিনি…রাত হয়ে গেলো, আমরাও বাড়িতে ফিরে গেলুম। কিন্তু রাত নটা নাগাদ আমরা প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলুম। অনেকক্ষণ ধরে চলার পর আবার আচমকাই তা থেমে যায়।'

বৃদ্ধ চিকো পেদ্রো খানিকটা অনাগ্রহ আর খানিকটা অস্পষ্ট অমঙ্গল আশঙ্কা নিয়ে জেফেরিনোর কথা শুনছিলো। লোকটা বলতে লাগলো, 'গতকাল সকালে আমি ফের ওখানটাতে গিয়েছিলুম। লড়াইয়ের জায়গাটা একবারটি দেখবে বলে ল্যাতেরিয়ো আর ক্লারোও আমার সঙ্গে গিয়েছিলো। সেখানে গিয়ে, বুঝলে—আমরা একটা করুণ দৃশ্য দেখলুম।

'দেখলুম প্রকাণ্ড বড়ো একটা কবর—তার মধ্যে নির্ঘাত দশজনেরও বেশি লোককে একসঙ্গে কবর দেওয়া হয়েছে। জঙ্গলের ভেতরের দিকে, পাহাড়ের খাঁজগুলোর পেছনে রয়েছে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের পুকুর, অসংখ্য মরা ঘোড়া, টুপি, একটা রাইফেল আর যুদ্ধের আরও অনেক ধ্বংসচিহ্ন। তাছাড়া আরও একটা করুণ দৃশ্য দেখলুম, বুঝলে…চলে আসার ঠিক আগেই দেখতে পেলুম, একটু চড়াইয়ের দিকে,

যেন অন্যদের সাবধান করে দেবার জন্যেই—একটা লাশকে টানটান করে ফেলে রাখা হয়েছে।

'চড়াইতে উঠে দেখি, আসলে লাশটাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে রাখা হয়েছে—মাথাটা কাঁধ থেকে প্রায় আলাদা। কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর বর্বরতা! দেখে আমার বমি এসে গেলো।

'কিন্তু ল্যাভেরিয়ো আর ক্লারো যখন বললো, লোকটা কে—ঈশ্বর আমাকে মার্জনা করুন—তখন আমার মনে হলো, লোকটা উচিত সাজাই পেয়েছে। লোকটা হলো কানা জনি। বুঝলে, শত হলেও…'

এই সময়ে জাফেরিনোকে কথা থামাতে হলো। কারণ মাতে ঢালতে গিয়ে চিকো পেদ্রোর হাত থেকে লাউয়ের খোলাটা খসে পড়ায় তার দুটো হাতই পুড়ে গেছে।

'কি হলো, চিকো?'

নতমুখে নিজের বড়োসড়ো চৌখুপি নকশা-কাটা রুমালে হাত দুটো মুছে নিয়ে বৃদ্ধ মানুষটা নিচু গলায় বললো, 'ও কিছু নয়, বন্ধু! কিচ্ছু হয়নি…'

'কিছু নয়, কিন্তু তাতেই তো তোমার চোখে জল এসে গেছে! আমি বলছি শোনো, ওখানটাতে একটু জলপাইয়ের তেল লাগিয়ে নাও—তাতে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা চলে যাবে।'

'না না, আমার সত্যিই তেমন কিছু হয়নি…'

হাতটা রুমালে জড়িয়ে বুড়ো বললো, 'তুমি একটু নিচু গলায় কথা বলো, বন্ধু। কারণ বাড়ির ভেতরে আমার গিন্নী রয়েছে তো…এ সমস্ত মারামারির গল্প শুনে ও ভীষণ অস্থির হয়ে ওঠে।'

কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। সেই মুহূর্তে ওরা বাড়ির ভেতর থেকে একটা শ্বাস রোধ হয়ে আসা নিদারুণ যন্ত্রণাকাতর ফোঁপানির শব্দ শুনতে পেলো।

কেউ বুঝতে পারলো না, কেন সেদিন থেকে বৃদ্ধ চিকো পেদ্রো আর বাড়ির সামনে বসে বসে মাতের পাত্রে চুমুক দেয় না। এমন কি কুঞ্জলতাগুলোও যত্নের অভাবে শুকিয়ে যেতে শুরু করলো।

তারপর আরও একটা বছর মানুষটা মুসাফিরদের যত্নআত্তি করেছে। কিন্তু নতুন একটা শীতের শুরুতেই তার স্ত্রী মারা গেলো। বাড়ির পেছন দিকে একটা ক্যালাব্যাশ গাছের তলায় চিকো পেদ্রোকেও যখন তার জীবনসঙ্গিনীর পাশে সমাধিস্থ

করা হলো, অবশিষ্ট কুঞ্জলতাগুলোতে তখনও ফুল ধরতে শুরু করেনি। ক্যালাব্যাশ ফুলগুলো বড়ো ক্ষণজন্মা—ফুটেই ঝরে পড়ে। নভেম্বরের গোড়ার দিকে তারা গোলাপী পাপড়ির স্তূপীকৃত সুষমায় সমাধি দুটোকে অপরূপ করে সাজিয়ে তোলে, যা এই নির্জন অঞ্চলে কোনো বন্ধুর মরমীয়া হাতও করবে বলে আশা করা যায় না।

চিকো পেদ্রোর সমস্ত সম্পত্তি তার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের হাতে গিয়ে বর্তায়। সে জমিজমাগুলোকে ভাড়া দিয়ে দেয়, বাড়িটা নিয়ে আর মাথা ঘামায় না।

আজ পথচারীরা ওখান দিয়ে যাবার সময় দেখতে পায়, বাড়ির দরজাটা বন্ধ। বাড়িটা এখন আর কাউকে আশ্রয় দেয় না। কাঠের বেঞ্চিটা উধাও হয়ে গেছে। কুঞ্জলতার মাচানটা ভেঙে পড়েছে, ভেঙে গেছে বাখারির বেড়াগুলোও। বৃষ্টি বাদল আর ঝোড়ো বাতাস ছাদটাকে ধ্বংস করে—ইতিমধ্যেই সেখানে একটা বড়োসড়ো গর্ত হয়েছে—আঘাত হানবে দেয়াল, দরজা আর জানলাগুলোতে···আস্তে আস্তে বাড়িটা একটা ধ্বংসস্তূপ হয়ে উঠবে। শুধু কীট আর পতঙ্গের দল চিরদিন সাদর অভ্যর্থনা পাবে সেখানে।

এবং অবশেষে সেই ধ্বংসস্তূপও একটু একটু করে একদিন সবুজ মাটিতে লীন হয়ে যাবে—যেমন করে লীন হয়ে গেছে ওখানে প্রায় এক শতাব্দীকাল কাটিয়ে যাওয়া দুটি দয়ালু মানুষের জীবন।

কিন্তু ডুমুর গাছ দুটো থাকবে। আর থাকবে বাড়ির পেছন দিককার ক্যালাব্যাশ গাছটা—দুটি বিস্মৃত সমাধিতে সে তার গোলাপী ফুল ছড়িয়ে যাবে চিরদিন।

অনুবাদ / দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যুভোজ

সেভদেৎ কুদরেৎ

তুরস্কে আধুনিক ছোটগল্পের অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন শিল্পী সেভদেৎ কুদরেৎ। জন্ম ১৯০৭ সালে ইস্তানবুলের প্রায় নিঃস্ব একটা পরিবারে। শৈশবে বাবাকে হারানোর ফলে মার কায়িক পরিশ্রমেই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পান। পরবর্তীকালে সাহিত্যের অধ্যাপক এবং অধিবক্তা হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কবিতা ও নাটক দিয়ে সাহিত্যজীবন শুরু করলেও গল্প-উপন্যাসেই তাঁর জনপ্রিয়তা সবচাইতে বেশি। 'সহপাঠী' 'আকাশে একটাও মেঘ নেই' 'পিঁপড়েটাকে চেনো' তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। নিচের ছোটগল্পটিতে শৈশবের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাকেই রূপ দিয়েছেন আশ্চর্য নিপুণভাবে।

গ্রীষ্মেই বাতাসের রঙ বদলে যায়। পাংশুল আকাশের নিচে পৃথিবীটাকে কেমন যেন ভয়ঙ্কর মনে হয়। লোকজন তখন শুধু কাজের ধান্ধাতেই বাইরে বেরোয়। পথঘাট, বিশেষ করে পেছনের অলিগলিগুলো ফাঁকাই পড়ে থাকে। কড়িগাছের নিচে, মসজিদের আঙিনায়, ঝরনার ছায়ায় সাধারণত রাস্তার ছেলেরা এসে জোটে। গ্রীষ্মকালে ঝরনাগুলো কোনো সময়েই একেবারে ফাঁকা যায়না, দৈনন্দিন জলের জন্যে কেউ না কেউ সেখানে উপস্থিত থাকে।

সেদিন দুপুরবেলায় একটি ছেলে ঝরনায় জল আনতে গিয়েছিলো, হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এসে প্রথমেই যার সঙ্গে দেখা হলো তাকে বললো:

'দুর্সান আগা মারা গ্যাছে!'

দুর্সান আগা পাড়ার খুব পরিচিত একটা নাম। বয়েস প্রায় পঞ্চাশ। শক্ত-সমর্থ চেহারা, ঝাঁকড়া কালো দাড়ি। দুর্সান আগা বাড়ি বাড়ি জল বয়ে ছোট একটা দোতলা বাড়িতে বউ আর দুটো বাচ্চা নিয়ে কোনোরকমে দিন গুজরান করতো। তার সম্পদের মধ্যে ছিলো কেবল একটা বাঁক আর বাঁকের দু প্রান্তে শিকলিতে ঝোলানো দুটো টিনের পাত্র। রোজ ভোরে বাঁকটা কাঁধে ফেলে পাত্র দুটো শিকলিতে ঝুলিয়ে সে বেরিয়ে পড়তো, প্রথমেই নিজের গলিটাতে সে হেঁকে ফিরতো:

'জল? জল চাই?'

তার চাপা অথচ গভীর কণ্ঠস্বর গলির শেষ বাড়িটা পর্যন্তও প্রতিধ্বনিত হতো। যাদের জলের প্রয়োজন তারা ডেকে বলতো, 'দুর্সান আগা, আমাকে এক ভার' কিংবা 'দু ভার' কিংবা 'তিন ভার দিও।' এক ভার মানে দু টিন জল। দুর্সান আগা তখন

পাহাড় বেয়ে ঝরনার কাছে যেতো, তারপর পাত্রদুটো ভর্তি করে বাড়ি বাড়ি বয়ে দিয়ে আসতো। এমনি ভাবে চলতো সারাটা দিন। প্রতিবারের জন্যে পেতো তিন করুশ। এইভাবে দু বেলা দু মুঠো আহার জোটানো যেন ছুঁচ দিয়ে কুয়ো খোঁড়ার মতো, তিলে তিলে সংগ্রহ করা। যদি কেবল তার রোজগারের ওপর নির্ভর করতে হতো, তাহলে আর চার-চারটে প্রাণীর মুখে অন্ন যোগানো সম্ভব হতো না। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁর বউ গুলয়াজের সপ্তায় তিন-চারবার ডাক পড়তো ঠিকে ঝির কাজ করার জন্যে। ওর সীমিত কাজের মধ্যে নানা ছুতোয় একটু বেশিই জল খরচ করে স্বামীর আয় বাড়াবার চেষ্টা করতো। ব্যাপারটা ছোটখাটো এক ধরনের প্রবঞ্চনা হলেও নিঃসন্দেহে করুণ এবং খুব কমই ক্ষতিকর---বড়জোর এক টিন কি দু টিন জল, যাতে ওর স্বামী আরও তিন কুরুশ বেশি রোজগার করতে পারে।

এখন এসব হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেলো। অচিরেই লোকের মুখে মুখে দুসান আগার মৃত্যুর প্রকৃত কারণটা জানা গেলো। কানায় কানায় ভরা জলের পাত্রদুটো বাঁকের আংটায় ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ানোর সময়েই হঠাৎ বরফের ওপর পা পিছলে যায়। সারা রাত ধরে জমে বরফের উপরিভাগটা ছিলো কাঁচের মতো স্বচ্ছ আর পিছোল, তার ওপর ক্রমাগত ঝরনার জল পড়ছিলো। ফলে ভরা পাত্রের ভার নিয়ে সে টাল সামলাতে পারেনি, কলের নিচের পাথরটায় মাথা ঠুকে গিয়েছিলো। কে আর ভাবতে পেরেছিলো হঠাৎ এভাবে তার মৃত্যু ঘটবে! দুসান আগাকে দেখলে মনে হবে তার মাথার ঘায়ে পাথরই বুঝি গুঁড়িয়ে যাবে। কেউ ভাবতেই পারেনি তার মাথার খুলিটা এভাবে চুরমার হয়ে যাবে। আসলে মানুষ যতই শক্তসমর্থ হোক না কেন, মৃত্যু যখন আসে এইভাবে হঠাৎই আসে।

খবরটা শুনে গুলয়াজ বরফের মতো জমাট বেঁধে গেলো। এটা কি ওর সেই প্রবঞ্চনারই শাস্তি? না না, আল্লা কখনও এত নিষ্ঠুর হতে পারে না। এটা নিছকই একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। অনেকেই সাক্ষী আছে: পা পিছলে পড়েই সে মারা গিয়েছিলো। এভাবে যে কেউ পড়ে গিয়ে মারা যেতে পারে।

মারা হয়তো যেতে পারে, কিন্তু সংসারের ভরণ-পোষণের জন্যে তারা কিছু না কিছু অন্তত রেখে যায়। দুসান আগার সম্পত্তি বলতে কেবল দুটো টিনের পাত্র আর একটা বাঁক।

গুলয়াজ এখন কি করবে? এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ও কেবলই ভাবে, কিন্তু কোনো কূলকিনারা পায় না। দুটো ছেলে নিয়ে, যার একটা বয়েস নয়, অন্যটার ছয়—ওর একার পক্ষে সবকিছু সামলানো সহজ নয়। সপ্তায় মাত্র দু-তিনবার কাপড় কেচে ও দুটো পেট চালাবে কি করে? হঠাৎই ওর নিজের খেয়াল-খুশিমতো জল খরচের

কথাটা মনে পড়ে যায়। এখন আর জলের কথা ওকে ভাবতে হবে না। চোখের পলকে সবকিছুই বদলে গেছে। এখন আর বেশি বা কম জল খরচের মধ্যে কোনো তফাত নেই। যদি কোনো উপায় পাওয়া যেতো তাহলে এই ঝিগিরি ও একেবারেই ছেড়ে দিতো। যে জলকে ও এতদিন ভালোবেসে এসেছে, হঠাৎ সেটাই হয়ে উঠলো একটা ঘৃণার বস্তু। জলের উচ্ছলতার মধ্যে যেন বিশ্বাসঘাতকতার আভাস রয়েছে, তার বহে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে একটা বৈরী ভাব। এখন ও আর জলের ধারে-কাছেই ঘেঁষতে চায় না।

পরিবারে কারো মৃত্যু ঘটলে সাধারণ কেউ রান্নাবান্নার কথা ভাবে না। খাবার কথাই সবাই ভুলে যায়। এই অবস্থাটা চলে ছত্রিশ, কিংবা বড় জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা। কিন্তু তারপর যখন নাড়িতে পাক ধরে, কিংবা পেশীতে টান পড়ে, পরিবারেরই কেউ না কেউ তখন বলে, 'এসো, সামান্য একটু কিছু মুখে দাও।' এমনি ভাবেই ধীরে ধীরে জীবনযাত্রার পুরনো অভ্যেসটা আবার ফিরে আসে।

শোকের বাড়িতে দু-একদিনের জন্যে খাবার পাঠিয়ে দেওয়াটা মুসলমান সমাজের রেওয়াজ। গুলয়াজ আর ওর ছেলেদের জন্যে প্রথম খাবার এলো কোণের ওই সাদা বাড়িটা থেকে। ওটা সওদাগর রৈফ ইফেন্দির বাড়ি। বাড়িটা যে শরিফ কোনো আদমীর সেটা দূর থেকে দেখলেই বোঝা যায়। দুসান আগা মারা যাবার পরের দিন দুপুরে মস্ত একটা থালা নিয়ে সাদা বাড়ির ঝি কড়া নাড়লো গুলয়াজের দরজায়। থালায় সাজানো ছিলো মুরগীর ঝোল দিয়ে রাঁধা শিমুই, সুস্বাদু চাটনি মেশানো খানিকটা মাংস, পনিরের পুর দেওয়া রুটি আর মিষ্টি।

সত্যি বলতে কি সেদিন কারুরই খাবার ইচ্ছে না, কিন্তু থালা থেকে ঢাকনা তুলতেই শিথিল হয়ে এলো সেই অনুভূতির তীব্রতা। নিঃশব্দে সবাই জড়ো হলো খাবার টেবিলটাতে। হতে পারে এমন ভালো খাবার এর আগে ওরা কখনও খায়-নি, কিংবা খিদের জ্বালাই হয়তো ওদের বোধকে তীব্র করে তুলেছিলো, তাই ওরা দেখলো প্রতিটা খাবারই অসম্ভব সুস্বাদু। একবার খাবার পর সন্ধ্যেবেলায় ওরা আবার টেবিলের সামনে গিয়ে বসলো এবং দুপুরে যেটুকু অবশিষ্ট ছিলো তাই দিয়ে খিদে মেটালো।

পরের দিন আর এক প্রতিবেশী খাবারের ভার নিলো। এমনি ভাবে চললো তিন-চারদিন। অবশ্য পরের দিকের কোনো খাবারই প্রথম দিনের তুলনায় অমন সুপ্রচুর আর সুস্বাদু ছিলো না, তবু গুলয়াজদের বাড়িতে যা রান্না হয় তার তুলনায় অনেকগুণ ভালো। এই ভাবে চললে গুলয়াজ আর ওর ছেলেরা জীবন-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতো, কিন্তু যখন থালাগুলো আসা বন্ধ হয়ে গেলো আর বড় রাস্তার

দোকান থেকে ওরা যে ভাবে খুচরো খুচরো কয়লা কিনতো, এখন আর সেভাবেও কেনা সম্ভব হচ্ছে না দেখে ওরা বুঝতে পারলো সামনেই অপেক্ষা করছে এক দুঃসহ দুঃখের দিন।

প্রথম যেদিন খাবার আসা বন্ধ হলো, সেদিন দুপুর পর্যন্তও ওরা আশা করে বসেছিলো আর রাস্তায় প্রতিটা পায়ের শব্দেই একবার করে দৌড়ে দরজার কাছে যাচ্ছিলো, যদি সাদা কাপড দিয়ে ঢাকা বড় থালা হাতে কাউকে দেখা যায়। কিন্তু না, খালি হাতে লোকজন শুধু রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে। সন্ধ্যেবেলায় ওরা বুঝতে পারলো যে কেউ আর খাবারদাবার আনছে না, ফলে আগের মতো বাড়িতেই নিজেদের রান্নাবান্না করতে হলো। গত কয়েকদিনে ওরা অন্য রকম খাবারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো, এখন গুলয়াজের প্রায় আলুনী রান্না মুখে রোচাই ভার। কিন্তু এতেই ওদের অভ্যস্ত হয়ে ওঠা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিলো না। তিন চারদিন, অন্তত কাঁচা আনাচ যে কদিন ছিলো, ফুরিয়ে না আসা পর্যন্ত ওদের ভালো করে খিদেই পেলো না। ময়দা মাখন আলু—সব কিছুই বাড়ন্ত। পরের কয়েকটা দিন হাতের কাছে যা পেলো ওরা তাই খেলো: দুটো পেঁয়াজ, এককোষা রসুন আর নিচু আলমারিটার এক কোণে পাওয়া একমুঠো শুকনো বান। শেষে এমন একটা দিন এলে যখন দেখা গেলো বাড়ির যাবতীয় চুবড়ি-ঝুড়ি শিশি-বোতল কৌটো সবই খালি। সেইদিনই প্রথম ওরা খালি পেটে শুতে গেলো।

পরের দিনও তাই। বিকেলের দিকে ছোট ছেলেটা কাঁদতে লাগলো, 'মা, পেটটা মোচড়াচ্ছে।' মা বললো, 'একটু ধৈর্য ধর বাবা, নিশ্চয় কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই।' ওদের সবারই মনে হলো পেটগুলো কুঁকড়ে বাচ্চা ছেলের মুঠোর মতো ছোট হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়ালেই মাথা ঝিমঝিম করে, এর চাইতে বরং চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা অনেক ভালো—মনে হয় যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে। রঙিন মূর্তিগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে চোখের সামনে, মাথার ভেতরটা ফাঁপা, কানের মধ্যে ভোঁ-ভোঁ করছে। ওরা লক্ষ্য করলো ওদের কণ্ঠস্বর ক্রমশই ক্ষীণ থেকে আরও ক্ষীণ হয়ে আসছে।

পরের দিন গুলয়াজ স্বপ্ন দেখলো রাস্তায় কে যেন একজন ঝি খুঁজছে। কে বলতে পারে, হয়তো সত্যিই একদিন সকালে ও খবর পাবে: 'গুলাজকে বোলো আজ এসে যেন কাপড়গুলো কেচে দিয়ে যায়।' হ্যাঁ, যে গুলয়াজ প্রতিজ্ঞা করে-ছিলো জলের ধারে-কাছেও ঘেঁষবে না, এখন এই ডাকটার জন্যেই ও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। অথচ পাড়ার লোকজনদের ধারণা এ সময়ে ওকে কাজে ডাকাটা ঠিক শোভন হবে না। 'আহা, শোকে বেচারির বুকটা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে,' সবাই বলাবলি করে, 'এ সময়ে ও কি আর কাচাকাচি করতে পারবে!'

সেদিন সকালে বিছনা ছেড়ে কেউ উঠতে পারে না, শুয়ে শুয়েই ওরা খাবার স্বপ্ন দেখে। ছোট ছেলেটা প্রায়ই বলতে থাকে, 'আখো, আখো, (হাত বাড়িয়ে সে ধরতে যায়) কি সুন্দর সেঁকা, নরম তুলতুলে রুটি !'

বড় ছেলেটা স্বপ্ন দেখে মিষ্টির। বোকা, কি ভীষণই না বোকা সে, যখন থালায় করে মিষ্টি এলো, তাকিয়ে তাকিয়ে না খেয়ে তার ভাগটা একবারেই গবগব করে গিলে ফেললো। আর একবার কখনও যদি পায়, তাহলে কি করবে সে খুব ভালো করেই জানে : আস্তে আস্তে, একটা একটা করে, তাকিয়ে তাকিয়ে খাবে।

গুলয়াজ চুপটি করে বিছনায় পড়ে থাকে, কান পেতে শোনে ছেলেদের প্রলাপ। ককিয়ে ওঠার ভয়ে ঠোঁট কামড়ে থাকে, তবু ওর বন্ধ চোখের পাতা থেকে চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা। বাইরে পৃথিবীটা চলতে থাকে একই ধারায়। বহু কাল, প্রায় সারাটা জীবনই কাটিয়েছে এই রাস্তায়, এখন ও শুধু শুনে শুনেই বলে দিতে পারে কোথায় কি ঘটছে।

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেলো। সেভাৎ, পাশের বাড়ির বাচ্চা ছেলেটা স্কুলে যাচ্ছে। সব সময়েই সে অমন সশব্দে দরজা বন্ধ করে। যদি বড় ভাই সুলেমান হতো, তাহলে সে খুব আস্তে আস্তেই দরজাটা বন্ধ করতো। স্বভাবে দু ভাই সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন যে বেতো বুড়িটা পা টেনে টেনে যাচ্ছে, ও হলো শাকির ম, শাকির জাহাজের কেবিনে ফাইফরমাস খাটে। বুড়ি এখন দোকান করতে চলেছে। রাস্তায় অনেকেরই পায়ের শব্দ। এবার যেটা শোনা যাচ্ছে, সে হলো নাপিত হুসেন ইফেন্দি, গলির শেষে লাল বাড়িটায় থাকে। রোজ সকালে ঠিক এই সময়ে গিয়ে সে বড় রাস্তায় তার সেলুনটা খোলে। পরের জন হচ্ছে হাসান বে, দালান ইদ্রেস আগার নাতি, বিজলি-সংস্থায় সে কেরানির কাজ করে। লেখাপড়া জানা একটা ভালো মেয়ে পেলেই সে বিয়ে করে এ পাড়া ছেড়ে চলে যাবে। এখন যার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, তিনি হচ্ছেন শিক্ষক খুরিয়ে হানিম। তারপর মুচি কৈজুল্লা ইফেন্দি আর খাজাঞ্চী সেমিল বে। এবং সব শেষে আসে রুটিওয়ালা। রোজ ঠিক এই সময়টাতে এসে ও দাঁড়ায় রিফকি বের বাড়ির সামনে। ঘোড়ার দুপাশে ঝোলানো বড় দুটো ঝুড়িতে বোঝাই থাকে রুটি। বোঝাই-ঝুড়ির ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ অনেক দূর থেকেই শোনা যায়।

বড় ছেলেটাই প্রথম ঝুড়ির ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুনতে পেলো, শুনে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকালো। ছোট ভাইও শুনে তাকালো দাদার দিকে। দুজনের চোখাচোখি হলো। ছোট ভাই বিড়বিড় করে বললো, 'রুটি।'

শব্দটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। গুলয়াজ উঠলো। ঘরের ভেতরে তখনও

হিম-হিম ভাব থাকায় বাইরে বেরুনোর আগে আলোয়ানখানাও জড়িয়ে নিলো, মনে মনে ভাবলো ধারে লোকটার কাছ থেকে দুটো রুটি চাইবে। কাচাকুচির কাজ পেলেই ও দেনাটা মিটিয়ে দিতে পারবে। দরজার খিলে হাত রেখে ও ইতস্তত করলো। উৎকীর্ণ হয়ে শব্দটা শুনছে। এগিয়ে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ ওর একাগ্রতাকে যেন ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। শব্দটা যখন মাত্র আর কয়েক পা দূরে, কে যেন ওকে বাধ্য করলো দরজাটা খুলতে। গুলয়াজ চোখ বড় বড় করে তাকালো রুটিগুলোর দিকে, যেন কি এক অপরূপ বস্তু চলে যাচ্ছে ওর চোখের সামনে দিয়ে। চৌকো ঝুড়ি দুটো এত চওড়া যে সাদা ঘোড়ার দু পাশ একেবারে জুড়ে রয়েছে আর এত ভারি যে মাটি প্রায় ছুঁই-ছুঁই করছে। দুটো ঝুড়িই একেবারে কানায় কানায় ঠাসা। সাদা ময়দায় তৈরি রুটিগুলো এত টাটকা যে ছুঁলেও আনন্দ হয়, এমন তুলতুলে নরম হয়তো আঙুলই বসে যাবে। ভারি সুন্দর একটা গন্ধ নাক দিয়ে ঢুকে গলার মধ্যে দিয়ে নেমে যায়। গুলয়াজ ঢোক গেলে। রুটিওয়ালাকে কিছু বলবে বলে যেই না ও মুখ খুলেছে, 'জলদি চ, হেট হেট' বলে লোকটা এমন উৎকট ভাবে চেঁচিয়ে উঠলো যে গুলয়াজ একটা শব্দও উচ্চারণ করার সাহস পেলো না, জমে যাওয়া মূর্তির মতো শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো ঝুড়িদুটো দরজার চৌকাঠে ধাক্কা খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে। আল্লার দোয়ার মতো খাদ্যসামগ্রী ওর চোখের সামনে দিয়ে চলে গেলো, অথচ ও হাত বাড়িয়ে নিতে পারলো না। ঘোড়াটা ধীরে কদমে এগিয়ে চলেছে আর ওর দীর্ঘ সাদা লেজটা রুমালের মতো এমন ভাবে নাড়ছে, যেন বলছে : 'বিদায়, গুলয়াজ! বিদায়!'

সশব্দেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ও আবার ঘরে ফিরে এলো। প্রতীক্ষায় থাকা বাচ্চাদুটোর শুকনো মুখের দিকে ও তাকাতে সাহস পাচ্ছে না, ভেবেই পাচ্ছে না খালি হাতদুটো কোথায় লুকোবে। হঠাৎ এই রিক্ত হাতদুটোর জন্যেই ওর নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হলো। কেউ কথা কইছে না, ছেলেদুটো অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। পাছে মার খালি হাত দেখতে হয়, সেই ভয়ে বড় ছেলেটা চোখ বন্ধ করে রয়েছে। তার দেখাদেখি ছোট ভাইও তাই করলো। ঘরের মেঝেতে পাতা আসনটায় গুলয়াজ বসলো—নিঃশব্দে, হালকা ছায়ার মতো। ঘাগরায় পা ঢেকে, নোংরা আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে ঘরের এক কোণে এমন জড়সড়ো হয়ে রইলো যেন কোনো অসীম শূন্যতায় মিলিয়ে যেতে চাইছে। ওকে দেখাচ্ছে ঠিক ছেঁড়া কম্বলের একটা পুঁটলির মতো। ঘরের ভেতরে দম-বন্ধ করা থমথমে নৈঃশব্দ্যটা আরও তীব্র হয়ে উঠছে! আধ ঘণ্টা, কি তারও বেশি, কেউ এতটুকু নড়াচড়া করেনি। অবশেষে ছোট ছেলেটাই প্রথম নীরবতা ভাঙলো, বিছনা থেকে সে চেঁচিয়ে ডাকলো :

'মা ! মা !'

'কি, বাবা ?'

'আমি আর সইতে পারছি না। পেটের মধ্যে কেমন করছে।'

'ওঃ আমার ছোট্ট সোনা, লক্ষ্মী সোনা !'

'এই যে, পেটে। কি যেন নড়ছে।'

'খিদেয় অমন হচ্ছে। আমারও হচ্ছে। ভাবিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি মরে যাবো। ঠিক মরে যাবো, মা।'

এই সময় বড ছেলেটা চোখ মেলে ভাইয়ের দিকে তাকায়। গুলয়াজ দুজনকেই লক্ষ্য করে। ছোটটা এখন নিশ্চুপ। তার চোখদুটোই বেশি বসে গেছে, ঠোঁটদুটো শুকনো, খসখসে আর ফ্যাকাসে। গালদুটো গর্তে ঢুকে গেছে, রক্তহীন বিবর্ণ সারা দেহ। ইশারায় গুলয়াজ বড ছেলেটাকে ডাকলো। ছেলেটা উঠতেই তাকে নিয়ে ও ঘরের বাইরে গেলো এবং দু ঘরের মাঝে ফাঁকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে, পাছে কেউ শুনতে পায় সেই ভয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, 'তুই একবার বোদোস্ মুদির কাছে যা। গিয়ে বল্ ও যেন আমাদের কিছু চাল ময়দা আর আলু ধার দেয়। কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা ওর দেনাটা মিটিয়ে দেবো।'

ছেলেটার গায়ের জীর্ণ কোটটা বাইরের ঠাণ্ডা আটকাবার পক্ষে যথেষ্ট মোটা ছিলো না। পায়ে জোরও ছিলো না এতটুকু। নিজেকে সামলে রাখার জন্যে দেওয়াল ধরে ধরেই তাকে হাঁটতে হচ্ছিলো। তবু শেষ পর্যন্ত সে সেরাপাশায় যাবার পাহাড়ের ধারে মুদির দোকানটায় গিয়ে পৌঁছলো। দোকানের ভেতরটা বেশ গরম, বড় একটা পাত্রে আগুন জলছে। অন্য খদ্দেররা চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করলো, যাতে মুদির সঙ্গে নিরিবিলিতে একটু কথা বলতে পারে আর সেই ফাঁকে খানিকটা আগুনও পুইয়ে নিতে পারে। সবাই চলে যাবার পর আগুনের পাশ থেকে এসে সে আধসের চাল আধসের ময়দা আর আধসের আলু চাইলো। তারপর পয়সা খোঁজার জন্যে পকেট হাতড়ে এমন একটা ভান করলো যেন টাকাটা ঘরে ফেলে এসেছে, শেষে বিরক্তি ভাব ফুটিয়ে বললো, 'ইশ্, টাকাটা ভুলে ফেলে এসেছি ! এখন কি হবে ? এই ঠাণ্ডার মধ্যে এতটা পথ যাবো আবার আসবো। তার চেয়ে তুমি বরং লিখেই রাখো, কাল যখন আসবো নিয়ে আসবো।'

এসব চালাকি বোদোস্ বেশ ভালোই বোঝে। চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে সে বললো, 'তুমি তো বেশ রোগাই হয়ে গ্যাছো দেখছি। ঘরে পয়সা থাকলে কি কেউ এত রোগা হয় ?' ছেলেটার সওদাগুলো মুদি একপাশে সরিয়ে রাখলো। 'আগে পয়সা নিয়ে এসো, তারপর নিয়ে যাও।'

ধরা পড়ে গেছে দেখে ছেলেটা খুবই বিব্রত বোধ করলো। 'ঠিক আছে, আমি নিয়েই আসছি।' কোনো রকমে কথাটা বলেই সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো।

ছেলেটা চলে যাবার পর বোদেস্ আগা তার বউকে বললো, বউ দোকানদারীতে মুদিকে নানা ভাবে সাহায্য করে, 'আহা, বেচারি! সত্যিই ওদের জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে! এখন থেকে যে কি ভাবে ওদের সংসার চলবে কে জানে?'

বউও সায় দিলো, 'সত্যি, ভাবলে আমারও কষ্ট হয়!'

দোকানে ঢোকার আগের চাইতে পথে বরফের মতো কনকনে ঠাণ্ডা এখন আরও অসহ্য মনে হচ্ছে। কোণের সাদা বাড়িটার চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আহা, ওখানে যারা বাস করে তারা কত না সুখী! তা বলে ওদের প্রতি তার এতটুকুও হিংসে নেই, বরং শ্রদ্ধাই আছে, যারা তাকে খাইয়েছে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ খাবার।

যতটা সম্ভব দ্রুত ছেলেটা বাড়ির পথে হেঁটে চলে। ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছে। ঘরে ঢুকে মা বা ভাইকে কিছুই বলার দরকার হয় না, তার খালি হাতদুটোই সব বলে দেয়। ওদের উৎসুক দৃষ্টির সামনেই পোশাক পালটে সে সোজা বিছনায় ঢোকে, যেটা তখনও খানিকটা গরম রয়েছে, তারপর বলে, 'উঃ, কি ঠাণ্ডা! আমার ভীষণ শীত করছে!' তার থরথর করে কাঁপতে থাকা শরীরে জড়ানো কম্বলটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করতে থাকে।

হাতের কাছে যা পায় গুলয়াজ তা-ই ছেলের গায়ে চাপিয়ে দেয় আর আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কম্পমান শরীরে ওগুলো ক্রমশই ওঠা-নামা করছে। এই কাঁপুনি চলে ঘণ্টা দেড়েক, কি তারও বেশি সময় ধরে, তারপরেই আসে জ্বর আর অবসন্নতা। ছেলেটা এলিয়ে পড়েছে, নিশ্চল, চোখদুটো আচ্ছন্ন। ঢাকা সরিয়ে গুলয়াজ হিমেল হাতের পরশে তার জ্বরে-পোড়া কপালটাকে একটু ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে।

সন্ধ্যে পর্যন্ত উতলা হয়ে মা ঘরময় পায়চারি করে। কি করবে কিছু বুঝে উঠতে পারে না। কিছু ভাবতেও পারে না। শুধু ঘর-বার ঘর-বার করে আর স্থির, উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দেওয়াল, কড়িকাঠ, আসবাবপত্রগুলোর দিকে। হঠাৎই মনে হয় ওর আর খিদে পাচ্ছে না। যেন অসম্ভব গরম কিংবা ঠাণ্ডায় ওর সমস্ত অনুভূতি বিবশ হয়ে গেছে, খিদের চোটে অসাড় হয়ে গেছে প্রতিটা স্নায়ু।

একটু আগেই সূর্য অস্ত গেছে। অসুস্থ ছেলের বিছনা থেকে গায়ের চাপাগুলো সরিয়ে মেঝের ওপর জড়ো করে রাখা হয়েছিলো, এখন সেটাকে অন্ধকারের একটা স্তূপের মতো মনে হচ্ছে। স্তূপটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ

গুলয়াজের মাথায় একটা বুদ্ধি আসে : আচ্ছা, এগুলোর বিনিময়ে কেউ ওকে সামান্য কিছু পয়সা দিতে পারে না ? মনে পড়লো পড়শীদের কে যেন একবার ওকে বলেছিলো বড়বাজারে কোথায় একটা দোকান আছে যারা পুরনো জিনিসপত্র কেনে। কিন্তু দোকানটা এখন নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে গেছে। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

একটা কিছু সমাধান খুঁজে বার করতে পারায় ও মনে মনে কিছুটা স্বস্তি পেলো এবং অস্থির পদচারণা থামিয়ে ছেলের রোগশয্যার পাশে এসে বসলো।

ছেলেটার জ্বর ক্রমশ বেড়েই চলেছে। নির্নিমেষ, নিশ্চল হয়ে মা বসে রয়েছে। খিদের জ্বালায় ছোট ছেলেটা ঘুমোতে পারেনি। সেও বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। জ্বরের ঘোরে অসুস্থ ছেলেটা কাতরাচ্ছে, ছটফট করছে, একটুও স্বস্তি পাচ্ছে না। তার গালদুটো পুড়ে যাচ্ছে, বিলাপ বকছে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কড়িকাঠের দিকে। দীর্ঘায়ত, স্থির, ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু কিছুই দেখছে না। বিছনা থেকেই ছোট ছেলেটা খুব মনোযোগ দিয়ে দাদাকে লক্ষ্য করছিলো। অসুস্থ ছেলেটা যখন আবার জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে শুরু করলো, ছোটটা তখন বিছনায় উঠে বসে মার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বললো, 'আচ্ছা মা, দাদা কি মরে যাবে ?'

যেন হিমেল হাওয়ার স্পর্শে গুলয়াজ থর থর করে কেঁপে উঠলো, শঙ্কাতুর চোখে তাকালো ছেলের দিকে। 'হঠাৎ এ কথা জিগেস করছিস কেন ?'

মার দৃষ্টির সামনে ছেলেটা মুহূর্তের জন্যে নিশ্চুপ রইলো, তারপর দাদা যাতে শুনতে না পায় এমনি ভাবে মার আরও কোল ঘেঁষে এসে কানের কাছে চুপি চুপি বললো :

'তাহলে কোণের ওই সাদা বাড়িটা থেকে আমাদের জন্যে খাবার আসবে।'

অনুবাদ / অসিত সরকার

দুর্ভিক্ষ

এস. রাজারত্নম

মালয়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় কথাশিল্পী এস. রাজারত্নম। জন্ম ১৯০৯ সালে সিংহলে। শৈশব থেকেই মালয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আইন ও সাংবাদিকতা নিয়েও পড়াশুনা করেন। ১৯৩৬-৪৬ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে কাটান এবং এই সময়েই সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিছুদিন 'সিঙ্গাপুর স্ট্যানডার্ড' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৯ সালে সাংস্কৃতিক মন্ত্রী হিসাবেও নির্বাচিত হন। দেশ-বিদেশের বহু পত্র-পত্রিকায় তার অজস্র ছোটোগল্প প্রকাশিত হয় এবং বাস্তবধর্মী সমাজ-ভাবনা ও রাজনৈতিক সচেতনতার জন্যে তার গল্পগুলি রীতিমতো জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

খরার পরেই এলো দুর্ভিক্ষ—এ যেন এক দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেয়ে আরও ঘোরতর এক দুঃস্বপ্নের কবলে গিয়ে পড়া। ভরাট ধানের খেত, যেখানে সোনালি ফসলের মৃদু খসখসানি শুনতে পাবার কথা, সেখানে এখন পড়ে রয়েছে শুধু ধান-গাছের আধপোড়া গোড়াগুলো। চাষীরা তাদের ধূলিধূসরিত খেতগুলোর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে এর জবাব খুঁজে বেড়ায়—দিনে দিনে তাদের চোখগুলো আরও কোটরগত আর নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে। রাত্রিবেলা ক্ষুধার্ত শিশুরা ঘুমের মধ্যে ককিয়ে উঠলে এক অসহায় ক্রোধ তাদের হৃৎপিণ্ডগুলোকে সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেলে। মাঝে-মধ্যে সেই অস্ফুট গোঙানিকে চাপিয়ে কোনো স্ত্রীলোকের করুণ আর্ত চিৎকার শোনা গেলে ওরা বুঝতে পারে, ওদের মধ্যে নিঃশব্দে পায়চারি করতে থাকা মহাকাল ফের একটি শিকারকে খুঁজে পেয়েছে। অথচ সামান্য কিছুক্ষণ বাদেই ওরা মৃত্যুর নামে কেঁপে উঠতেও ভুলে যায়।

এই অখ্যাত গ্রামটির অবস্থান এমনই এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে আর দুর্ভিক্ষ এখন এতোই সর্বব্যাপী যে অবিলম্বে এখানে সাহায্য আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। সঞ্চিত রসদ ফুরিয়ে যাবার পর মানুষ তন্ন তন্ন করে গ্রামের সর্বত্র খাবার খুঁজতে থাকে…খেতে শুরু করে যে কোনো ধরনের পাখি, শিকড়-বাকড় আর জীবজন্তু—যা জোটে। কিন্তু কিছুদিন পরে সেগুলোও দুর্লভ হয়ে ওঠে। শুধু শকুনের দল আকাশের অনেক উঁচুতে চক্রাকারে উড়ে উড়ে পৃথিবীটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছাখে আর ডানা ঝাপটায়…মাটির নিচে ইঁদুরগুলো আরও মোটা আর চকচকে হয়।

একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ চিরদিনই গ্রামবাসীদের পরস্পরকে পরস্পরের কাছা-

কাছি নিয়ে আসে। এ ক্ষেত্রেও তারা একসঙ্গে মিলে খাদ্যের সন্ধান করতে লাগলো—খেয়াল রাখলো যাতে একজনের দুঃখ কষ্ট নিয়ে দশজনে মাথা ঘামায়।

মাটি যখন প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দিতে ব্যর্থ হলো, তখন গ্রামবাসীরা নিষ্ঠাবান হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের গৃহপালিত পশুগুলোকে হত্যা করে খিদে মেটাতে লাগলো। প্রথম দিকে এ ব্যাপারটার কথা চিন্তা করে তাদের শরীর গুলিয়ে উঠেছিলো…এ ধরনের একটা পাপ কাজ করার কথা বিবেচনা করতে গিয়ে একে অন্যের দিকে অস্বস্তিভরে তাকিয়ে ছিলো তারা। কিন্তু খিদে এক আপোষবিরোধী অদম্য অত্যাচারী শাসক।

অথচ সব কটা গবাদি পশুকে কেটেকুটে খেয়ে ফেলার পরেও ফের তাদের খিদে পেয়ে গেলো।

'আমার ছোটো ছেইলাটা কাল সারা রাত্তির কেন্দেছে গ…জোরে থাপ্পর মেইরে তাকে থামাতি হয়েছে।'

'রিলিফের টিরিনটা যদি আসে!…কাল রেইতে আমি স্বপ্ন দেইখেছি। কত্তো কত্তো খাবার…বস্তা বস্তা চাইল…'

'বোকার স্বপ্ন!' বিস্ফারিত চোখে এক বৃদ্ধা চিৎকার করে ওঠে, 'স্বপ্ন আমিও দেইখেছি। কিন্তু দেইখলম, সব জায়গাতেই শুধু মরা মানুষ। ভগমান নেইমে এসে আমার সঙ্গে মরণ নিয়ে কতা বইললেন। হতচ্ছাড়ার দল, তুদের শয়তানির জন্যি ভগমান তুদের সাজা দিচ্ছেন! আর কুনো আশা নেই…আমি জানি। ভগমান…'

'চুপ থাক, বুড়ি মাগী! উ সমস্ত গাঁজাখুরি গপ্পো শুনায়ে তুই ছেলেপিলেগুলোরে ভয় পাইয়ে দিবি।'

ভালো খাওয়াদাওয়ার সুবাদে গ্রামের পুরোহিতটির চেহারা চিরদিনই নধর-কান্তি। কিন্তু তার চেহারার সে চেকনাই বহুদিন আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু বলবেন বলে তিনি সকলকে কথা থামাতে ইঙ্গিত করলেন।

'কোথাও কোনো খাবার নেই।' তিনি বললেন, 'শুধু মুরুগাসু যদি আমাদের দয়া করে তাহলে আমরা কিছু খাবার পেতে পারি। গতকাল সন্ধ্যায় দেখলাম, সে তার বলদটাকে ছাউনিতে রাখার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে রাজি করাতে পারলে আমরা কয়েকদিনের মতো খাবার পেয়ে যাবো।'

মুরুগাসু একজন সম্পন্ন চাষী, আধ মাইল দূরে তার বাস। একে বড়োলোক, তায় কারুর সঙ্গে হৃদ্যতা করার মতো প্রকৃতিও তার নয়—তাই সকলের কাছ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকে। গ্রামের সকলের সঙ্গে তার খুবই অসদ্ভাব। তার কালো পেশীবহুল শরীরটার শক্তিসামর্থ্য তাকে সকলের কাছে একটা ভয় এবং ঘৃণার বস্তু

করে রেখেছে। লোকটা সম্পূর্ণ নিজের মনে থাকে, খেতের কাজে অন্যের সাহায্য যথাসম্ভব কমই নেয় এবং তাড়ির দোকানে বসে শুধু বিষণ্ণ দৃষ্টিতে নিজের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে থাকে—চতুর্দিকের হাসি আর হুল্লোড় তাকে স্পর্শও করতে পারে না। মা মারা যাবার পর সবাই আশা করেছিলো, মুরুগাস্থ যাকে বিয়ে করবে সে হয়তো মুরুগাস্থর প্রাণে খানিকটা আন্তরিক কোমলতা এনে দেবে। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে সে গ্রামের ঘটকদের আদৌ সায় জানায়নি। দুর্ভিক্ষ লাগার পরেও সে সকলের কাছ থেকে আলাদা হয়ে থেকেছে, খাদ্যের জন্যে সংঘবদ্ধ অন্বেষণে কোনো অংশ নেয়নি।

অনেক যুক্তিতর্কের পরে গ্রামবাসীরা পুরোহিতের সঙ্গে মুরুগাস্থর কাছে গিয়ে আরজি পেশ করতে রাজি হলো।

একজন বললো, 'আমরা যদি উকে কিছু জিগাস না করে মালটা চুরি কইরে লিয়ে আসতুম, তাহলি সিটা আরও সহজ হতো, লয় কি?'

'প্রথমে জিগেস করাই ভালো।' পুরোহিত বললেন, 'সে আমাদের এতোগুলো লোককে ফেরাতে পারবে না।'

'কেনো পারবে নাই?' অন্য একজন বললো, 'আমরা উকে খুব ভালো কইরেই চিনি।'

'তা হলেও আমরা প্রথমে ওকে জিগেস করবো,' পুরোহিত অবিচলিত কণ্ঠে বললেন। 'তা ছাড়া প্রতিদিন রাতে বলদটাকে সে খাটালের মধ্যে তালা বন্ধ করে রাখে।'

গ্রামবাসীরা যখন সদলবলে দেখা করতে এলো, মুরুগাস্থ তখন তার বলদে-টানা গাড়িটার মেরামতি কাজে ব্যস্ত। কয়েক গজ দূরে একটা শুকনো লেবু গাছের তলায় শুয়ে রয়েছে তার বলদটা। ঠিকরে বেরুনো হলদে চোখ দুটো তুলে মুরুগাস্থ এক মুহূর্ত লোকগুলোকে লক্ষ্য করলো, তারপর ভারি কুড়োলটা দিয়ে ফের একখণ্ড কাঠ চিরতে শুরু করলো।

পুরোহিত সামান্য একটু কেশে নিয়ে ধীরে সুস্থে মুরুগাস্থর কালো চকচকে পিঠ-টার দিকে এগিয়ে গেলেন।

'ভাই মুরুগাস্থ, আমরা কেন এসেছি তা তুমি জিগেস করলে না তো?'

কুড়োলটা রোদে ঝলসে উঠলো, মুরুগাস্থ কোনো জবাব দিলো না।

'আমরা তোমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি,' পুরোহিত ফের বললেন। গ্রামের মেয়ে আর শিশুরা ক্ষুধার্ত।'

'তাতে আমি কি করতি পারি?' মুরুগাস্থ রুক্ষ স্বরে সংক্ষেপে বললো, 'আমার

কাছে দিবার মতো কিছু নাই।'

'তোমার একটা বলদ আছে, ভাই…'

'ছাকো ছাকো, বলদটা কেমুন মোটাসোটা,' একজন চিৎকার করে উঠলো।

মুরুগাসু জনতার দিকে তাকালো, সূর্যের আলোয় ছুরির ফলার মতো ঝলসে উঠলো তার চোখ দুটো।

'হ্যা, তা আছে। কিন্তু তাতি কি?'

জনতার ভেতর থেকে ক্রুদ্ধ গুঞ্জন উঠলো। পুরোহিত তাদের শান্ত হতে অনুরোধ জানিয়ে মুরুগাসুকে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'এই মুহূর্তে তুমি তোমার মন থেকে ঘৃণাটাকে ভুলে যেতে পারো না, ভাই? চেয়ে ছাখো, সবাই ক্ষুধার্ত। এমন সময়েই তো একে অন্যকে সাহায্য করতে হয়!'

'হাঃ হাঃ, কি মজার কতা!' মুরুগাসু বিদ্রূপের সুরে বললো, 'তাহলি খিদের জ্বালায় একজন পুরুত ঠাকুরও পাপ কাজ করতি রাজি হয়—অ্যা! একজন বেরাহ্মণ পুরুত কি না একটা পবিত্র জীবের মাংস খাওয়ার জন্যি এই লোকগুলোনরে খেপায়ে তুইলছে!'

উপহাসের তীক্ষ্ণতায় পুরোহিত কুঁকড়ে উঠলেন। তবু সবটুকু স্থৈর্য আর গাম্ভীর্য নিয়ে তিনি বললেন, 'এ সমস্ত সময়গুলো যে বড্ড কঠিন, ভাই! এ সময়ে কেউ ঘোড়ার মাংস খেলো, কি গরুর মাংস খেলো—সেটা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হচ্ছে, বেঁচে থাকা। আর একজন ব্রাহ্মণও মানুষ, তারও মৃত্যুভয় থাকে।'

'তাহলি মরো!' মুরুগাসু ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, 'নেড়ি কুত্তার মতো নিচে নেইমে যাবার চাইতি মরা অনেক ভালো! আমি দেখিছি, কিভাবে তোমরা পবিত্র জীব-গুলোর রক্তে মাটির বুককে রাঙায়ে দেছো—কিভাবে বেহায়ার মতো তাদের মাংস গিলেছো। কিন্তু আমি তোমাদের অমন পাপ কাজের ভাগীদার হবোনি। য্যাতো-ক্ষণ আমার হাত দুটোতি অ্যাত্তোটুকুও শক্তি থাইকবে, ত্যাতোদিন তুমরা বা তুমা-দের উপোসী বাচ্চারা খাওয়ার জন্যি আমার বলদটারে কিছুতেই খুন করতি পারবে নি। তুমাদের সবাইকে খুশি কইরবার জন্যি আমি রাস্তার বেওয়ারিশ নেড়ি কুত্তা হতি পরেবো নি। এখনও একজন খাঁটি হিন্দু হয়ে বেঁইচে থাকার মতো সাহস আমার অন্তত আছে।'

'শোনো ভাই, তোমার ঘৃণা…'

'হ্যা—তুমরা এখনও আমাকে য্যাতোটা ঘেন্না করো, আমিও তুমাদের ঠিক ত্যাতোটাই ঘেন্না করি। অথবা তার চাইতেও বেশি করি। তার কারণ, প্রথমত তুমরা একটা পবিত্র জীবের মাংস খেতি চাইছো আর দ্বিতীয়ত সে জন্যি তুমরা

গোলামের মতো আমার সাহায্য চাইতি এসেছো।'

ভিড়ের মধ্যে ফের ক্রুদ্ধ গুঞ্জন উঠলো, মুরুগাসু শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরলো তার কুড়োলের হাতলটা। একটা হিংস্রতা শুরু হবার আশঙ্কায় পুরোহিত জনতাকে শান্ত হয়ে থাকার আবেদন জানালেন। মুরুগাসু ফের তার কাজে মন দিলো। খানিকক্ষণ বাদে গ্রামবাসীরাও বিদায় নিলো। মুরুগাসু তখন মাটিতে থুথু ছিটিয়ে নিজের ক্ষুধার্ত পেটটাতে হাত রগড়ে নিলো কয়েক বার।

কিন্তু কয়েক দিন বাদে পুরোহিত ফের গ্রামবাসীদের মুরুগাসুর খামারের দিকে নিয়ে চললেন। গ্রামবাসীদের কুঞ্চিত শ্রীহীন মুখগুলো এখন নির্বাক, কিন্তু এবারে তারা সঙ্কল্পে একেবারে অটল। গত কয়েক দিনের দুঃস্বপ্ন এখন তাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। গত কয়েক দিনে মৃত্যু আরও ঘন ঘন হানা দিয়েছে তাদের মধ্যে।

আবালবৃদ্ধবনিতার মিছিলটা ধীর পায়ে মুরুগাসুর বাড়ির সদর দরজাটা পেরিয়ে এলো। ওদের চেহারা এখন হাড়পাঁজরসর্বস্ব, কোটরগত চোখে ক্ষুধিত দৃষ্টি—দেখে মনে হয় যেন ভয়ঙ্কর এক মৃতের মিছিল। ওদের পায়ের নিচে আলগা মাটির মৃদু শব্দ ছাড়া চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ নিঝুম।

খাটালের দরজার কাছে উবু হয়ে বসেছিলো মুরুগাসু। জনতা সামনে এসে দাঁড়াতেই সে মুখ তুলে তাকালো। গত কয়েক দিনে সম্পূর্ণ বদলে গেছে মানুষটা। চেহারাটা এখনও আগের মতোই চওড়া আর পেশল আছে বটে, কিন্তু তার ভেতরে শক্তির সেই অদম্য দ্যুতিটা আর নেই—যা চিরদিন সকলে ভয় করে এসেছে। মুরুগাসুর চোখ দুটো যেন শূন্য কোটরে প্রাণহীনের মতো ঘোরাফেরা করছে, মাথার চুল প্রায় ধূসর।

সামান্য ইতস্তত করে পুরোহিত বললেন, 'আমরা তোমার বলদটাকে নিতে এসেছি, মুরুগাসু। এবারে আমরা ওটাকে না নিয়ে যাবো না।'

'বলদ? কোন্ বলদ?' যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলো মুরুগাসু। কপালটা কুঁচকে উঠলো তার, যেন কি একটা মনে করতে চেষ্টা করলো মানুষটা। 'ওহো, বলদটা? সিটা খাটালের মধ্যি রয়েছে।'

'আমরা ওটাকে মেরে, নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবো।'

মুরুগাসুর অশান্ত চোখ দুটো পুরোহিতের দিকে স্থির হলো।

'খাবার?…তাই না?…কিন্তু…কিন্তু তা হতি পারে না।' মুরুগাসু থেমে থেমে বললো, 'কারণ…কারণ…দাঁড়াও, আমারে এট্টু ভেবে নিতি দাও।…হ্যাঁ—কারণ তুমরা একটা পবিত্র জীবের মাংস খেতি পারো না। এ তো আমি তুমাদের আগেও বুইলেছি। আমার বলদটার মাংস তুমরা খাবে—আমি তা কিছুতেই হতি দেবোনি।'

মুরুগাসুর মুখ দিয়ে একরাশ লালা বেরিয়ে এলো, আস্তে আস্তে তা গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে লাগলো নিচের দিকে। জনা ছয়েক মানুষ তাকে ঘিরে রইলো, তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

'কিন্তু তোমাকে যে দিতেই হবে, ভাই!' পুরোহিত বললেন, 'কোথাও কোনো খাবার নেই। গ্রামের সবাই ক্ষুধার্ত, সবাই মরিয়া হয়ে উঠেছে। তোমার কি হৃদয় বলে কিছু নেই?'

'তা আছে,' একটি অল্পবয়সী ছেলের দিকে তাকিয়ে মুরুগাসু বললো, 'কিন্তু বলদ যে পবিত্র জীব!'

'শোনো ভাই,' পুরোহিত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'তোমার বলদটাকে আমরা নেবোই। সেজন্যে যদি বলপ্রয়োগ করতে হয়, তাও করবো। তুমি চাবি না দিলে আমরা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকবো।'

পুরোহিত চাবির জন্যে হাত বাড়ালেন। কিন্তু মুরুগাসু উঠে গিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো, 'আমি কিছুতেই দেবোনি। তুমরা আমার বলদটার মাংস খাবে, আমি তা কিছুতেই হতি দেবো নি। সরে যাও, বইলছি! নইলে আমি…'

মুরুগাসু ঘুঁষি চালাতেই সবাই মিলে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো, খানিকক্ষণের মধ্যেই তাকে গেঁথে ফেললো মাটির সঙ্গে। মুরুগাসু চিৎকার করলো, ধস্তাধস্তি করলো, তারপর খাটালের দরজা ভাঙার শব্দটা শুনতেই একেবারে শান্ত হয়ে গেলো আচমকা।

সপাটে খোলা দরজা দিয়ে জনতা সাগ্রহে এগিয়ে গেলো, কিন্তু দৃশ্যটার দিকে চোখ পড়তেই নিস্পন্দ হয়ে থমকে দাঁড়ালো সকলে।

খড়ের গাদার মধ্যে আধগোঁজা হয়ে পড়ে রয়েছে বলদটা—সারা শরীর আড়ষ্ট, ফুলে-ফেঁপে ওঠা। এখানে-সেখানে ইঁদুরে খুঁটে খুঁটে খাওয়ার দগদগে লাল দাগ।

জনতা নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইলো। একজন এগিয়ে গিয়ে বলদটার কাচের মতো চোখ দুটোতে হাত ছোঁয়াতেই ক্রুদ্ধ মেঘের মতো এক ঝাঁক মাছি উঠে এলো ভনভনিয়ে—আঁতকে উঠে পেছিয়ে এলো লোকটা।

অনুবাদ/ দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গাছটা

মারিয়া-লুইসা বম্বাল

চিলি, এমন কি সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকার বিদুষী সাহিত্যিকদের অন্যতমা মারিয়া-লুইসা বম্বালের জন্ম ১৯১০ সালে, সরবনে। সরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বি. এ. পাস করেন। বম্বাল মূলত ঔপন্যাসিক। 'লা আলতিমা নিয়েব্লা' এবং 'লা অ্যামোরতাজাদা' তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। কিন্তু ছোটগল্পেও তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় রাখেন। অবচেতন মনের ভাবনা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং আঙ্গিকের অনন্যতায় তাঁর প্রতীক-ধর্মী গল্প 'গাছটা' নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। কিছুকাল যুক্তরাষ্ট্রে কাটানোর পর বর্তমানে বুয়েনস আয়ার্সে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

পিয়ানো বাদক আসন গ্রহণ করে কৃত্রিম ভঙ্গিতে মৃদু কাশলেন, তারপর মনঃসংযোগ করে নিলেন মুহূর্তের জন্যে। গাঢ় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট, সংযত এবং সঠিক খেয়ালিপনা গড়ে তোলার জন্যে বাজনা শুরু হতেই হলঘরের আলোকিত বাতিগুলো আস্তে আস্তে মৃদু ও উষ্ণ আভাময় হয়ে উঠলো।

'মোৎসার্ট বোধ হয়,' ভাবলো ব্রিগিদা। যথারীতি ও অনুষ্ঠানলিপিটা চাইতে ভুলে গেছে। 'মোৎসার্ট বোধ হয়, কিংবা স্কারলাত্তি।' সঙ্গীত সম্পর্কে ওর জ্ঞান কতো কম! অথচ এর কারণ, সঙ্গীতের ব্যাপারে ওর কান তৈরি হয়নি বা আগ্রহ নেই—তা কিন্তু নয়। শিশুকালে ও নিজেই পিয়ানো শিখতে চাইতো। ওর বোনদের মতো এ জন্যে ওকে জোরাজুরি করার কোনো প্রয়োজন হয়নি। অবিশ্যি ওর বোনরা এখন শুদ্ধভাবেই বাজাতে পারে, দেখামাত্র স্বরলিপিও পড়তে পারে—অথচ ও···ও সেই শুরু করার বছরেই শেখা ছেড়ে দিয়েছিলো। সঙ্গীত শিক্ষায় ওর ধারাবাহিকতা বজায় না থাকার কারণটা যেমন সহজ, তেমনি লজ্জাজনক। স্বরগ্রামে মধ্যমের স্বরটা ও কিছুতেই শিখে উঠতে পারেনি—কোনোদিনই না। 'আমি বুঝতে পারি না···আমার শুধু পঞ্চম স্বরটা মনে পড়ে।' বাবা কি রাগই না করতেন! 'একা একগাদা মেয়েকে মানুষ করে তোলা—আর কেউ করুক না! বেচারি কারমেন! ব্রিগিদার কথা ভেবে ও নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পেতো। আসলে মেয়েটার বুদ্ধিশুদ্ধিই কম।'

ছ মেয়ের মধ্যে ব্রিগিদা সবচাইতে ছোটো। প্রতিটি মেয়েই আলাদা চরিত্রের। প্রথম পাঁচ মেয়েকে নিয়ে বাবা এতোই ক্লান্ত এবং বিমূঢ় হয়ে উঠেছিলেন যে ষষ্ঠ কন্যাটির সময় তিনি ওকে মানসিক প্রতিবন্ধী বলে ঘোষণা করে বিষয়টাকে সহজ

করে দেওয়াই শ্রেয় বলে মনে করলেন। 'আমি আর ওর জন্যে কোনো খাটাখুটি করছি না, করার কোনো অর্থই হয় না। ও যেমন আছে, থাক। ও যদি রান্নাঘরে বসে ভূতের গপ্পো শুনে সময় কাটাতে চায়, কাটাক। ষোলো বছর বয়সেও ও যদি পুতুল ভালোবাসে, তাহলে ও পুতুল নিয়েই খেলুক।'···ব্রিগিদা ওর পুতুলগুলোকে রেখে দিলো এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়েই রইলো।

অজ্ঞ হয়ে থাকা কি মজার! জানতে হয় না মোৎসার্ট কে ছিলেন···অবহেলা করা যায় তাঁর উৎস, তাঁর প্রভাব, তাঁর কলাকৌশলের খুঁটিনাটি। শুধু একজনকে হাতের নির্দেশে পরিচালনা করলেই হলো—যেমন করছেন এখন।

মোৎসার্ট সত্যি সত্যিই ব্রিগিদাকে পরিচালনা করছেন, ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। ওকে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন একটা ঝুলন্ত সেতুর ওপর দিয়ে। সেতুর নিচে গোলাপি বালুর বুক দিয়ে বয়ে চলেছে টলটলে এক নদী। ব্রিগিদার পরনে সাদা পোশাক, কাঁধে মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম আর জটিল বুনোটের ছোট্ট একটা লেসের ছাতা।

'দেখে মনে হচ্ছে প্রতিদিনই যেন তোমার বয়েসটা কমে যাচ্ছে, ব্রিগিদা। গতকাল তোমার স্বামী, মানে তোমার ভূতপূর্ব স্বামীটির সঙ্গে দেখা হলো। ভদ্রলোকের চুলগুলো পুরো সাদা হয়ে গেছে।'

কিন্তু ব্রিগিদা কোনো জবাব দেয় না, থামে না। মোৎসার্টের নির্দেশিত সেতুর পথ পেরিয়ে ও এগিয়ে যেতে থাকে ওর যৌবনের বাগানে, যখন ওর বয়স আঠারো বছর। বাগানের উঁচু উঁচু ফোয়ারাগুলোতে জলধারার গান। ব্রিগিদার মাথায় বাদামী চুলের বিনুনী। বিনুনীর বাঁধন খুলে দিলে গোড়ালি অব্দি নেমে আসে ওর চুল। সোনার বরণ গায়ের রঙ। কালো চোখ দুটি সম্পূর্ণ খোলা, যেন কি জানতে চায়। ছোট্ট একটু হাঁ-মুখ, পুরুষ্টু ঠোঁট, মিষ্টি হাসি আর পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে মধুরিমায় ভরা তন্বী শরীর। ফোয়ারাটার পাশে বসে কি এতো ভাবছিলো ব্রিগিদা? কিছু না। সবাই বলতো, 'মেয়েটা যেমন বোকা তেমনি সুন্দরী।' কিন্তু ও যে বোকা বা ও যে নাচে অপটু আনাড়ি, তাতে ওর কোনোদিনই কিছু এসে-যায়নি। একে একে ওর দিদিরা বিয়ের প্রস্তাব পেলো। কিন্তু ওকে কেউ তেমন প্রস্তাব জানালো না।

মোৎসার্ট! এবারে ব্রিগিদাকে তিনি নীল মর্মরে গড়া একটা সিঁড়ি দেখিয়ে দিলেন। সিঁড়ির দু পাশে সারি সারি তুষারের লিলি ফুল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো ও। সামনে মোটা মোটা লোহার গরাদ লাগানো এক দরজা। গরাদগুলোর সূঁচালো মাথায় সোনালি গিলটি করা। মোৎসার্ট দরজাটা খুলে দিলেন, যাতে ও ওর বাবার

ঘনিষ্ঠ বন্ধু লুইসের গলা ধরে ঝুলে পড়তে পারে। ও যখন খুবই ছোটো, যখন সবাই ওর হাল ছেড়ে দিয়েছে—তখন থেকেই ও লুইসের কাছে ছুটে যেতো। তিনি ওকে কোলে তুলে নিতেন আর ও দু হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরতো, হাসতে হাসতে অনেক মিষ্টি মিষ্টি অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতো আর প্রবল বর্ষণের মতো অজস্র চুমু এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে দিতো তাঁর চোখ, কপাল আর ধূসর হয়ে ওঠা (কোনো-দিনও কি উনি তরুণ ছিলেন ?) চুলগুলোতে।

'তুমি একটা মালা,' লুইস ওকে বলতেন, 'ঠিক যেন একটা পাখির মালা।'

এই জন্যেই ওই মানুষটাকে বিয়ে করেছিলো ব্রিগিদা। বিয়ে করেছিলো তার কারণ—ও বোকা, ও মজাদার আর কুঁড়ে···কিন্তু ওই শান্ত সৌম্য স্বল্পবাক মানুষটির কাছে এলে সেজন্যে ও কোনো অপরাধ অনুভব করতো না। হ্যাঁ, আজ এতোগুলো বছর পেরিয়ে এসে ও বুঝতে পারে, ভালোবাসার জন্যে লুইসকে ও বিয়ে করেনি। অথচ ও ঠিক বুঝতে পারে না, কেন ও একদিন তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলো আচমকা···

কিন্তু ঠিক এই সময় মোৎসার্ট বিচলিতভাবে ওকে একটা হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে উলটো দিকের বাগানটা পার করে দিলেন—ফের ওকে প্রায় ছুটিয়ে নিয়ে গেলেন সেতুটার ওপর দিয়ে। তারপর লেসের সেই ছোট্ট ছাতা আর স্বচ্ছ স্কার্টটা থেকে ওকে বঞ্চিত করে, একটা নরম অথচ পোক্ত দড়ি দিয়ে ওর অতীতের দরজাটা তিনি বন্ধ করে দিলেন—ওকে রেখে গেলেন কালো পোশাক পরা অবস্থায় একটা বিশাল সঙ্গীতশালায়···সেখানে কৃত্রিম আলোগুলো জ্বলে উঠতেই ও সরব প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো যান্ত্রিক তৎপরতায়।

তারপর আবার সেই আধো আধো ছায়া, আবার সেই নৈঃশব্দ্যের পূর্বাভাস।

এবারে এক বাসন্তী চাঁদের রাতে বিথোফেনের সুর দুলে উঠতে শুরু করেছে। কতো দূরে সরে গেছে সমুদ্রটা! সৈকত ধরে দূরে সরে যাওয়া সেই ঝিলমিলে শান্ত সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলে ব্রিগিদা। কিন্তু তারপরেই সমুদ্রটা একটু একটু করে ফুলে-ফেঁপে ওঠে, আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে ওর দিকে, ওকে ঘিরে ধরে, ছোটো ছোটো তরঙ্গে ওকে ঠেলতে ঠেলতে ওর চিবুকটা একটা মানুষের দেহের ওপরে নিয়ে তোলে তারপর সমুদ্র আবার সরে যায়, ওর কথা ভুলে সমুদ্র ওকে রেখে যায় লুইসের বুকে।

'তোমার হৃৎপিণ্ড নেই, জানো তো—তোমার হৃৎপিণ্ড নেই।' লুইসকে বলতো ব্রিগিদা। ওর স্বামীর হৃৎস্পন্দন বুকের এতো গভীরের হতো যে ব্রিগিদা তার শব্দ প্রায় শুনতেই পেতো না। ঘুমোবার আগে শোবার ঘরে উনি যখন নিষ্ঠাভরে সান্ধ্য পত্রিকাগুলো খুলে বসতেন তখন ব্রিগিদা প্রতিবাদ জানিয়ে বলতো, 'আমার কাছে

যখন থাকো, তখন তুমি কক্ষণো আমার সঙ্গে থাকো না। তবে কেন বিয়ে করেছিলে আমাকে ?'

'কারণ তোমার চোখ দুটো ভয় পাওয়া হরিণীর মতো,' লুইস জবাব দিয়ে ওকে চুমু দিতেন। আর ব্রিগিদা গর্বভরে নিজের কাঁধে তাঁর ধূসর মাথাটার ভার গ্রহণ করে আচমকা ভীষণ খুশি হয়ে উঠতো।

'লুইস, ছেলেবেলায় তোমার চুলের রঙ ঠিক কেমন ছিলো তা তুমি কোনোদিনও আমাকে বলোনি। পনেরো বছর বয়সে যখন তোমার চুল পাকতে শুরু করে তখন তোমার মা কি বলেছিলেন, তাও বলোনি। কি বলেছিলেন উনি ? হেসেছিলেন ? না কেঁদেছিলেন ? তোমার কি তখন অহঙ্কার হয়েছিলো, না তুমি লজ্জা পেয়েছিলে ? আর স্কুলে…তোমার বন্ধুরা…তারা কি বলেছিলো ? তুমি আমাকে বলো, লুইস… বলো আমাকে…'

'কাল বলবো, ব্রিগিদা। এখন আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি ভীষণ ক্লান্ত। তুমি বরং আলোটা নিভিয়ে দাও।'

ঘুমোবার জন্যে লুইস নিজের অজান্তে ব্রিগিদার কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন আর ব্রিগিদা সারা রাত নিজের অজান্তে স্বামীর পিঠের কাছে তাঁর নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাবার প্রার্থনা জানিয়েছিলো। স্বামীর নিঃশ্বাসের আশ্রয়েই ও জীবনটা কাটাবার চেষ্টা করেছিলো, যেমন করে একটা তৃষ্ণার্ত বন্দী উদ্ভিদ অনুকূল পরিবেশের সন্ধানে নিজের ডালপালাগুলোকে মেলে দেয়।

সকালবেলা পরিচারিকা যখন পর্দাগুলোকে সরিয়ে দিলো তখন লুইস ওর পাশে ছিলেন না। 'পাখির ম্যালা'টির ভয়ে তিনি সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে, ওকে সুপ্রভাত না জানিয়েই চলে গিয়েছিলেন—কারণ ব্রিগিদা প্রাণপণে তাঁর কাঁধ ধরে পেছনে টেনে রাখে।…'পাঁচ মিনিট, মোটে পাঁচটা মিনিট! আমার সঙ্গে পাঁচটা মিনিট বেশি থাকলে তোমার অফিস উবে যাবে না, লুইস!'

ওর ঘুম ভেঙে ওঠা। হায়, কি দুঃখের সেই জাগরণ! অথচ আশ্চর্য, সাজঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই যেন এক যাদুর খেলায় ওর সমস্ত বিষণ্নতা উধাও হয়ে যায়।

দূরে—বহুদূরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ জেগে উঠছে আর ভেঙে পড়ছে। যেন মর্মর-স্বর জেগে উঠছে পত্রাসির সমুদ্রে। এ কি বিথোফেন ? না। আসলে ওটা সাজ-ঘরের জানলার একেবারে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাছ। সত্তার গভীরে এক আশ্চর্য মধুর আবেশ অনুভব করার জন্যে ব্রিগিদার পক্ষে শুধু ওই ঘরটাতে গিয়ে ঢোকাই যথেষ্ট। সকালবেলা শোবার ঘরে সর্বদাই কি গরম! কি কর্কশ আলো! অথচ এখানে, এই সাজঘরে, চোখ দুটোও একটু বিশ্রাম পায়—একটু সতেজ হয়ে

ওঠে। সুতি কাপড়ের ছাপানো পর্দা, দেয়ালের গায়ে ছোটো ছোটো তরঙ্গের মতো কেঁপে কেঁপে ওঠা গাছটার ছায়া, ঠাণ্ডা জল, আরশিগুলোতে অনন্ত সবুজ-অরণ্যে ফিরে যাওয়া পত্রালির ছায়া। কি সুন্দরই না ছিলো ঘরটা! ঠিক যেন কৃত্রিম পুকুরে ডুবে থাকা একটা আলাদা পৃথিবী। বিশাল সেই ঝুপসি-মাথা গাছটা কি প্রচণ্ড কল-কাকলিতে ভরে উঠতো! আশপাশের সমস্ত পাখি ওই গাছটাতেই আশ্রয় নিতে আসতো। সঙ্কীর্ণ সেই ঢালু রাস্তাটা, যেটা শহরের একটা প্রান্ত থেকে সোজা নদীর কোলে নেমে গেছে—সেই রাস্তায় ওটাই ছিলো একমাত্র গাছ।

'আমি ব্যস্ত আছি, সোনা—তোমাকে সঙ্গ দিতে পারছি না। আমার অনেক কাজ। না, দুপুরে খেতে যাবারও সময় হবে না।...হ্যালো—হ্যাঁ, আমি ক্লাবে আছি। একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা। তুমি বরং রাতের খাবারটা খেয়ে শুয়ে পড়ো। না, জানি না। তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না, ব্রিগিদা।'

'আমার যদি কয়েকটা বান্ধবীও থাকতো!' ব্রিগিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সকলের কাছেই ও একঘেয়ে, বিরক্তিকর। ও যদি চেষ্টা-চরিত্র করে একটু কম নির্বোধ হতে পারতো! কিন্তু এক লাফে কি করে অতোটা পথ পেরিয়ে যাওয়া যায়? বুদ্ধিমতী হতে গেলে ছেলেবেলা থেকেই চেষ্টাটা শুরু করা উচিত। তাই নয় কি?

ওর দিদিরা অবিশ্যি সর্বত্রই যায়, স্বামীরাই নিয়ে যায় ওদের। কিন্তু লুইস—নিজের কাছে স্বীকার করতে আপত্তি কিসের?—লুইস ওর জন্যে লজ্জিত। লজ্জিত ওর অজ্ঞতা, ওর ভীরুতা, এমন কি ওর আঠারো বছর বয়েসটার জন্যেও। তিনি ওকে বলেছেন, ও যেন নিজের বয়েসটা একুশ বছর বলে। যেন পূর্ণ যৌবন ওর একটা গোপন ত্রুটি।

রাত্রিবেলা শুতে যাবার সময় লুইস সর্বদা কি ক্লান্তই না থাকতেন। ব্রিগিদার সব কথা উনি কোনোদিনই শুনতেন না। ব্রিগিদার দিকে তাকিয়ে উনি হাসতেন—যে হাসিটা, ব্রিগিদা জানতো, সম্পূর্ণ যান্ত্রিক। ব্রিগিদাকে উনি আদরে সোহাগে ভরিয়ে তুলতেন, কিন্তু তার মধ্যে উনি নিজে উপস্থিত থাকতেন না। তাহলে কেন উনি বিয়ে করেছিলেন ব্রিগিদাকে? একটা অভ্যেস বজায় রাখতে, কিংবা হয়তো ব্রিগিদার বাবার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা জোরদার করতে। হয়তো পুরুষমানুষের পক্ষে জীবন কতকগুলো অভ্যাসের এক সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খল। হয়তো সেই শৃঙ্খল থেকে একটি মাত্র অভ্যাসের গ্রন্থিকে ছিঁড়ে ফেললেই তাদের জীবনে নেমে আসে বিভ্রান্তি আর বিফলতা। তখন তারা শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে, পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে, দিনের পর দিন তাদের বেশভূষা ক্রমশ হতশ্রী হতে থাকে, দাড়ি বড়ো হয়।

তাই লুইসের জীবনের উদ্দেশ্য, দিনের প্রতিটি মুহূর্তকে কোনো না কোনো কাজ দিয়ে ভরিয়ে তোলা। ব্রিগিদা কেন তা আগে বোঝেনি! বাবা ওকে মানসিক প্রতিবন্ধী বলে ঠিকই করেছিলেন।

'আমার তুষারপাত দেখতে ইচ্ছে করে, লুইস।'

'এবারের গ্রীষ্মে আমি তোমাকে ইউরোপে নিয়ে যাবো। তখন সেখানে শীতকাল, তাই সেখানে তুমি তুষারপাত দেখতে পাবে।'

'আমি জানি, এখানে যখন গ্রীষ্ম ইউরোপে তখন শীত। অতোটা মূর্খ আমি নই।'

মাঝে মাঝে স্বামীর মনে প্রকৃত প্রেমের আবেগ জাগিয়ে তুলতে ব্রিগিদা তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে তুলতো, কাঁদতো, বারবার ডাকতো —লুইস লুইস লুইস…

'কেন? কি হলো তোমার? কি চাও তুমি?'

'কিছু না।'

'তাহলে অমন করে ডাকছো কেন?'

'এমনি, কোনো কারণ নেই। শুধু ডাকার জন্যেই ডেকেছি। তোমাকে ডাকতে আমার ভালো লাগে।'

লুইস তখন হাসতেন, প্রসন্ন মনে মেনে নিতেন ওর এই নতুন খেলা।

গ্রীষ্ম এলো। বিয়ের পরে ওর জীবনের প্রথম গ্রীষ্ম। নতুন কাজের চাপে লুইস ওকে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মতো বেড়াতে নিয়ে যেতে পারলেন না।

'ব্রিগিদা, এবারের গ্রীষ্মে বুয়েনস আয়ার্সে গরম একেবারে মারাত্মক হয়ে উঠবে। তুমি বরঞ্চ তোমার বাবার সঙ্গে খামারবাড়িতে চলে যাও না কেন?'

'একা?'

'আমি প্রত্যেক সপ্তাহশেষের দিনগুলোতে গিয়ে তোমাকে দেখে আসবো।'

ব্রিগিদা তখন বিছানায় বসে পড়েছে। স্বামীকে অপমান করবে বলে ও তখন প্রস্তুত। কিন্তু বৃথাই ও ঝাঁজ ছড়াবার মতো উপযুক্ত শব্দ খুঁজে মরলো। ও কিছুই জানে না, কিচ্ছু না। কি করে অপমান করতে হয়, তা পর্যন্ত ওর জানা নেই।

'কি হলো তোমার? কি অতো ভাবছো, ব্রিগিদা?'

এই প্রথম লুইস ফিরে এসে ওর কাছে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছেন। পেরিয়ে যাচ্ছে তাঁর অফিসে যাবার সময়।

'আমার ঘুম পেয়েছে…' বালিশে মুখ লুকিয়ে ছেলেমানুষের মতো জবাব দিলো ব্রিগিদা।

এই প্রথম দুপুরে খাওয়ার সময় লুইস ক্লাব থেকে ওকে ফোন করলেন। কিন্তু ও টেলিফোনের কাছেই গেলো না। কোনো কিছু চিন্তা না করেই যে অস্ত্রটা ও খুঁজে পেয়েছিলো, সেটাই ব্যবহার করলো হিংস্রভাবে।

সেদিন সন্ধ্যায় ও স্বামীর উলটো দিকে বসে খেলো, কিন্তু চোখ তুলে তাকালো না। ওর সমস্ত স্নায়ুগুলো তখন টানটান হয়ে রয়েছে।

'তুমি কি এখনও রেগে আছো, ব্রিগিদা?'

তবু ও নীরবতা ভাঙলো না।

'মালা আমার, তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু আমি ভীষণ ব্যস্ত মানুষ, তাই সব সময় আমি তোমার কাছে কাছে থাকতে পারি না। আমার বয়সে মানুষ হাজারটা কর্তব্যের দাস হয়ে ওঠে।'

'... ... ...'

'আজ রাতে বেড়াতে যাবে?'

'... ...'

'যেতে চাও না? আচ্ছা বলো, রবার্তো কি মন্তেভিদিয়ো থেকে ফোন করেছিলো?'

'... ...'

'তোমার পোশাকটা কি সুন্দর! নতুন না কি?'

'... ...'

'নতুন না কি, ব্রিগিদা? কথা বলো, জবাব দাও আমাকে...'

কিন্তু এবারেও ও নীরবতা ভাঙলো না। এবং ঠিক তখুনি একটা অপ্রত্যাশিত, আশ্চর্যজনক, অসম্ভব ঘটনা ঘটে গেলো। লুইস কুর্সি ছেড়ে উঠে, প্রচণ্ড উগ্রতায় তোয়ালেটা টেবিলের ওপরে আছড়ে ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় সশব্দে টেনে দিলেন পেছনের দরজাটা।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে উঠে দাঁড়ালো ব্রিগিদাও; এমন ধারা অন্যায় অবিচারে ও রাগে আর ঘৃণায় কাঁপতে লাগলো থরথরিয়ে। বিড়বিড় করে বললো, 'আর আমি, আর আমি...প্রায় একটা বছর আমি...আর প্রথম যখন একটু রাগ দেখালাম... নাঃ, আমি চলে যাবো।...আজ রাতেই আমি চলে যাবো। আর কোনোদিনও আমি এ বাড়িতে পা রাখবো না...' প্রচণ্ড রাগে সাজঘরের আলমারিগুলো খুলে পাগলের মতো ও পোশাক-আশাকগুলোকে মেঝেতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেললো।

ঠিক তখনি কে যেন আঙুলের গাঁট দিয়ে আঘাত করলো জানলার শার্শিতে।

কিভাবে বা কোন্ অনভ্যস্ত সাহসে ব্রিগিদা তখন জানলাটার কাছে ছুটে গিয়ে-

ছিলো, তা ও নিজেই জানে না। জানলা খুলে ও দেখলো, বাইরে একটা বিশাল গাছ। প্রচণ্ড বাতাসের দমক গাছটাকে তীব্র ঝাঁকুনি দিচ্ছে আর তার ডালপালাগুলো জানলার শার্শিতে আঘাত করছে বারবার…যেন বাইরে থেকে ব্রিগিদাকে ডেকে দেখাতে চাইছে, গ্রীষ্মসন্ধ্যার আগুনে-আকাশের নিচে কিভাবে সে একটা সক্রিয় কালো শিখার মতো মুচড়ে মুচড়ে উঠছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি এসে আছড়ে পড়বে গাছটার ঠাণ্ডা পাতাগুলোতে। আহা, কি সুন্দর! সারা রাত ধরে ও বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ—কল্পনার হাজারো নালী দিয়ে বয়ে চলা জলস্রোতের মতো পাতার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়া বৃষ্টির রিনরিন শব্দ—শুনতে পাবে। সারা রাত ধরে ও শুনতে পাবে গাছের প্রাচীন গুঁড়িটা গুমরে গুমরে ওকে ঝড়ের কথা শোনাচ্ছে। আর ও তখন গুটিসুটি হয়ে শুয়ে থাকবে লুইসের খুব কাছাকাছি, স্বেচ্ছায় কেঁপে কেঁপে উঠবে বিশাল শয্যায় চাদরের নিচে ওর উষ্ণ শরীরটা।

মুঠো মুঠো মুক্তো পরম প্রাচুর্যে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে রুপোলি ছাদে। চপিন। ফ্রেদোরিক চপিনের সৃষ্টি 'এতুদ'।

জিদ ধরে মৌনী হয়ে থাকা স্বামীটি বিছানা থেকে উঠে গেছে, তা অনুমানে অনুভব করে কতো দিন, কতো সপ্তাহের পর সপ্তাহ, সাতসকালে জেগে উঠেছে ব্রিগিদা?

সাজঘর: সপাটে খোলা জানলা, বাতাসে ভেসে আসা নদী আর খোলা মাঠের সুগন্ধ, কুয়াশার ছটায় অবগুণ্ঠিত আরশি।

কোনো এক লুকিয়ে থাকা জলপ্রপাতের শব্দ নিয়ে গাছটার পাতা দিয়ে বয়ে চলা বৃষ্টির ধারা যেন পর্দায় আঁকা গোলাপগুলোকেও ভিজিয়ে তোলে। চপিন আর ওই বৃষ্টির শব্দ ব্রিগিদার উত্তেজিত আকুল চেতনায় যেন এক হয়ে মিলেমিশে যায়।

গ্রীষ্মকালে এতো বৃষ্টি হলে কি করে মানুষ? বিষাদ কিংবা রোগমুক্তির পরে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ভান করে সারাটা দিন ঘরে বসে থাকে?

একদিন বিকেলে লুইস ভীরু পায়ে ঘরে এসে ঢুকেছিলেন। তারপর কিছুক্ষণের সংক্ষিপ্ত এক নৈঃশব্দ্য।

'ব্রিগিদা, তাহলে কথাটা সত্যি? তাহলে সত্যিই তুমি আর আমাকে ভালোবাসো না?'

আচমকা বোকার মতো খুশি হয়ে উঠেছিলো ব্রিগিদা। হয়তো ও চিৎকার করে বলেই বসতো, 'না, না…আমি তোমাকে ভালোবাসি, লুইস। আমি তোমাকে ভালোবাসি।'…হয়তো ও বলেই ফেলতো কথাগুলো, যদি লুইস ওকে তা বলার

সময়টুকু দিতেন—যদি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বভাবগত শান্ত স্বরে তিনি না বলতেন, 'সে যা-ই হোক, আমি মনে করি না আমাদের পক্ষে আলাদা হওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে। বিষয়টা নিয়ে অনেক কিছু চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন আছে।'

যেমন আচমকা এসেছিলো, তেমনি আচমকাই থিতিয়ে গেলো আবেগটা। অযথা উত্তেজিত হয়ে কি লাভ! স্নেহ আর পরিমিতিবোধ নিয়ে ওকে ভালোবেসেছিলেন লুইস। তেমন সময় এলে, উনি ন্যায্যভাবে বিচক্ষণের মতোই ওকে ঘৃণা করবেন। এবং সেটাই জীবন। জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে হিমেল শার্শিতে কপালের ভর রেখে দাঁড়ালো ব্রিগিদা। কোমল আর অবিরাম বৃষ্টিধারার আঘাত শান্ত হয়ে সয়ে যাচ্ছে ঝুপসিমাথা গাছটার পাতাগুলো। ঘরটা তখনও ছায়াঘেরা, সুশৃঙ্খল আর নিস্তব্ধ। সমস্ত কিছুই যেন থেমে গেছে, শাশ্বত আর মহান হয়ে উঠেছে। এই তো জীবন! এবং জীবন যে রকম—এই মাঝামাঝিয়ানা—একে একটা চূড়ান্ত, প্রতিকারবিহীন জিনিস হিসেবে মেনে নেবার মধ্যেও এক ধরনের মহত্ত্ব আছে। আর এর সমস্ত কিছুর গভীর অন্তস্তল থেকে যেন একটা সুগম্ভীর সুর জেগে উঠছে, বেরিয়ে আসছে মন্থর বিলম্বিত কয়েকটি শব্দ। ব্রিগিদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা শুনলো: চিরকাল…কোনোদিনও না।…

এইভাবে কেটে যায় ঘণ্টা, দিন, আর বছরের পর বছর। চিরকাল! কোনোদিনও না! জীবন…জীবন!

নিজেকে ফিরে পেয়ে ব্রিগিদা বুঝতে পারে, ওর স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। চিরকাল! কোনাদিনও না!…

আর নির্জন অবিরল বৃষ্টিধারা অস্ফুটে স্বর তোলে চপিনের সুরে সুরে।

জ্বলন্ত তপ্ত পঞ্জিকা থেকে গ্রীষ্ম তার পত্রালি খসিয়ে ফেলে। সোনালি তলোয়ারের মতো ঝরে পড়ে চোখ-ধাঁধানো দীপ্তিমান পাতাগুলো—নয়নজুলির নিঃশ্বাসের মতো অস্বাস্থ্যকর আর্দ্রতার পাতা, সংক্ষিপ্ত অথচ দুরন্ত ঝঞ্ঝার পাতা আর উষ্ণ বাতাসের পাতা—যে বাতাস কার্নেশন ফুল নিয়ে এসে ছড়িয়ে রাখে ওই ঝুপসিমাথা গাছটাতে।

পাশপথের পাথরগুলোকে ঠেলে তোলা বড়ো বড়ো পাকানো শিকড়গুলোর ফাঁকে ফাঁকে বাচ্চারা লুকোচুরি খেলে আর গাছটা হাসি আর ফিসফিসানিতে ভরে ওঠে। ব্রিগিদা তখন জানলার কাছে এসে হাততালি দেয়। তাতে ভয় পেয়ে দূরে সরে যায় বাচ্চাগুলো। তাদের খেলায় অংশ নিতে চাওয়া মেয়েটির হাসিমাথা মুখ তারা লক্ষ্যও করে না কোনোদিন।

সরাসরি নদীর দিকে চলে যাওয়া ওই রাস্তাটাতে সর্বদাই বাতাস বয়ে যায়।

জানলায় কনুইয়ের ভর রেখে ব্রিগিদা একা একা বহুক্ষণ ধরে ওই বাতাসে কেঁপে কেঁপে ওঠা গাছের পাতাগুলোকে লক্ষ্য করে। এ যেন জলের যাওয়া-আসা কিংবা চুল্লির জলন্ত আগুনের দিকে দৃষ্টি ডুবিয়ে রাখা। সমস্ত চিন্তা-ভাবনা থেকে বিবর্জিত হয়ে, অপার আনন্দে আবিষ্ট হয়ে এভাবে দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যায় নিজের অলস প্রহরগুলোকে।

ঘরটা সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়ায় ভরে উঠতে না উঠতেই ব্রিগিদা প্রথম বাতিটা জ্বেলে দেয়। আর রাত্রিকে এগিয়ে আনার আগ্রহ বাসনায় সেই প্রথম বাতিটা তখনই প্রতি-বিম্বিত হয়ে ওঠে আরশিতে আরশিতে।

রাতের পর রাত ব্রিগিদা ওর স্বামীর পাশে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ওর কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে কষ্টটা যখন ছুরিকাঘাতের মতো তীব্র হয়ে ওঠে, যখন আঘাত বা সোহাগ করার জন্যে লুইসকে জাগিয়ে তোলার একটা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত বাসনা ওকে সম্পূর্ণ দখল করে ফেলে—তখন ও পা টিপে টিপে সাজঘরে গিয়ে জানলাটা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক শব্দলহরী আর নিরাবয়ব উপস্থিতি, রহস্যময় পদশব্দ, ডানার ঝটপটানি, গাছের মর্মর আর গ্রীষ্মরাতে তারার আঁধারে ডুবে থাকা গাছের কোটর থেকে একটা নিঃসঙ্গ ঝিঁঝি পোকার অস্ফুট গুঞ্জন ঘরটাকে ভরিয়ে তোলে। কিন্তু ঘরের মেঝের স্পর্শে ওর অবারিত নগ্ন পা দুটো ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে উঠতেই ঘোরটা কেটে যায়। ও বুঝতে পারে না, সাজঘরে নিজের দুঃখকষ্টকে ও কেন এতো সহজ করে মেনে নিতে পারে।

চপিনের বিষণ্ণতা যেন প্রশান্ত ব্যাকুলতায় একের পর এক 'এতুদ' দিয়ে গাঁথা, একের পর এক বিষাদের সঙ্গে যুক্ত।

তারপর শরৎ আসে। মুহূর্তের অবকাশে ঘূর্ণি তুলে সঙ্কীর্ণ বাগানের ঘাসে ঘাসে আর ঢালু রাস্তাটার পাশপথে ছড়িয়ে পড়ে শুকনো পাতার দল। ঝুপসিমাথা গাছ-টার চূড়া সবুজই থাকে, কিন্তু তলার দিকটা লাল হয়ে ওঠে—গাঢ় হয়ে ওঠে কোনো বহু-ব্যবহৃত মহার্ঘ সান্ধ্য পোশাকের জীর্ণ কাপড়ের মতো। আর মনে হয়, যেন একটা নিষ্প্রভ সোনার পানপাত্রে ডুবে আছে ঘরটা।

ডিভানে শরীর বিছিয়ে ব্রিগিদা অসীম ধৈর্যে ওর পরম লগ্নের প্রতীক্ষায় থাকে—অপেক্ষা করে লুইসের অনিশ্চিত আসার আশায়। এখন ও আবার লুইসের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে, আবার তার স্ত্রী হয়েছে—কিন্তু এখন এতে ওর রাগ নেই, উৎসাহও নেই। এখন লুইসকে ও আর ভালোবাসে না। কিন্তু এখন ও আর কষ্টও পায় না। তার বদলে এক অপ্রত্যাশিত পরিপূর্ণতা আর প্রশান্তির অনুভূতি ওকে সম্পূর্ণ অধিকার করে রেখেছে। এখন কেউ বা কোনো কিছুই ওকে আঘাত

দিতে পারবে না। সুখ সুনিশ্চিতভাবেই হারিয়ে গেছে—হয়তো এই বিশ্বাসের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে প্রকৃত সুখের ঠিকানা। তখন আমরা আশা আর আশঙ্কাহীন হয়ে জীবনের পথে চলতে শুরু করি, ছোটো ছোটো আনন্দ থেকে তৃপ্তি উপভোগ করি—যেগুলো সব চাইতে বেশি দিন ধরে টিঁকে থাকে।

আচমকা একটা ভয়ঙ্কর শব্দ, তারপর একটা তীব্র আলোর ঝলকানি ব্রিগিদাকে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে ওর।

এটা কি তবে সাময়িক বিরতি? না। ব্রিগিদা জানে, এটা সেই রূপসিমাখা গাছটা।

কুঠারের এক আঘাতে গাছটাকে ওরা শুইয়ে দিয়েছে। আজ খুব ভোর থেকে যে কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে, ব্রিগিদা তা শুনতে পায়নি। 'গাছটার শিকড় পাশপথের পাথরগুলোকে উপড়ে ফেলছে, কাজেই আঞ্চলিক নাগরিক সমিতি…'

বিহ্বলতায় নিজের হাত দুটোকে চোখের কাছে তুলে আনে ব্রিগিদা। তারপর দৃষ্টি সামনে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, চোখ মেলে চারদিকে তাকায়। কি দেখছে ও? আচমকা আলোকিত হয়ে ওঠা হলঘর, নাকি চলে যেতে থাকা মানুষজন? না। এখনও ও নিজের অতীতের জালে বন্দী হয়ে আছে, এখন ও এই সাজঘর থেকে চলে যেতে পারে না। এক ভয়ঙ্কর ঝলমলে আলোর রোশনাই ওর সাজঘরে এসে হানা দিয়েছে। মনে হচ্ছে ওরা যেন ছাদটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে। চতুর্দিকে কর্কশ আলোর বন্যা…ওরা ঢুকে পড়েছে ঘরের সমস্ত ফাঁক-ফোকর দিয়ে, ঠাণ্ডায় দগ্ধ করে ফেলেছে ব্রিগিদাকে। ওই হিমেল আলোর প্রভায় সব কিছু দেখতে পাচ্ছে ও। দেখছে লুইসকে—তাঁর কুঞ্চিত মুখ, বিবর্ণ কর্কশ শিরালাঞ্ছিত হাত—আর দেখছে ঘরের চড়া রঙের পর্দাগুলোকে। ভয় পেয়ে জানলার কাছে ছুটে গেলো ও। জানলাটা খুললেই এখন সরাসরি ওই সঙ্কীর্ণ গলিটা দেখা যায়। গলিটা এতোই সঙ্কীর্ণ যে ওর ঘরটা যেন উলটো দিকের উঁচু প্রাসাদটার সামনের অংশে প্রায় ঠেকে যায়। প্রাসাদটার এক তলায় জানলার পর জানলা—জানলার কাচের আলমারিগুলো বোতলে বোঝাই। রাস্তার মোড়ে লাল রঙ করা একটা পেট্রল স্টেশনের সামনে একসার মোটর গাড়ি। কয়েকটা ছেলে একটা বল নিয়ে পেটাপেটি করছে রাস্তার মাঝখানে।

যতো রাজ্যের কুশ্রীতা এখন ওর আরশিগুলোতে ছায়া ফেলেছে। ফুটে উঠেছে নিকেলের পট্টি লাগানো ঝুল-বারান্দা, পোশাক-আশাক শুকোতে দেবার বিশ্রী দড়িদড়া আর ক্যানারি পাখির খাঁচাগুলো।

ওরা ব্রিগিদার ব্যক্তিগত গোপনতাটুকু কেড়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে ওর

গোপন রহস্যটুকু। প্রকাশ্য রাস্তায় নিজেকে এখন নগ্ন বলে মনে হচ্ছে ওর···নগ্ন ওর বৃদ্ধ স্বামীর কাছে, যে ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যে ওকে সন্তান দেয়নি। ও বুঝতে পারে না কেন ও আজ অব্দি সন্তান পেতে চায়নি, কেন সারাটা জীবন নিঃসন্তান হয়ে কাটাবার পরিকল্পনার কাছে ও আত্মসমর্পণ করেছিলো। ও বুঝতে পারে না কি করে ও একটা বছর লুইসের হাসি—অহেতুক অতিরিক্ত খুশিয়াল হাসি, কপট হাসি—সহ্য করে এসেছে। আসলে লোকটা সচেষ্ট প্রয়াসে হাসতে শিখেছে, কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাসা প্রয়োজন।

মিথ্যে! ব্রিগিদার আত্মসমর্পণ আর প্রশান্তি—সবই মিথ্যে। আসলে ও ভালোবাসা চেয়েছিলো। হ্যাঁ, ভালোবাসা। শুধু ভালোবাসা। আনন্দ, উন্মাদনা, ভালোবাসা আর ভালোবাসা আর ভালোবাসা···

'কিন্তু ব্রিগিদা, কেন তুমি চলে যাচ্ছো?' লুইস জিগেস করলেন, 'কেন ছিলে এতোদিন?'

কি করে ওঁর প্রশ্নের জবাব দিতে হবে এবারে ব্রিগিদা তা জেনে গেছে।

'ওই গাছটা লুইস, ওই গাছটা! ওরা ওই ঝুপসিমাথা গাছটাকে কেটে ফেলেছে।'

অনুবাদ / দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আকদিয়াত কার্তা মিয়ার্জা

ইন্দোনেশিয়ার বিশিষ্ট সাহিত্যিক আকদিয়াত কার্তা মিয়ার্জার জন্ম ১৯১১ সালে, পশ্চিম জাভায়। সোলোতে পড়াশোনা করেন। দর্শনশাস্ত্র এবং সাংবাদিকতার ওপরেই প্রবণতা ছিলো সব চাইতে বেশি। কয়েক বছর ক্যানবারায় অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেন। স্বদেশে শিক্ষা মন্ত্রক, পেন ক্লাব প্রভৃতির নানান সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। 'নাস্তিক' ১৯৪৯ তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। 'কেরেতাকান দান এতেগানগান' ১৯৫০ এবং 'কেসান দান কেনানাগান' ১৯৬১ তাঁর জনপ্রিয় গল্পসংকলন।

ঘটনাটা ঘটেছিলো অ্যামস্টারডামে, শরতের এক ঝোড়ো সন্ধ্যায়। পথ হারিয়ে আমাকে জিগেস করতে হয়েছিলো, কি করে ভ্যালেরিয়াস স্ট্রীটে যাবো। কিন্তু যাকে জিগেস করলাম তাঁর মুখে ইন্দোনেশিয় ভাষায় জবাব পেয়ে আমি রীতিমতো চমকে উঠেছিলাম। আমার জার্মান ভাষায় সম্ভাষণের জবাবে তিনি 'মারডেকা' বলে আমাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, 'এদিক দিয়ে আসুন, সাউদারা।'

আমি যে রাস্তাটা খুঁজছিলাম, ভদ্রলোক অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে নিজে সঙ্গে করে আমাকে সেখানে পৌঁছে দিলেন। দেখা গেলো, যেখানে আমাদের দেখা হয়েছিলো সেখান থেকে মাত্র দুটো মোড় ঘুরেই ভ্যালেরিয়াস স্ট্রীট।

একজন ওলন্দাজের তুলনায় ভদ্রলোকের চেহারাটা একটু ছোটোখাটোই বলতে হবে। বাতাসের দমক থেকে সামলে রাখার জন্যে থেকে থেকেই তাঁর হাত দুটো মাথার টুপিটার দিকে উঠে যাচ্ছিলো। টুপির মতো ভদ্রলোকের ওভারকোটটাও বহু ব্যবহারে জীর্ণ ও মলিন। মুখটা স্পষ্ট দেখতে না পেলেও ভদ্রলোকের কথা বলার শান্ত ভঙ্গিমা আর কোমল কণ্ঠস্বরে মনে হলো, মানুষটা ভালোই। হাঁটতে হাঁটতে উনি জানালেন, বিপ্লবের সময় উনি ইন্দোনেশিয়ায় ছিলেন। আমাকে উনি নিজের বাড়িতেও আমন্ত্রণ জানালেন এবং তখুনি আমরা দিনক্ষণ স্থির করে নিলাম।

তিন দিন বাদে নির্ধারিত অপরাহ্নে আমি গিয়ে ভদ্রলোকের দরজার ঘন্টিটা বাজালাম। উনি নিজেই দরজা খুলে দিলেন, অন্ধকার একটা সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা সোজা চারতলায় গিয়ে উঠলাম। ওখানেই উনি এমন একখানা ঘরে বাস করেন যা

এক সরল এবং নিঃসঙ্গ জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। সত্যি বলতে কি ঘরটা খুবই সাধারণ —প্রায় দারিদ্র্য লাঞ্ছিতই বলা চলে। খানতিনেক কুর্সি, একটা টেবিল, পোশাক রাখার একটা দেরাজ-আলমারি এবং একটা ডিভান যা শয্যার প্রয়োজনও মেটায়। সবকটা আসবাবই ভীষণ পুরনো। সমস্ত কিছুই এলোমেলো, অগোছালো। এখানে-সেখানে বই। টেবিলে একটা দাবার ছক—শেষ বার খেলার শেষে সেটাকে তখনও গুছিয়ে রাখা হয়নি। জানলার কাছে ইজেলে একটা অসমাপ্ত ছবি, তুলি আর রঙের টিউবগুলো তার নিচেই মেঝেতে ছড়ানো।

'আপনি তাহলে আঁকেন?' আমি জিগেস করলাম।

'ও শুধু সময় কাটাবার মতো একটা নেশা।' কোণের দিক থেকে একটা কুর্সি টেনে নিয়ে, ভদ্রলোক আমাকে সেখানে বসতে বললেন। ঘরের আলোয় তাকিয়ে দেখলাম, প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলা ভদ্রলোকের সম্পর্কে আমার যে সমস্ত ধারণা হয়েছিলো তা সবই সঠিক। আমার নিমন্ত্রকটির মনোভাব সত্যিই প্রীতিময়, কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি যেন একটু অন্য ধাতের মানুষ।

ইজেলের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা ছবির স্তূপটা থেকে ভদ্রলোক আমাকে একটা একটা করে তাঁর আঁকা ছবি দেখাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ছবিগুলোতে নানান ধরনের শৈলী। মনে হলো উনি এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছেন, প্রচণ্ড পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, কিন্তু এখনও নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সঠিক পথটির নিশানা পাননি। ইজেলে তাঁর অসমাপ্ত ছবিটা পাহাড়ের ঢালে একটি ধান ক্ষেতের দৃশ্য।

'এটা প্রিয়াংগানের গ্রামাঞ্চল।' প্রায় মাড়িয়ে দিতে যাওয়া একটা রঙের টিউব হাতে তুলে নিয়ে ভদ্রলোক আমাকে বললেন, পশ্চিম জাভায় ওই পাহাড়ি গ্রামাঞ্চলটার কথা তাঁর প্রায়ই মনে পড়ে।

'ভবিষ্যতে আর কোনোদিনও কি ওখানে যাওয়া হবে? উত্তুঙ্গ নীল গেদে পাহাড়ের ঢালগুলোকে মুড়ে রাখা সেই চা-গাছগুলোর মাঝখান দিয়ে আর কোনোদিনও কি আমি ঘুরে বেড়াতে পারবো? রঙীন কেবায়া আর বাটিকের সারং পরা যে সমস্ত গ্রাম্য মেয়েরা সেখানে চা-পাতা তুলতে তুলতে গান করে, আর কোনোদিনও কি আমি তাদের সেই খুশিয়াল গান আর হাসি শুনবো? আর কখনও কি শ্বাস নিতে পারবো অরণ্যের সেই সতেজ হিমেল বাতাসে?'

স্পষ্টতই বোঝা গেলো, আকুল আকাঙ্ক্ষা আর সুনিবিড় অনুস্মৃতিতে ভারি হয়ে ওঠা ভাবপ্রবণতায় ডুবে আছেন ভদ্রলোক।

'কেন হবে না? হবে না, তা আপনি কিছুতেই বলতে পারেন না।'

সামান্য বিষণ্ণ ভঙ্গিমায় বসেছিলেন ভদ্রলোক, পা দুটো আড়াআড়ি ভাবে রাখা।

বললেন, 'এই সুন্দর গ্রামাঞ্চলটাকে আমি এতো ভালোবাসি, মনে হয় যেন আমার জন্মভূমি। হয়তো অদ্ভুত···কিন্তু এটা আমি বুঝতে পারি।'

'কি রকম?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'ওখানকার পাহাড়গুলো অমন অপূর্ব বলেই আমি জায়গাটাকে অতো ভালোবাসি—ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক ততোখানি সহজ সরল নয়। কারণ হয়তো আপনি নিজেও জানেন, সুইস আল্পসের সৌন্দর্য কি অসাধারণ! কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার কাছে তারা প্রিয়াংগানের গ্রামাঞ্চলের মতো সুন্দর নয়।'

ভদ্রলোক আমার সঙ্গে নেহাতই রসিকতা করছেন ভেবে আমি মৃদু হাসলাম।

'আমার বিশ্বাস,' উনি ফের বলতে লাগলেন, 'আসলে আমার ভালোবাসাটা ওখানকার বাসিন্দা···ওখানকার মানুষ···ওখানকার সহজ সরল বন্ধুত্বপূর্ণ গ্রামীণ মানুষদের জন্যে। এটা এমন একটা অনুভূতি যা সমস্ত কিছুর মধ্যেই সৌন্দর্য এনে দেয়। যেমন, মনে করুন মরুভূমির কথা। ভালোবাসা যার হৃদয়ে ঝড় তুলেছে তার কাছে ওই অনুর্বর আর বিরক্তিকর একঘেয়ে অঞ্চলও সৌন্দর্যের কল্পলোক হয়ে উঠতে পারে। তাই নয় কি?'

আড়াআড়ি ভাবে রাখা পা দুটোকে এবারে পাশাপাশি করে রেখে ভদ্রলোক আমাকে তাঁর কাহিনী বলে যেতে লাগলেন। বললেন, বিপ্লবের সময় তিনি ওলন্দাজ রাজকীয় সেনাবাহিনীর একজন সার্জেন্ট ছিলেন। পরে সাময়িত সময়ের জন্যে তাঁকে কয়েদ করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। এর কারণ, তিনি বললেন—যে লোকগুলোর একমাত্র অপরাধ ছিলো স্বাধীনভাবে জীবন কাটাবার আকাঙ্ক্ষা, তাদের ওপরে তিনি নির্বিচারে গুলি চালাতে অস্বীকার করেছিলেন।

'একটা সিগারেট নিন,' কাহিনী থামিয়ে ভদ্রলোক বললেন। 'আমি নিজে সিগারেট খাই না। আমি শুধু এটাতে আগ্রহী,' পাতলুনের পেছন দিকের পকেট থেকে একটা তামাকের নল বের করে, একটা ছাইদান নিয়ে আসার জন্যে উনি দেরাজ-আলমারিটার দিকে এগিয়ে গেলেন। 'আসলে পরিস্থিতিটা আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না, আমার ভেতরটা বিদ্রোহী হয়ে উঠছিলো। একদিন সন্ধ্যাবেলা বান্দুঙের দাগো স্ট্রীটে দেখলাম, কয়েকজন সৈনিক রাস্তা দিয়ে সাইকেলে চেপে যেতে যেতে থাকা একটা অল্পবয়সী ছেলেকে জোরজার করে থামালো। একেবারে বিনা কারণে ছেলেটাকে তারা পাকড়াও করে নির্দয় ভাবে টানতে টানতে রাস্তার ধারে নিয়ে গিয়ে, তাকে একটা বিজলী বাতির থামের গায়ে টানটান হয়ে দাঁড়াবার হুকুম দিলো। তারপর কোনো রকম সতর্ক না করেই ওদের মধ্যে একজন তলোয়ার দিয়ে ছেলেটিকে এমন এক কোপ মারলো যে তার তলোয়ারটা লোহার

থামটাতে লেগে আগুনের ফুলকি ফুটিয়ে তুললো। ভেবে দেখুন, এর সমস্ত কিছুই ঘটে গেল বিনা কারণে। যদিও আসলে এর কারণটা এই যে, ওই হৃতভাগ্য ছেলেটি এমন এক সম্প্রদায়ের মানুষ যারা পরাধীনতা থেকে মুক্তি চাইছিলো। সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছেলেটির আত্মা চরম মুক্তি পেয়ে গেলো এবং তা নিয়ে কোনো রকম উচ্চবাচ্য হলো না।'

প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে অথচ একেবারে শান্তভাবে ভঁ্যা বুরেঁ (এটাই ভদ্রলোকের নাম) তাঁর কাহিনীটা বললেন। মাঝে মাঝেই উনি তামাকের নল থেকে মেঝেতে থুথু ঝেড়ে ফেলছিলেন। ইতিমধ্যে দরজার ঘণ্টিটা বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে উনি দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং এক মুহূর্ত পরেই একজন নবাগত ভেতরে এসে ঢুকলো। লোকটা ইন্দোনেশিয়, পরনে গাঢ় নীল রঙের পরিপাটি স্যুট, আকৃতিতে বেঁটেখাটো, নাকটা ছোট্ট, কুতকুতে চোখ দুটো যেন অশান্ত অস্থিরতায় অনবরত এধার-ওধার করছে। লোকটার মাথায় অর্ধেক টাক এবং সেটা তার চওড়া কপালে এক অস্বাভাবিক উচ্চতা এনে দিয়েছে। মানুষটার ভাবভঙ্গি কেমন যেন বিচলিত আর অদ্ভুত ধরনের—যেন খানিকটা উদ্ধত চালচলনের মাধ্যমে সে নিজেকে কোনো একটা সন্দেহ থেকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করছে। ভঁ্যা বুরেঁকে সে ফিসফিসিয়ে কিছু বললো, তারপর যেমন এসেছিলো তেমনি ভাবেই আবার চলে গেলো—আমাকে কোনো সম্ভাষণও জানালো না।

'লোকটা আমার অনেক দিনের চেনা।' আমাকে ফের বসতে বলে ভঁ্যা বুরেঁ বললেন, 'মাত্র দুদিন আগে ও ইন্দোনেশিয়া থেকে এসেছে। সত্যি বলতে কি, লোকটাকে আমি খুব একটা পছন্দ করি নে।'

তারপর থেকে ভঁ্যা বুরেঁর বাড়িতে লোকটাকে আমি বেশ কয়েক বারই দেখেছি। প্রতিবারই মনে হয়েছে, লোকটার চালচলন সর্বদা এমন অদ্ভুত আর রহস্যময় কেন। বন্ধুত্ব করার কোনো লক্ষণই সে দেখায়নি।

একদিন বিকেলে ভঁ্যা বুরেঁ আমাকে ফের তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। যেতেই বললেন, 'ধান ক্ষেতের ছবিটা শেষ হয়েছে, আপনাকে দেখাবো। আর ইয়ে …আমার কাছে এক বোতল মিঠে শেরি আছে, সেটাও আপনার খুব পছন্দ হবে।'

ছবিটা সত্যিই বেশ ভালো হয়েছিলো, যদিও স্পষ্টতই সেটা ভ্যান গ্যাগের অনুকরণ।

'এই অঞ্চলটা আপনি চেনেন?' আমাদের গ্লাসে শেরি ঢেলে উনি জিগেস করলেন।

'চিনি বইকি!' বললাম, 'ওটা জিপানাস জেলা, ওর পেছনেই মহান আগ্নেয়-

গিরি গেছে।'

'হ্যাঁ, আমিও জায়গাটাকে ভালোভাবেই চিনি। আসুন, আপনার স্বাস্থ্য কামনায়…' ভদ্রলোক নিজের গ্লাসটা তুলে ধরলেন।

'আপনার স্বাস্থ্য!'

আমরা দুজনে পান করলাম।

'আপনি ওখানকার মানুষগুলোকেও জানেন নিশ্চয়ই?'

'না। আমি শুধু গাড়িতে বা বাসে বান্দুং যাবার পথে ওখান দিয়ে গেছি। কাজেই আমার চাইতে সম্ভবত আপনিই ওদের বেশি ভালোভাবে জানেন।'

'স্বাধীনতার পরে, এখন ওদের জীবন কেমন কাটছে?'

'বেশ ভালোই।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।' এক মুহূর্ত একটু চিন্তা করে উনি ফের জিগেস করলেন, 'আচ্ছা, 'বেশ ভালো' বলতে আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিলাম না। ভদ্রলোক বললেন, 'ওখানকার কিছু কিছু লোককে আমি চিনি—চাষী আর কিছু ক্ষেত-শ্রমিক। কেউ কেউ অবিশ্যি চায়ের পাতাও তোলে। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ক্ষেত-শ্রমিকদের আয় এখন তাদের জীবিকার পক্ষে যথেষ্ট? শুনেছি ওদের মধ্যে অনেকেই নাকি অপুষ্টিতে ভুগছে। এ ধরনের খবর বড়ো অশান্তি দেয়, বুঝেছেন!'

আমি জবাব দেবার কোনো সুযোগ পেলাম না, কারণ ঠিক তখুনি দরজার ঘন্টিটা আমাদের আলোচনায় বাধা দিলো।

'ওঃ, কে এলো আবার!' ভ্যাঁ বুরে যেন খানিকটা বিরক্ত হলেন। উনি দরজা খুললেন, কিন্তু কাউকে ভেতরে আসার আহ্বান জানালেন না—বরং নিজেই দরজার আড়ালে উধাও হয়ে গেলেন। তারপরেই আমি সিঁড়ি ভেঙে তাঁর দ্রুত নিচে নেমে যাবার শব্দ পেলাম। একটু বাদে, সামান্য কিছুক্ষণের স্তব্ধতার পরেই, সিঁড়ির নিচ থেকে দুটো রুক্ষ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

আমি তখন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। ভাবছি, কি হতে পারে ব্যাপারটা।

'লোকটা একেবারে বেলজ্জ বেহায়া!' ভ্যাঁ বুরে ঘরে ঢুকে বললেন, 'একটা নীতিহীন চরিত্রহীন মানুষ। আদর্শ বলতে কোনো পদার্থই ওর মধ্যে নেই।'

পরিষ্কার বোঝা গেলো, উনি সেই পরিপাটি পোশাক-পরা রহস্যময় ইন্দোনেশিয় লোকটার কথা বলছেন।

'শুনুন, এমন একটা লোককে আপনি কি বলবেন! ওর সঙ্গে আমার পরিচয় দক্ষিণ বান্তেন জেলায়—১৯৪৭ সালে ইন্দোনেশিয় সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ওলন্দাজ-

দের তথাকথিত প্রথম পুলিসি আক্রমণের সামান্য কিছুদিন পরে।...ঠিক এক সপ্তাহ—আমি এখনও ভুলিনি—কর্তৃপক্ষ আমাকে ফাটকে ছুঁড়ে দেবার ঠিক এক সপ্তাহ আগে সে আমাকে জানাতে এসেছিলো, দেশবাসীর জন্যে সে একটা বিরাট 'কাজ' করেছে।'

ভ্যাঁ বুরে তাঁর কাহিনীটা শেষ করবার পরে আমি বুঝতে পারলাম, 'কাজ' শব্দটা উনি ব্যঙ্গার্থেই ব্যবহার করেছিলেন।

'একটা পুরো গ্রামকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছিলো। পনেরোজন গেরিলা যোদ্ধা—দীর্ঘ পথ হেঁটে তারা তখন গাড়ি-টানা ঘোড়ার মতোই ক্লান্ত, নিঃশেষিত—ওলন্দাজ সেনাবাহিনী তাদের প্রত্যেককে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলো। নিখুঁতভাবে তাদের ঘিরে ফেলা হয়েছিলো এবং আক্রমণটাও হয়েছিলো সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত-ভাবে। কেউ পালাতে পারেনি। প্রত্যেকেই অর্থহীনভাবে মারা পড়েছিলো। এই হলো ওই লোকটার বিরাট কাজ।'

কথা বলতে বলতে ভ্যাঁ বুরে একবারও স্থির হয়ে বসতে পারছিলেন না। একবার এগিয়ে গিয়ে জানলার তাকে তামাকের নলটা ঠুকছিলেন, একবার শেরির গ্লাস ভরে নিতে দেরাজ-আলমারিটার কাছে ফিরে আসছিলেন, তারপর আবার নিজের কুর্সির কাছে এসে ডান পাটা কুর্সিতে তুলে দাঁড়াচ্ছিলেন।

'জানেন—আর একবার লোকটা বলতে এসেছিলো, তার ওই কাজের পুরস্কার হিসেবে তাকে একটা উঁচু পদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তার সব কথা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি, কিন্তু তার কাহিনীগুলো আমাকে বিরক্ত করে তুলতো।'

ভ্যাঁ বুরে কথাগুলো শেষ করে প্রচণ্ড জোরে তামাকের নলটা টানতে শুরু করলেন এবং পরবর্তী কথাগুলো বলার সময় তাঁর ঠোঁট দুটো পরস্পরকে স্পর্শই করছিলো না প্রায়। আমি জিগেস করলাম, এইমাত্র কি এমন ঘটেছিলো। উনি বললেন, 'গত-কাল লিদসে প্লেইনের কাছাকাছি ছোটো একটা কাফেতে ঘটনাচক্রে লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিলো। যথারীতি সে তার নিজের কীর্তিকাহিনী—বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে তার রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলোর গল্প—শুনিয়ে আমাকে ক্লান্ত করে তুলছিলো। শেষ অব্দি আমি এতো বিরক্ত হয়ে উঠলাম যে লোকটাকে খোলাখুলি বলেই দিলাম, সে আদপেই আমার প্রশংসা পাবার উপযুক্ত নয়। তখনই দেখে মনে হয়েছিলো, লোকটা বেশ অপমানিত হয়েছে। একটু আগে সে একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসেছিলো। সে আমাকে দেখাতে চেয়েছিলো যে যদিও তার সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই নিচু, কিন্তু অন্যেরা তাকে সম্মান আর প্রশংসার যোগ্য পাত্র বলেই মনে করে। সেই উদ্দেশ্যে লোকটা জাকার্তা থেকে সদ্য সদ্য পাওয়া একটা

তারবার্তা আমাকে দেখালো। ওঃ, কি জঘন্য! এমন উল্লাস, এতো গর্ব আর অহঙ্কার নিয়ে সে ওটা আমাকে দেখালো যে শয়তানটা ভেতরে আসার আগেই আমি রীতিমতো রূঢ়ভাবে তাকে বাইরের দরজাটা দেখিয়ে দিলাম।'

'লোকটার অতো গর্ব কিসের?' খানিকটা মজা পেয়ে আমি জানতে চাইলাম।

'তারটা পেয়েছে বলে গর্ব।'

'কিন্তু কেন?'

'আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না···তারটা পাঠিয়েছে একটা রাজনৈতিক দল, লোকটা ওই দলেরই সদস্য। জানানো হয়েছে, আগামী নির্বাচনে ওই লোকটাকে পার্লামেন্টের আসনে একজন প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।'

'তাই নাকি!'

'বিশ্বাস হচ্ছে?'

অবাক বিস্ময়ে আমি মাথা নাড়লাম। খানিকক্ষণ আত্মমগ্ন হয়ে থাকার পর অবশেষে ভ্যাঁ বুরে বললেন, 'এই ধরনের লোক যে সমস্ত মারাত্মক বিপদ-বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে, আশা করি সেসব থেকে আপনাদের দেশকে রক্ষা করা হবে। রক্ষা করা হবে আপনাদের দেশবাসীর সুখের জন্যে···আর···' ফের খানিকক্ষণ ভাবনার গভীরে মগ্ন হয়ে থেকে উনি বললেন, 'বিশেষ করে আমার ছোট্ট ছেলেটার জন্যে।'

'আপনার ছোট্ট ছেলে?' আমি চমকে উঠলাম, 'কি বলছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, আমার ছোট্ট সোনা-মানিক···আমার সন্তান।'

'তার মানে আপনি একজনের বাবা?'

'হ্যাঁ, আমি আমার ছোট্ট জোসেফের বাবা। ওখানে সবাই ওকে ইউসুফ বলে ডাকে। আশা করি সে আজও বেঁচে আছে।'

গ্লাস দুটো ভরে নেবার জন্যে ভ্যাঁ বুরে ফের দেরাজ-আলমারিটার দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি তখনও বিস্ময়ে বিমূঢ়। উনি বলতে লাগলেন, 'ওর মায়ের নাম সিতি—মিষ্টি একটি গ্রামীণ মেয়ে। সিতির প্রেম ছিলো সরল আর শান্ত, ওর নিষ্পাপ মনে ছিলো খুশির সোহাগ···পাহাড়ি অঞ্চলের অশিক্ষিত মেয়েরা প্রায়ই যেমনটি হয়ে থাকে। রুজির জন্যে ও চায়ের পাতা তুলতো। আমি যখন ওলন্দাজ ফাটকে পচছি, তখন দুর্ভাগ্যক্রমে এক ক্ষিপ্ত জনতা ওকে খুন করে ফেলে।'

'খুন?'

'হ্যাঁ, তারা ওকে একটা কুকুরের মতো খুন করেছিলো—ওকে একটা গুপ্তচর··· শত্রুপক্ষের সহযোগী মনে করে ওর চরিত্রে কালি দিয়েছিলো।'

গ্লাসটা শেষ করে ভ্যাঁ বুরেঁ ফের কয়েক মুহূর্তের জন্যে চিন্তায় বিভোর হয়ে গেলেন, হয়তো হারিয়ে গেলেন কিছু মধুর আর বিধুর হয়ে যাওয়া স্মৃতির গভীরে।

'কিন্তু বলুন তো, বাস্তবে ওই গ্রাম্য মেয়েটি রাজনীতি বা বিপ্লবের কি বুঝতো?' একই সঙ্গে আবেগ আর বিষাদে মেশানো কণ্ঠস্বরে ভদ্রলোক বললেন, 'শত্রুর সহযোগী হবার পক্ষে ও ছিলো বড্ড বেশি সরল। ও পার্লামেন্টের প্রার্থী ছিলো না, ছিলো কি? কিন্তু হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম—আমি সর্বদাই ভুলে যাই—ওর একটি সন্তান ছিলো এবং সে আমারই সন্তান⋯শত্রুপক্ষের সন্তান।⋯'

অনুবাদ / দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

খুলে দাও

সাদত হাসান মাণ্টো

আধুনিক উর্দু সাহিত্যের সবচাইতে বিতর্কিত কথাশিল্পী সাদত হাসান মাণ্টো। জন্ম ১৯১২ সালে লুধিয়ানার সোমরালা গ্রামে। অমৃতসর থেকে ম্যাট্রিক পাস করার পর আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হন। জীবিকার জন্যে সাহিত্যপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র প্রভৃতি নানান সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। দেশ ভাগের পর স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে লাহোরে চলে আসেন এবং এখানেই ১৯৫৫ সালে মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে মারা যান। উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, অনুবাদ ছাড়াও তাঁর প্রকাশিত গল্প-গ্রন্থের সংখ্যা কুড়িটিরও বেশি। নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতি গভীর মমতা, এবং সামাজিক বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামই মাণ্টোর গল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অশ্লীলতার অভিযোগে তাঁকে বহুবার অভিযুক্ত হতে হয়েছে, নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাঁর অজস্র গল্প। নিচের অনুবাদটি তাঁর নিষিদ্ধ গল্পেরই অন্যতম।

বিশেষ ট্রেনটা দুপুর দুটোয় অমৃতসর থেকে রওনা হয়ে আট ঘণ্টা পরে মোঘলপুরায় পৌঁছোয়। পথে ক্রমাগত হামলার ফলে কয়েকজন যাত্রী প্রাণ হারায়, বহু যাত্রী আহত হয়। কিছু লোক দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে কোনো রকমে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে।

পরের দিন সকাল দশটা। আশ্রয়-শিবিরের স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটিতে চোখ মেলে সিরাজউদ্দীন। চারদিকে অগণন নারী, পুরুষ আর শিশুদের ভিড়। সেই জনসমুদ্র দেখে চিন্তাশক্তি আরও শিথিল হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ সে ধূসর আকাশের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে। উদ্বাস্তুশিবিরের হৈচৈ সিরাজউদ্দীনের কানে যাচ্ছে না। বিলুপ্ত তার স্মৃতিশক্তি। দেখলে মনে হবে সে বুঝি গভীর চিন্তায় মগ্ন, আসলে তা কিন্তু নয়—চারদিকের এই বিশৃঙ্খল পরিবেশ সম্পর্কে সে সচেতন অথচ যেন কোনো কিছুরই খেই ধরতে পারছে না।

উদাস চোখে সে মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। একসময়ে সূর্যের আলোর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তার দেহের অনুভূতিগুলো আবার সজীব হয়ে ওঠে, ফিরে আসে স্মৃতিশক্তি। একের পর এক তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে দাঙ্গা, লুটতরাজ, আগুন, হৈ-হট্টগোল, স্টেশন, গুলির শব্দ, অন্ধকার রাত আর তার মেয়ে সাকিনার ছবি। চকিতে সিরাজউদ্দীন উঠে দাঁড়ায় এবং ভীড়ের মধ্যে পাগলের

মতো ঘুরতে থাকে।

তিন ঘণ্টার বেশি সাকিনার নাম ধরে ডেকে ডেকে সারা শিবির চষে ফেললো, কিন্তু একমাত্র মেয়ে সাকিনার কোনো হদিস পেলো না। চারদিকেই বিশৃঙ্খলা। কেউ খুঁজেছ তার সন্তানকে, কেউ বা খুঁজছে মা মেয়ে বউকে। ক্লান্ত শ্রান্ত বিধ্বস্ত হয়ে সিরাজউদ্দীন বসে পড়লো, কোথায় সাকিনাকে হারিয়েছে তা স্মরণ করার চেষ্টা করলো। স্ত্রীর মৃত্যুর ক্ষণটি তার মনে পড়লো, ওর পেটের নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে গিয়েছিলো। এর বেশি কিছু তার আর মনে নেই।

সাকিনার মা মারা গেছে। সিরাজউদ্দীনের চোখের সামনেই ও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। কিন্তু সাকিনা কোথায়? সাকিনার মা মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর মিনতি করে বলেছিলো, 'আমার আশা ছেড়ে দাও। বরং সাকিনাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালিয়ে যাও।'

সাকিনা তার সঙ্গেই ছিলো। দুজনে খালি পায়ে প্রাণ হাতে নিয়ে পালাচ্ছিলো। একসময়ে মেয়ের ওড়নাটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিলো। কুড়োবার সময় সাকিনা বলেছিলো, 'দরকার নেই বাজান, থাগ্‌গে।' তবু সিরাজউদ্দীন সেটা কুড়িয়ে পকেটের মধ্যে রেখেছিলো। কথাটা মনে পড়তেই সে ধীরে ধীরে পকেট থেকে ওড়নাটা বার করলো। এটা সাকিনারই ওড়না, কিন্তু ও কোথায়?

বিবশ স্মৃতিশক্তির ওপর প্রচণ্ড চাপ দিয়েও সে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। সাকিনাকে কি স্টেশন পর্যন্ত এনেছিলো? তারা কি ট্রেনে উঠেছিলো? পথে ট্রেন থেমেছে এবং গুণ্ডারা হামলাও চালিয়েছ। তাহলে কি তার অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার সময় গুণ্ডারা সাকিনাকে নিয়ে গেছে? তার মনের মধ্যে অজস্র প্রশ্ন ভিড় করে আসে, কিন্তু একটারও জবাব পায় না।

শুধু সে নয়, চারদিকে এই যে হাজারো মানুষ, সবারই যে জিনিসটা বেশি প্রয়োজন, তা হলো সান্ত্বনা। কিন্তু কে কাকে সান্ত্বনা দেবে? সিরাজউদ্দীন কাঁদার চেষ্টা করেছে। কিন্তু হতভাগ্য চোখ দুটো তাকে আদৌ সাহায্য করেনি। যেন অশ্রুর উৎস ধারাটাই শুকিয়ে গেছে।

দিন ছয়েক পর সিরাজউদ্দীন কিছুটা বোধশক্তি ফিরে পায়। তখন সে এমন কিছু লোকের সঙ্গে দেখা করে, যারা তাকে সাহায্য করতে পারবে। ওরা হলো আট-জন স্বেচ্ছাসেবী যুবক। ওদের কাছে ট্রাক আর বন্দুক আছে। অজস্র আশীর্বাদ জানিয়ে সিরাজ মেয়ের বর্ণনা দেয়, 'দেখতে খুবই সুন্দরী, ফর্সা, মার সঙ্গে চেহারার মিল আছে, ডাগর ডাগর চোখ, বয়েস সতেরোর কাছাকাছি···ডান গালে একটা তিল আছে···আমার একমাত্র মেয়ে। ওকে খুঁজে দিলে আল্লা তোমাদের মঙ্গল

করবেন।'

তরুণ স্বেচ্ছাসেবীরা আবেগভরে বৃদ্ধকে আশ্বাস দেয়, 'বেঁচে থাকলে আপনার মেয়েকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করে দিতে পারবো।'

অসহায়দের উদ্ধারের জন্যে একদিন ওরা অমৃতসর যাচ্ছিলো, পথে ছেরাট্রার কাছে একটি তরুণীকে দেখতে পায়। ট্রাকের শব্দ শুনে ভীতসন্ত্রস্ত মেয়েটি পালিয়ে যাচ্ছিলো। ট্রাক থামিয়ে তরুণরা মেয়েটির পেছু ধাওয়া করে। কিছুটা যাওয়ার পর একটা ক্ষেতের মধ্যে ওরা মেয়েটিকে পাকড়াও করে।

মেয়েটি সুন্দরী, ডান গালে বড় একটা তিল আছে। একজন স্বেচ্ছাসেবী জিগেস করে, 'তোমার নাম কি সাকিনা?' ভয়ে মেয়েটি ফ্যাকাশে হয়ে যায়, মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের হয় না। স্বেচ্ছাসেবীরা ভরসা দেবার পর মেয়েটার ভয় ভাঙে এবং স্বীকার করে ও সিরাজউদ্দীনের মেয়ে সাকিনা।

স্বেচ্ছাসেবীরা তখন সর্বস্বান্ত বিধ্বস্ত মেয়েটির জন্যে যথাসাধ্য করে। ওকে ট্রাকে তুলে নেয় এবং দুধ রুটি খেতে দেয়। একজন তরুণ নিজের কোটটা খুলে সাকিনাকে পরতে দেয়, কেননা দো-পাট্টার অভাবে ও বার বার হাত দিয়ে বুক ঢাকছিলো।

বেশ কয়েকদিন কেটে যায়। সিরাজউদ্দীন সাকিনার কোনো খবর পায় না। আশ্রয়শিবির আর বিভিন্ন দফতরে উদভ্রান্তের মতো ঘোরাঘুরি করেই তার দিন কাটে, কিন্তু মেয়েটার কোনো খোঁজ নেই। রাত গভীর হলে সে স্বেচ্ছাসেবী দলটার সাফল্যের জন্যে প্রার্থনা করে, কেননা বেঁচে থাকলে ওরা তার মেয়েকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

একদিন সিরাজউদ্দীন ট্রাকে সেই স্বেচ্ছাসেবী দলটাকে দেখতে পায়। ট্রাকটা তখন ছেড়েই দিচ্ছিলো, সে দৌড়ে গিয়ে ওদের জিগেস করে, 'বাবা, তোমরা কি আমার সাকিনার কোনো খোঁজ পেয়েছো?'

ট্রাক থেকেই ওরা সমস্বরে জবাব দেয়, 'ভয় নেই, আর দু-একদিনের মধ্যেই ওকে ফিরে পাবেন।' ট্রাকটা ছেড়ে দেয়।

সিরাজউদ্দীন আবার ওই তরুণদের সাফল্যের জন্যে প্রার্থনা করে। তার মন অনেকটা হালকা হয়। শিবিরেই সে চুপচাপ বসে থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই কিসের একটা গোলমাল শুনতে পায়। চারজন লোক কি যেন একটা বয়ে আনছে। জিগেস করে জানতে পারে রেল লাইনের ধারে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় একটা মেয়েকে পাওয়া যায়। স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্ধার করা মেয়েটাকে এখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাহকদের পেছু পেছু সিরাজউদ্দীনও হাসপাতালে এসে হাজির হয়। হাসপাতালের জরুরী বিভাগে মেয়েটাকে রেখে দিয়ে লোকগুলো চলে যায়।

বাইরে বিজলি-বাতিস্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়ে সিরাজউদ্দীন খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। কামরার ভেতরে আর কেউ নেই, স্ট্রেচারে শুধু অচৈতন্য মেয়েটা পড়ে রয়েছে। হঠাৎ বিজলি বাতিটা জ্বলে ওঠে। মেয়েটির বিশীর্ণ ডান গালে তিলটা দেখেই সিরাজউদ্দীন চিৎকার করে ওঠে, 'সাকিনা!'

যে ডাক্তার ঘরের বাতিটা জ্বালিয়ে ছিলেন, তিনি জিগেস করলেন, 'কি ব্যাপার?'

উদ্বেল স্বরে সিরাজ বললো, 'আমি···আমি এর বাবা, হুজুর!'

ডাক্তার অচৈতন্য মেয়েটার নাড়ি পরীক্ষা করে দেখলেন, তারপর গম্ভীর গলায় সিরাজউদ্দীনকে বললেন, 'জানলাটা খুলে দাও!'

স্ট্রেচারে শায়িত নিথর দেহটা মৃদু নড়ে উঠলো, কাঁপা কাঁপা হাতেই মেয়েটা শালোয়ারের দড়ির গিঁট খুলে নাভির নিচে পর্যন্ত নামিয়ে দিলো।

অধীর আনন্দে বৃদ্ধ সিরাজউদ্দীন চিৎকার করে উঠলো, 'বেঁচে আছে, আমার মেয়ে বেঁচে আছে!' কিন্তু ওই দৃশ্য দেখে ডাক্তার ঘেমে নেয়ে একাকার।

অনুবাদ / অসিত সরকার

চাম্পুন

থেব মহাপায়োরিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে থাইল্যাণ্ডের যে কজন কবি শিল্পী সাহিত্যিক নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন, থেব মহাপায়োরিয়া তাঁদের অন্যতম। জন্ম ১৯১৭ সালে। সাহিত্যের সব শাখাতে হাত পাকালেও, ছোটগল্পেই তাঁর জনপ্রিয়তা সবচাইতে বেশি। থাই জার্নালে 'চাম্পুন' গল্পটি প্রকাশিত হবার পর দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই গল্পটি প্রকাশিত হবার কিছু দিন বাদেই, ১৯৬১ সালে চুয়াল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

বিশেষ বিভাগটাতে যাবার আগে হাসপাতালের পরিচালক আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'এই রোগীটি কিন্তু সদ্বংশজাত। ওর আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে শোনা টুকরো টুকরো অংশগুলো জোড়া লাগিয়ে আমি জানতে পেরেছি, ওর কাহিনীর সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁরা এখনও বেঁচে আছেন। তাঁরা সকলেই বিত্তবান এবং প্রভাবশালী মানুষ। ওর রোগের লক্ষণগুলোই এমন যে···ইয়ে···মানে আমরা, যারা এই হাসপাতালে রয়েছি···আমরা ওর সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। বিশেষ করে আইনত আমরা ওকে উন্মাদ বলতেও দ্বিধা বোধ করি। সরকারীভাবে আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে রোগী একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। আজ পাঁচ মাস হয়ে গেলো, কিন্তু এখনও সেই আঘাতটা ও মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। গোটা পৃথিবীটাই ওর চেতনা থেকে আড়াল হয়ে গেছে —যে পরিস্থিতিতে যে কারণে ওই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটেছিলো, শুধু সেটাই ওর মনে আছে···অন্য কোনো কিছুই ওর মস্তিষ্ক মেনে নিতে পারছে না এবং এখানেই হয়েছে মুশকিল। ওকে সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়ে আনার, স্বাভাবিক পথে ওর কাছ থেকে সাড়া পাবার সমস্ত রকমের চেষ্টাই আমরা করছি। এতে আমরা যদি সফল হই, আমাদের ধারণা তাহলেই ও সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু যদি তা না হয়···'

দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে ডাক্তারবাবু খানিকটা অসহায় ভঙ্গিমায় হাত দুটো গুটিয়ে নিলেন।

রোগীর বয়স সাতাশ-আটাশ। সুগঠিত শরীর, অসুস্থতার জন্যে চেহারার বিন্দু-মাত্রও হেরফের হয়নি। ফ্যাকাশে বা রোগাও নয়। সত্যি বলতে কি, মানুষটাকে আদপেই অসুস্থ বলে মনে হয় না। দেখতে সুদর্শন এবং বুদ্ধিমান। পোশাক-আশাক যথাযথ। একজন প্রকৃত ভদ্রলোকের মতোই সে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে উঠে এলো। একজন নেতার মতো তার ব্যক্তিত্ব, অনুগামীর মতো নয়।

'ভুকেতে আপনি নিশ্চয়ই বেশ কিছু দিন ছিলেন?' জিগেস করলাম।

'না, ভুকেতে নয়। পাংগার তাইমুয়াং-এ ছিলাম—বহু বছর।'

'তাইমুয়াং তো অনেকগুলো খনি এলাকার কেন্দ্র, তাই না? জায়গাটা নিশ্চয়ই খুব ভালো?'

'জঘন্য।'

আমি সতর্ক হয়ে উঠলাম, 'কি বলছেন আপনি? ওখানে কি এমন কিছু ছিলো যা অন্য জায়গাগুলোতে ছিলো না? যেমন ধরুন, হাত্মাইতে?'

'হাত্মাই আর ওই ধরনের অন্য জায়গাগুলোতে মদ, মেয়েমানুষ আর জুয়া ছিলো। কিন্তু তাইমুয়াং-এ ছিলো চাম্পুন ফুল, কুমির আর লোহার শেকল।'

'বুঝতে পারলাম না। আপনি যে তিনটে পাপ কাজের কথা বললেন—তার সঙ্গে চাম্পুন, কুমির আর লোহার শেকলের কি সম্পর্ক?'

'আপনাকে আমি বলবো,' জবাব দিলো লোকটা।

সেই থেকে স্রোত বয়ে চললো। লোকটার কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করে রাখা বাঁধটাকে আমি ভেঙে ফেলতে সফল হয়েছিলাম। তারই ফলশ্রুতি এই কাহিনী, যা আমি তার কাছ থেকে শুনেছিলাম। অবিশ্যি অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের সাহায্যে শূন্যস্থানগুলোকে আমায় ভরাট করে নিতে হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি এবং স্থানের নামগুলো এখানে কাল্পনিক।

'আমার বাবা ছিলেন পাংগার গভর্নর। যে আবাসিক স্কুলে আমি লেখাপড়া করতাম, সেটা ওই সময় ব্যাংককের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুনামের অধিকারী ছিলো। ষোল বছর বয়সে সামান্য উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠায় বাবা আমাকে পাংগায় ফিরে যাবার নির্দেশ দেন এবং আমি সেখানকার একটা স্কুলে গিয়ে ভর্তি হই। পাঁচটা বছর ওখানে থেকেই আমি স্কুলের পড়াশুনো শেষ করি। মোটামুটি ওই সময়েই আমার বাবা চাকরি থেকে অবসর নেন। হাতে গোনা যে কটা মানুষ দীর্ঘ দিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, বিদেশের অর্থনৈতিক আধিপত্য থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেবার জন্যে থাইল্যাণ্ডবাসীদের কিছু একটা করা উচিত—আমার বাবা ছিলেন তাঁদের মধ্যেই একজন। সরকারী চাকরির বদলে চিরদিনই তিনি আমাকে ব্যবসার পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করতেন এবং খুব সহজেই এ ব্যাপারে তিনি আমাকে রাজি করিয়ে ফেলেছিলেন। চাকরিতে অবসর নিয়ে বাবা ব্যাংককে ফিরে গেলেন। আমি তখন স্বাধীন হয়ে, পাংগায় একটা অস্ট্রেলিয় খনিজ কোম্পানিতে কেরানির চাকরি নিয়ে নিলাম। কিছু পরিমাণে অনিয়মিত জীবন ও

শিক্ষাধারা আমাকে এ কাজটার জন্যে উপযুক্ত করে তুলেছিলো—কারণ আমি মালয়ী, হোক্কেন এবং হাইলাম ভাষায় কথা বলতে পারতাম। ইংরেজী আর থাই বাদে আরও তিনটে ভাষা জানা লোকের জন্যে কোম্পানি যে কোনো অঙ্কের পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত ছিলো। ওরা আমাকে দুশো বাহ্ত দিতো—বাবার সঙ্গে ব্যাংককে বাস করতে গেলে এতো মাইনে পাবার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না।

'যাই হোক, ওই অস্ট্রেলিয়দের সঙ্গে আমি মাত্র দুটি বছর কাজ করেছিলাম। ওই সময় ইউকোন গোল্ড মাইনিং কোম্পানি নামে একটা মার্কিন প্রতিষ্ঠান তাইমুয়াং-এর কাছাকাছি একটা খনি খুলেছিলো। ওদের সমস্ত এশিয় শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করা এবং সরকারী পর্যায়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার কাজ করার জন্যে ওরা তখন একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছিলো। অবিলম্বে আমি সেখানে দরখাস্ত করলাম। আবেদনকারী ছিলো দশজনেরও বেশি। কিন্তু কোম্পানি তাদের মধ্যে সবচাইতে কম বয়সী আমাকেই ওই পদে মনোনীত করলো। ওরা আমাকে চারশো বাহ্তের মতো মাইনে দিতো। তাছাড়া কোম্পানির ম্যানেজার আমাকে বিভিন্ন ঠিকাদারদের পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়ায় খুব কম সময়ের মধ্যেই আমি প্রতি মাসে গড়ে প্রায় আটশো বাহ্তের মতো আয় করতে লাগলাম। একটা চব্বিশ বছরের তরুণের পক্ষে মাসে আটশো বাহ্ত রোজগার করা ভুকেতে অস্বাভাবিক ব্যাপার না হলেও, আমার জীবনে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং অনিবার্য পরিবর্তন এনে দিলো। যখন দুশো বাহ্ত রোজগার করতাম, তখন আমার হাতে সঞ্চয় করার মতো যথেষ্ট অর্থ উদ্বৃত্ত থাকতো। তখন আমি শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন কাটাতাম—পড়াশুনো করতাম আর কাজ থেকে ফিরে এসে রেডিও শুনতাম। কিন্তু যখন আটশো বাহ্ত আয় করতে শুরু করলাম, তখন মাসের শেষে আমার হাতে কিছু থাকতো না বললেই চলে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। সমস্ত পাপ কাজের নায়ক হিসেবে নই আমস্তয়ে তখন দিব্যি নাম কিনে ফেলেছে। হাঁ, তখন মদ মেয়ে-ছেলে জুয়ার আখড়ায় আমি গিয়ে ঢুকলেই রীতিমতো সাড়া পড়ে যেতো।

'অন্যান্য বিষয়েও আমি ছিলাম সবার আগে। কেউ আমার ওপরে ছড়ি ঘোরাবে, আমি কিছুতেই তা হতে দিতাম না। সবদা সর্বত্র আমিই ছিলাম নেতা, অনুগামী কদাপিও নয়। নিজের ভূমিকায় অভিনয়টাও আমি বেশ ভালোই করতাম। আমার সামাজিক পটভূমিকাটা এ বিষয়ে আমার খুব কাজে এসেছিলো বলেই আমার বিশ্বাস। থাই হোক বা বিদেশী হোক, যে কোনো সংসর্গেই আমি খুব স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতাম। সব চাইতে বড়ো কথা, আমার টাকা পয়সা আমাকে সকলের বন্ধু করে তুলেছিলো।

'তাইমুয়াং-এর বিভিন্ন ক্লাবে সময় কাটাতে আমি সব চাইতে বেশি ভালোবাসতাম। শহরটা ছিলো ওই অঞ্চলে ভ্রমণের কেন্দ্রস্থল। ওখান থেকে বহু জায়গায় যাওয়া যায়, চারদিকের রাস্তাগুলো ওখান থেকেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সামান্য দূরেই আমার কোম্পানির সদর দফতর। মজা লোটার সেরা জায়গাগুলোও ওখানেই।

'এবারে একটু মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শুনুন—কারণ এবারে আমি যা বলতে চলেছি, তা একটু ভালো করে বোঝার প্রয়োজন আছে।

'নদীর মোহনার কাছে আমাদের সদর দফতর। তাইমুয়াং থেকে মোহনার দিকে যাবার দুটো পথ। এখান থেকে নৌকোয় উজিয়ে গিয়ে আপনি বিপরীত দিকের তাকুয়াপা-তাংমাপ্রাম্বো রোডে গিয়ে নামতে পারেন। তারপর সেখান থেকে বাস ধরে আপনাকে মোহনার দিকে যেতে হবে। কিন্তু এতে অনেকটা সময় লাগে। এ পথে যাবার অর্থ, পাঁচ-ছ ঘণ্টা আড়ষ্ট হয়ে নৌকোয় বসে থাকা। সব চাইতে বড়ো কথা, কখন যে আপনি বাস ধরতে পারবেন তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই।

'আর একটা পথ হচ্ছে, নৌকোয় চেপে ঠিক মোহনার কাছাকাছি গিয়ে নদী পার হওয়া। তারপর সেখান থেকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটাপথে যথাস্থানে গিয়ে পৌছানো। এ পথে মাত্র ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে। কিন্তু এ পথে যাবার কতকগুলো গুরুতর অসুবিধে আছে। ভাগোমতো চেনা না থাকলে জঙ্গলের মধ্যে আপনি অতি সহজেই পথ হারিয়ে ফেলতে পারেন। তা ছাড়া নদীর ওই অঞ্চলটা কুমিরে একেবারে থিকথিকে—অমন হিংস্র কুমির আমি জীবনেও দেখিনি। বাবা যখন নাকর্ণ শ্রীতম্পারাজের গভর্নর ছিলেন, তখন আমি বহুবার তাঁর সঙ্গে পক পায়ুর অঞ্চলে কুমির শিকারে গেছি—যেটাকে কুমির শিকারের পক্ষে আদর্শ জায়গা বলে মনে করা হয়। কিন্তু আমাদের খনি অঞ্চলের নদীটার সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলে না। ওখানে কুমিরগুলো কোনো রকম ইঙ্গিত না দিয়ে একেবারে আচমকা নৌকোর মানুষের দিকে লাফিয়ে ওঠে। কাজেই জায়গাটা যে নির্জন হবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। শুধু নদীর ধার বরাবর মাত্র গুটি কয়েক পরিবারের বাস। বুঝতেই পারছেন, কেন খুব কম লোকই ওই নদী পারাপার করতে সাহস করতো—বিশেষ করে ছোটো নৌকোয়। গোটা ভুকেতে ওই জেলাটা ছিলো একেবারে কুখ্যাত। তাইমুয়াং-এর যে সমস্ত লোক আমাদের খনিগুলো দেখতে আসতো, নৌকো যথেষ্ট মজবুত এবং তার দুধারে কাঠের উঁচু পাটাতন না থাকলে তারা কিছুতেই নদী পার হতে রাজি হতো না।

'আমি অবিশ্যি নদী পারাপারের জন্যে কোম্পানির নৌকোই ব্যবহার করতাম.

—সেগুলো বেশ বড়ো আর যথেষ্ট নিরাপদ। ওই নৌকোয় চেপে আমি সব চাইতে ভয়ঙ্কর অঞ্চলগুলোও নির্বিবাদে পেরুতাম। নিরাপদে পেরুতাম। তারপর নদীর ধার থেকে জঙ্গল পেরিয়ে যেতাম। প্রায়ই যাতায়াত করতে হতো বলে জঙ্গলের পথঘাট আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। তবু অন্ধকার হবার আগেই যাতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে পারি, সেদিকে আমার খেয়াল থাকতো। ওই অঞ্চলে বাঘের পায়ের ছাপও খুব একটা দুর্লভ দৃশ্য নয়।

'বুঝতেই পারছেন, পাপের আকর্ষণ কি প্রচণ্ড দুর্নিবার! এমন কি বাঘ আর কুমিরও পাপের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

'আমি গর্ব করতে চাইনে, কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে তাইমুয়াং-এ আমি ভীষণ জনপ্রিয় ছিলাম। এবং এই কারণেই তাইমুয়াং-এর—সত্যি বলতে কি গোটা ভুকেতেরই—এক গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে আমার সংঘর্ষ দানা বেঁধে উঠলো। ব্যক্তিটির নাম তাওকি সুন।

'তাওকি সুন ওই অঞ্চলে 'বড়োভাই সুন' নামেও পরিচিত। উনি যদি ব্যাংককে থেকে সাফল্য অর্জন করতেন তাহলে চীনা অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ওঁর নামটা উচ্চারিত হতো। কিন্তু দক্ষিণী টানে সেটা শোনাতো বিদেশী নামের মতো। ভুকেতের প্রতিটি লোকই ছিলো ওঁর বন্ধু বা পরিচিত। কিন্তু যে অঞ্চলগুলোতে ওঁর প্রভাব সব চাইতে বেশি করে বোঝা যেতো সেগুলো হচ্ছে তাইমুয়াং, তাকুয়াপা, পাংমা, কোয়াকলয় আর তাংমাপ্রায়ো। আদালতে গিয়ে পৌছবার আগেই বড়োভাই ওই সমস্ত অঞ্চলের বৈধ বা অবৈধ সমস্ত রকম মামলার ভার নিজের হাতে তুলে নিতেন এবং আদালতের বাইরেই সেগুলোর নিষ্পত্তি হয়ে যেতো। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের জন্যে তিনি আমোদ-ফূর্তির ঢালাও বন্দোবস্ত করে দিতেন। ওই সমস্ত অঞ্চলে গেলে তারা সবাই বড়োভাইয়ের গাড়িতেই যাতায়াত করতো এবং উনি তাদের মজা লোটার সেরা জায়গাগুলোতেই নিয়ে যেতেন। ওখানকার সমস্ত রকম বিলাস-ব্যসনই তারা তখন ইচ্ছেমতো উপভোগ করতে পারতো। কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী তার মনোবাসনা ব্যক্ত করলে তৎক্ষণাৎ তা পূর্ণ করা হতো। অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে বড়োভাইয়ের যথেষ্ট নামডাক ছিলো। অল্পবয়সী আমলারা সহজেই তাঁর নিবেদিত সুখ-বিলাসের বশীভূত হয়ে, খুব শীগগিরি তাঁর একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্র হয়ে উঠতো।

'বড়োভাই ছিলেন একজন উগ্র জাতীয়তাবাদী। তিনি অবশ্যই স্বদেশের জন্যে কাজ করতেন এবং সেদিক দিয়ে তিনি ছিলেন সমালোচনার অতীত। আমিও প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী ছিলাম—কিন্তু আমার রাগ হতো যখন উনি মুহূর্তের জন্যে নিজেকে

ভুলে গিয়ে অন্যায় অশোভন আচরণ করতে শুরু করতেন। তবে তাওকি স্থন কোনোদিনই সবার সামনে কাউকে অপমান করেননি। চিরদিনই তিনি ধূর্ত ও কৌশলী। ভেবেছিলাম আমি ওঁর ধূর্ত চাতুর্যের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলতে পারবো। তাই কোনোদিনই আমি খোলাখুলিভাবে ওঁর বিরোধিতা করিনি। উনি ছিলেন প্রবীণ জুয়াড়ি আর আমি এক তরুণ যুবক—এ ধরনের খেলায় একেবারে আনকোরা নতুন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু ব্যক্তিগত মৌলিক কৌশলের সাহায্যে আমি বেশ কয়েকবারই তাঁর বাঘের মতো থাবাটাকে দুর্বল করে দিতে পেরেছিলাম। সবাই তখন আমার রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করলো আর গোপনে উপহাস করতে লাগলো তাওকি স্থনকে। এটা স্থন কোনোমতেই ক্ষমা করতে পারেননি।

'কোনোদিন খোলাখুলি সংঘর্ষ না হলেও আমাদের দুজনকার দ্বন্দ্বের কথা ওই অঞ্চলের সকলেই জেনে ফেলেছিলো। চীনা এবং থাই—প্রত্যেকেই যেন সুযোগের অপেক্ষা করতো, যাতে আমাদের মধ্যে লড়াইটা বাধিয়ে দেওয়া যায়। মনে হতো, আমার মতো একটা অনভিজ্ঞ হরিণের সঙ্গে স্থনের মতো একটা পাকা বাঘের লড়াই দেখা তাদের কাছে যেন একটা উত্তেজনাময় খেলা দেখার সামিল। আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিলাম, কবে ওরা আমাদের খোলাখুলি যুদ্ধে নামতে বাধ্য করবে। এতো দীর্ঘদিন ধরে স্থন জঙ্গলের রাজা ছিলো যে এমন একটা পরিস্থিতি তাঁর পক্ষে সহ্য করাও অসম্ভব ছিলো। একটা অজানা জন্তু এসে তার রাজ্য আক্রমণ করবে আর বনের রাজা বাঘ কিছুই করবে না, তা কি করে হয়? আমি বহুবার নিজেকে বলেছি, শেষ অব্দি আমার ওপরে আঘাত আসবেই—খোলাখুলি দিনের আলোয় না এলেও আসবে রাতের অন্ধকারে। দুজনার মাঝখানকার বিপজ্জনক অঞ্চলটা আমি ক্রমশ আরও সতর্ক হয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিলাম—পেরিয়ে যাচ্ছিলাম যতোদিন না...

'আচ্ছা, আপনি চাম্পুন ফুল চেনেন?'

লোকটার এহেন আকস্মিক প্রশ্ন এবং তার কাহিনীর এমন আচমকা নতুন মোচড়ে আমি রীতিমতো চমকে উঠলাম। ডাক্তার রোগীর সঙ্গে আমাকে একা রেখে চলে গিয়েছিলেন। মনে হলো, আমি নিরাপদ তো? তবু দ্রুত জবাব দিলাম, 'নাম শুনেছি, তবে কোনোদিনও দেখিনি।'

'ব্যাংককে চাম্পুন একটা দুর্লভ ফুল। তবে দক্ষিণের জেলাগুলোতে, বিশেষ করে তাইমুয়াং-এর চতুর্দিকে ওই ফুল প্রচুর দেখা যায়। আমি আপনাকে ফুলটার বর্ণনা দিচ্ছি, শুনুন।

'চাম্পুন হচ্ছে চম্পক প্রজাতির ফুল। দেখতে অনেকটা চাম্পির মতো, কিন্তু

কুঁড়ি থাকার সময় একটা মখমল জাতীয় বৃতি ফুলের পাপড়িগুলোকে ঢেকে রাখে। তারপর সেই মখমলের আবরণ সরে যায় আর পাপড়িগুলো ছড়িয়ে পড়ে পূর্ণ সুষমায়। তখন কি যে আশ্চর্য সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। চাম্পুনের পাপড়িগুলো মোমের মতো, বেশ পুরু আর শক্ত। চাম্পির মতো ওদের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যায় না। ফোটার পরে বেশ কয়েকদিন অব্দি ওরা সতেজ থাকে। অসংখ্য ফুলের মধ্যেও চাম্পুনের সৌরভ আলাদা করে ছাপিয়ে ওঠে, সমস্ত চেতনাকে একেবারে বিবশ করে তোলে।

'জাতীয়তাবাদী সুন যে এই ফুলের নামেই তাঁর একমাত্র মেয়ের নামকরণ করবেন, তাতে আর বিচিত্র কি ? চাম্পুন। হয়তো উনি বুঝতে পেরেছিলেন, ওই নামটাই ওঁর মেয়ের পক্ষে সবচাইতে বেশি মানানসই হবে। উনিশ বছর বয়সে চাম্পুন ছিলো একটি ঝলমলে আকর্ষণীয় মেয়ে। নামের খাতিরে ও কিন্তু চাম্পুন ফুলের মতো প্রথম নজরেই দৃষ্টি কাড়তো না। কিন্তু দ্বিতীয় বারে, একটু খেয়াল করে তাকালেই, ওর সৌন্দর্য স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়তো। ওই নামের একটি মেয়ের কাছ থেকে যেমনটি আশা করা যায়, ওর আবেগ-অনুভূতিও ছিলো ঠিক তেমনি। চাম্পুন ফুলের সৌরভের মতোই ক্ষমতা ছিলো ওর আবেগের। ও একবার কোনো বিষয়ে মনস্থির করলে, পৃথিবীর কোনো শক্তিই তা বদলাতে পারতো না। ও যা করবে, তা করবেই—তখন কেউই ওকে থামাতে পারবে না।

'বারো বছর বয়স অব্দি চাম্পুন ভুকেতের স্কুলে পড়তো। তারপর ওর বাবা ভাবলেন, একটি সম্ভ্রান্ত চীনা মেয়ের মতো এবারে ওর বাড়িতেই থাকা উচিত। কিন্তু চাম্পুন তখন চতুর্থ মাতায়্যমে পড়ছে—বাবার পরিকল্পিত জীবনধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতো যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতার স্বাদ ততোদিনে ও পেয়ে গেছে। যে কোনো কারণেই হোক সুন বুঝতে পারলেন, চাম্পুনের জেদী মনোভাবটা তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তাই পেনাং-এর একটা কনভেন্টে লেখা-পড়া চালিয়ে যাবার অনুমতি দিয়ে তিনি মেয়ের সঙ্গে বিষয়টার সমঝোতা করে ফেললেন। এতেই বোঝা যায় যে মেয়েদের লেখাপড়া করার ব্যাপারে তাঁর কোনো আপত্তি ছিলো না, আসলে থাই জীবনধারার সঙ্গে চাম্পুনের মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়াটাই তিনি আটকাতে চেয়েছিলেন। স্পষ্টতই তার অর্থ, তিনি চাইতেন না তাঁর মেয়ে কোনো থাইকে বিয়ে করুক।

'কিন্তু চাম্পুন স্কুল থেকে ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই বাবার ইচ্ছে-অনিচ্ছের সঙ্গে ওর সংঘর্ষ বেঁধে গেলো। তাওকি সুন তখনও মেয়েকে কঠোর শাসনে রাখতে চান, কিন্তু চাম্পুন তা. মেনে নিতে রাজি নয়। বাবা আর মেয়ের মধ্যে শুরু হলো

ঠাণ্ডা লড়াই। অবিশ্যি বাবার বিধি-নিষেধগুলো চাম্পুন কিছুদূর অব্দি মেনে নিতে রাজি হলো। যেমন, কাউকে সঙ্গে না নিয়ে ও একা একা বাইরে কোথাও যাবে না আর চৈনিক সমাজের রীতিবহির্ভূত বলে বাড়ির সদর থেকেও ও দূরে থাকবে। কিন্তু কোথাও যাবে বলে একবার মনস্থির করলে কিংবা কোথাও ওর উপস্থিতির প্রয়োজন থাকলে, চাম্পুন কোনো বাধাই মানবে না—বাবার আপত্তি থাকলেও ও সেখানে যাবেই। ওই সমস্ত ক্ষেত্রে স্থন এমন ভান করতেন যেন বিষয়টা তিনি আদপেই কিছু জানেন না। কিন্তু আসলে মেয়ের প্রবল একগুঁয়েমির কাছে তিনি সাহস হারিয়ে ফেলতেন। তাছাড়া সমঝোতা করে নেওয়াটা যেখানে সুবিধেজনক, সেখানে তিনি কখনই জোর করে বাধ্যতা আদায় করতে চাইতেন না।

'দক্ষিণ অঞ্চলের বাড়িগুলো কিভাবে তৈরি করা হয়, এবারে আমি তার একটা বর্ণনা রাখবো। চাম্পুন সদরের বারান্দায় না যেতে রাজি হয়েছিলো—এ কথায় আমি কি বলতে চেয়েছি, তাহলে সেটা আপনি বুঝতে পারবেন।

'দক্ষিণের জেলাগুলোতে যে বাসগৃহগুলো তৈরি হয়, সেগুলো দেখতে মোটামুটি ব্যাংককের বাড়িগুলোর মতোই। রাস্তার ধার ঘেঁষে সারি সারি একটার পর একটা ঘর। রাস্তা থেকে দেখে মনে হয় বাড়িগুলোর দৈর্ঘ্য ব্যাংককের বাড়িগুলোর মতোই, কিন্তু সাধারণত এগুলো আরো বেশি লম্বা হয়। প্রতিটা বাড়ি লম্বায় প্রায় তিরিশ-চল্লিশ ওয়া—এক ওয়া প্রায় এক মিটারের সমান। যথেষ্ট আলো পাবার জন্যে ছাদের কিছু কিছু অংশ খোলা থাকে। বাড়ির মালিকের সামর্থ্য অনুযায়ী ওই খোলা অংশ-আবার কাচ বা টিন দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়। কাচ বা টিনের ওই ঢাকনাগুলোকে ইচ্ছেমতো ঠেলে সরানো যায়, যাতে বৃষ্টির সময় ঢাকনা টেনে খোলা অংশটা ঢেকে দেওয়া যায়। আঞ্চলিক চীনেরা এই ধরনের বাড়িতেই বাস করতেন। জাঁক দেখা-বার জন্যে চীনে ব্যবসায়ীরা অপরূপ সমস্ত অট্টালিকা তৈরি করাতেন বটে—কিন্তু যেখানে বাস করে তাঁরা নিজেদের সম্পদ গড়ে তুলেছেন, সেখানেই তাঁরা বাস করতে ভালোবাসতেন।

'এইমাত্র আমি আপনাকে যেমনটি বললাম, তাওকি স্থনের বাড়িটা ছিলো ঠিক তেমনি। কিন্তু বাড়িটা ছিলো শহরের বাইরে, তাই তাঁর বাড়ির সামনের অংশে কোনো প্রাণচঞ্চল রাস্তা ছিলো না। আর বাড়ির পেছন দিকটা ছিলো জঙ্গলের কোল ঘেঁষে। চীনে-বাড়ির মেয়েদের বাড়ির সামনের দিকে খুব কমই দেখা যায়। যদিও মেয়েদের অন্দরে গুঁজে রাখার প্রথাটাতে চাম্পুনের কোনো সায় ছিলো না, কিন্তু সদর বারান্দায় আসার ব্যাপারে ওর নিজেরও তেমন কোনো আকুলতা ছিলো না। ঘর-গেরস্থালী আর কুটিরশিল্পের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখে চাম্পুন সত্যিই

খুব আনন্দ পেতো। প্রচুর পড়াশুনো করতো ও—পেনাং থেকে, ব্যাংকক থেকে বই আনাতো। তাছাড়া ও আনন্দ পেতো জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে।

'যেন ব্রহ্মার দীর্ঘ দিন আগেকার পরিকল্পনা মতোই ঘটনাচক্রে আমাদের দেখা হয়ে গেলো, আমরা দুজন দুজনকে ভালোবেসে ফেললাম। আমাদের প্রেমটা হয়ে গিয়েছিলো অতর্কিতে, কিন্তু সেটা ছিলো যেমন তীব্র তেমনি গভীর। ব্যাপারটা আমাদের গোপন রাখতে হয়েছিলো, দুজনেরই মনে হয়েছিলো, এ প্রেম অর্থহীন—এবং এই কারণেই আমাদের প্রেম আরও গাঢ় হয়ে উঠেছিলো। আমরা দুজনেই জানতাম, তাওকি স্থন যাকে ঘৃণা করেন, যাকে নিজের সব চাইতে বড়ো শত্রু বলে মনে করেন—তার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবার চাইতে তিনি বরং মেয়ের মৃত্যুকেও শ্রেয় বলে মনে করবেন।

'চাম্পুনের সঙ্কল্প ছিলো অটল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ও আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে রাজি হলো না…ওর শিক্ষা, ওর রুচিবোধ ওকে পেছনে টেনে রাখলো। আমার দিক থেকে আমি তেত্রিশ কোটি দেবতার নামে শপথ করে বলতে পারি, আমি ওকে সত্যিই ভালোবাসতাম…গভীরভাবে ভালোবাসতাম। কিন্তু আমিও পেছিয়ে রইলাম, কারণ আমি ওর কাছ থেকে কোনো অন্যায় সুযোগ নিতে চাইনি। তাই পালাতে পারলেও আমরা ঐতিহ্যের বাঁধনের নাগালে থাকাই শ্রেয় বলে মনে করলাম আর চাম্পুনও মুক্তির সহজ পথটা বেছে নেবার বদলে দুঃখ-যন্ত্রণাকেই বরণ করে নিলো।

'তাইমুয়াং একটা ছোট্ট জায়গা, এখানে কোনো কিছুই দীর্ঘদিন গোপন থাকে না। বিশেষ করে এমন একটা প্রেমকাহিনী। দেখতে দেখতে কথাটা সারা শহরে রাষ্ট্র হয়ে গেলো এবং খুব শীগগিরি চাম্পুনের বাবার কানে গিয়ে পৌঁছলো।

'ওর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গেলো। আমি জানতাম ওকে বাড়ির মধ্যেই রাখা হয়েছে, অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়নি—কারণ খবরাখবর পাবার জন্যে আমি ওর বাড়ির চতুর্দিকে লোক লাগিয়ে রেখেছিলাম। আমার যে তখন কি অবস্থা, তা আমি আর বলতে চাইনে। ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে আমি সমস্ত রকমের চেষ্টা করেছি। এমন কি এ কথাও বলেছি, যে আমার চিঠি ওর কাছে পৌঁছে দেবে তাকে আমি পুরস্কার দেবো—আরও বেশি পুরস্কার দেবো, যদি কেউ ওর চিঠি আমার কাছে নিয়ে আসতে পারে। অনেকেই চেষ্টা করেছে, কিন্তু কেউই আমাদের একজনের চিঠি অন্যজনকে পৌঁছে দিতে পারেনি—বরং মাঝখান থেকে নিজের জীবনই বিপন্ন করে তুলেছে।

'আড়াআড়ির প্রথম দিকে তাওকি স্থন আর আমি খানিকটা সামাজিক রীতি-নীতি বজায় রেখে চলতাম…লোকসমক্ষে একে অন্যের সঙ্গে মার্জিত ব্যবহার

করতাম। কিন্তু এবারে খোলাখুলি যুদ্ধ বেধে গেলো। দুজনই দুজনকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতাম, কিন্তু হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে একে অন্যের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাতাম। চাম্পুনের কথা বলতে গেলে—আমি আমার কয়েকজন চরের মাধ্যমে ওর সম্পর্কে কিছু খবরাখবর পেয়েছিলাম। শুনেছিলাম ওকে চাবকানো হয়েছে, অত্যাচার করা হয়েছে···ওই লম্বা, অন্ধকার বাড়িটাতে ওকে বন্দিনীর মতো রাখা হয়েছে।

'দীর্ঘদিনের জন্যে আমি ভুকেত থেকে নির্বাসিত হয়েছিলাম। ওই অঞ্চলের চতুর্দিকে বেশ কয়েকটা মহলে আমাদের ব্যাপারটা তখন রীতিমতো আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিলো। আমি যেখানে স্থিতু হয়েছিলাম সেখানকার একদল বন্ধু-বান্ধব আমাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে একদিন একটা মোটর বোট ভাড়া করে একটা হুল্লড়েভরা জমাটি পার্টির বন্দোবস্ত করে ফেললো।

'মনে রাখার মতোই হয়েছিলো পার্টিটা। খাদ্য পানীয় আর মেয়েমানুষ। খাবার বা মদের উৎকর্ষ কেমন ছিলো তা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে সমস্ত কিছু ব্যবস্থাপনার মধ্যে এমন একটা ব্যাপার ছিলো, যা পয়সা দিয়েও কেনা যায় না।

'ওই পার্টিতে বিশেষ করে আমার জন্যে পেনাং থেকে একটি বারাঙ্গনাকে নিয়ে আসা হয়েছিলো। এই বিশেষ উপলক্ষে ও এসেছিলো আমন্ত্রিত হয়ে, আমন্ত্রণ গ্রহণ করে।

'নিকষ অন্ধকার রাতে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন সত্তাকে আলোকিত করে তুলতে একটা ছোট্ট আলোই যথেষ্ট। তেমনি, কোনো বিশেষ নারীর অভাবে যখন কেউ কষ্ট পায়, তখন অন্য কোনো নারীর মাধ্যমেও সে শান্তি আর সান্ত্বনার সন্ধান খুঁজে পায়। বন্ধুরা ভেবেছিলো তারা আমাকে সাহায্য করছে। আর আমিও সেই শয়তানের উপহারটিকে গ্রহণ করেছিলাম বিনা দ্বিধায়।

'মেয়েটির নাম অ্যানিটা। ও জাতে ফিলিপিনা, দেহে খানিকটা পর্তুগীজ রক্তও আছে। সহজেই ওকে একটি থাই মেয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। মেয়েটি নিঃসন্দেহে সুন্দরী, ওর ব্যক্তিত্বও মুগ্ধ করে দেবার মতো।

'আমি ও আমার বন্ধুরা তিন দিন তিন রাত্রি ওই নৌকোতেই কাটালাম। ওরা আমাকে র‍্যানং-এ নিয়ে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু একটা বিশেষ জরুরী কাজ থাকায় আমি ওদের সঙ্গী হতে পারলাম না। ওরা তখন আমাকে রেখেই চলে গেলো, কিন্তু অ্যানিটা রয়ে গেলো আমার কাছে। পাঁচ-ছদিন বাদে বন্ধুরা ফিরে আসবে, তারপর অ্যানিটাকে নিয়ে গিয়ে পেনাং-এ পৌঁছে দেবে।

'অ্যানিটাকে আমি বন্ধুদের সঙ্গে র‍্যানং-এ চলে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু

আশ্চর্যের বিষয়, ও আমার সঙ্গে ওই নির্জন বুনো জায়গাটাতেই থেকে যেতে চাইলো। পরে আমি ওকে জিগেস করেছিলাম, কেন ও থেকে গেলো। ও বলেছিলো, আমার যৌবন আমার চেহারা আর আমার মার্জিত ব্যবহার ওকে মুগ্ধ করেছিলো।

'অ্যানিটার দেওয়া ওই বিশেষণগুলো কি প্রচণ্ডভাবে টলিয়ে দিয়েছিলো আমাকে! অথচ আমার জীবন আর আমার আত্মার জন্যে কতোটুকু কি করতে পারতো সুন্দরী অ্যানিটা?

'বন্ধুরা চলে যেতেই অ্যানিটা আর আমি আমার বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। পরস্পরকে সত্যিকারের চিনে নেবার নেশা উত্তেজিত করে তুললো আমাদের দু-জনকেই।

'আমার বাসস্থানটা অমার্জিতভাবে গড়ে তোলা একটা কাঠের বাংলো বাড়ি। তিনটে ঘরই বারান্দার দিকে খোলা, সেখান থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের উঠোনে। প্রথম ঘরটা আমার শোবার ঘর। দ্বিতীয়টাতে আমি খাওয়া-দাওয়া করি। ওই ঘর থেকে একটা সরু বারান্দা চলে গেছে রান্নাঘর আর স্নানঘরের দিকে। তৃতীয় ঘরটা সর্বদাই তালাবন্ধ থাকে, কারণ ওখানে আমি আমার জরুরী কাগজপত্র আর দলিল-দস্তাবেজগুলো রাখি। অবিশ্যি শোবার ঘরে আমি রাত্রি বেলাও ছিটকিনি তুলি কদাচিৎ।

'কোম্পানির অন্য বাড়িগুলো থেকে আমার বাংলোটা সামান্য একটু দূরে—নদীর কাছাকাছি, অরণ্যের একেবারে কোল ঘেঁষে। বাংলোর চৌহদ্দিটা মোটামুটি সর্বদাই নিরিবিলি নিস্তব্ধ এবং প্রায়শই জনহীন। দিনের বেলায় একটি চাকর এসে আমার রান্নাবান্না করে দেয়। সন্ধ্যাবেলায় শ্রমিক-মজুররা অধিকাংশ সময়েই নিজেদের ডেরায় বসে জুয়া খেলে অথবা নিজেরা নিজেরা অন্য কোনো আমোদ ফুর্তি করে সময় কাটায়।

'বন্ধুরা যেদিন অ্যানিটাকে নিয়ে যেতে আসবে, তার আগের দিন সন্ধ্যায় কোম্পানির এঞ্জিনিয়াররা সমুদ্রের ধারে এক নৈশভোজে আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন এবং আমিও তাঁদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। আসলে ওঁরা দীর্ঘদিন নারীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তাই একটি সুন্দরী নারীর উপস্থিতি ওঁদের রক্ষণশীলতাকে স্রেফ গলিয়ে দিলো। কিন্তু আচার-আচরণে সত্যিকারের ভদ্রজনোচিত ব্যবহারই করলেন ওঁরা—অ্যানিটার সঙ্গে নাচলেন, একটু-আধটু মিষ্টিমধুর রসালাপও করলেন। ভোর অব্দি চললো ওঁদের ওই পার্টি।

'আমার ঘুম চিরদিনই হালকা এবং ঘুম আনতে আমার চিরদিনই কিছুটা

সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেদিন রাতে পার্টির পর আমি খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। একটু পরেই ঘুম ভেঙে গেলো। একটা কঁ্যাচ কঁ্যাচ আওয়াজ শুনতে পেলাম, মনে হলো সদর দরজার তৈল-তৃষিত কবজাগুলোর আর্তনাদ। খানিকটা অবাক হলাম—কারণ আমার স্পষ্ট মনে আছে, শুতে আসার আগে আমি দরজা বন্ধ করে এসেছিলাম।

'প্রভাতসূর্যের আলো খোলা দরজা দিয়ে সরাসরি মুখে এসে পড়তেই আমার ঘুম ভেঙে গেলো। ভাবছিলাম, গত কাল রাতে শোনা শব্দটার একটু খোঁজ-খবর করবো। কিন্তু তখনই হঠাৎ দোরগোড়ায় কার যেন একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম। ব্যাপারটা যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, তাই চোখ দুটো ভালো করে রগড়ে নিলাম।

'হে ঈশ্বর! আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম? আমি কি পাগল হয়ে গেছি? চোখ বন্ধ করলে আমি আজও সেই দৃশ্য দেখতে পাই, যা সেদিন আমার কাছে বিদেহীর উপস্থিতি বলে মনে হয়েছিলো। মূর্তিটা চাম্পুনের—সম্পূর্ণ নগ্ন শরীর, লম্বা লম্বা কালো চুলগুলো নেমে এসেছে কাঁধ ছাপিয়ে, একটা লোহার শেকলে ওর গোড়ালি আর মণিবন্ধ দুটি জড়ানো।

'আমরা দুজনেই তখন নির্বাক। দেখলাম, ওর চোখ দুটি আস্তে আস্তে আমার মুখের দিক থেকে সরে গেলো। যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতোই আমি ওর দৃষ্টিকে অনুসরণ করলাম।

'আমাদের দুজনের সম্মিলিত দৃষ্টি অ্যানিটার ওপরে এসে পড়তেই আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেললাম। বিছানায় নীহারিকার মতো হালকা মশারির আড়ালে অ্যানিটার শরীর ঘনিষ্ঠ হয়ে লেগে আছে আমার শরীরের সঙ্গে, অ্যানিটা ঘুমোচ্ছে। ওর শ্বাস বইছে মৃদু লয়ে।

'কেন জানি না, চাম্পুনের নগ্নতায় আমার কোনো লজ্জা লাগছিলো না। অথচ অ্যানিটার অবারিত শরীর আমাকে এমন লজ্জিত করে তুললো যে আমি দ্রুত ওর গায়ে চাদরটা টেনে দিলাম। চাম্পুনের দিকে আমি তাকাতে পারছিলাম না। ও কিছু বলবে বলে আমি অপেক্ষা করছিলাম। আমার মাথা ঝিমঝিম করছিলো। আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম তখন? নাকি সবই সত্যি? নিজের চোখ দুটো আমি চেপে বন্ধ করলাম। ফের যখন চোখ খুললাম তখন চাম্পুন চলে গেছে।

'বাবার কাছে চাম্পুন স্বীকার করেছিলো, নই আমমুয়েকে ও ভালোবাসে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ওরা দেখাসাক্ষাৎ করেছে। কিন্তু তাঁকে ও এই বলে

আশ্বস্তও করেছিলো। যে আমি ওকে এমন কিছু করিনি যা ওর বা ওর পরিবারের পক্ষে লজ্জা এবং অসম্মানজনক হয়ে উঠবে। সুন ওর কথা বিশ্বাস করেননি। বিশ্বাস করেননি তার কারণ, একটি মেয়ে একজন পুরুষের সঙ্গে কয়েকবার গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করেও কিভাবে নিজেকে অটুট রাখতে পারে, তা তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। বাড়িতেই তাঁর ছটি উপপত্নী। একটা সুস্থ স্বাভাবিক যুবক হিসেবে নই আমন্নয়ে অস্বাভাবিক প্রলোভনের দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য। তাছাড়া নই আমন্নয়ে তাঁর শত্রু—দেশের যে অঞ্চল সে কয়েক দশক ধরে শাসন করছে, সেখানে ওই ছোঁড়াটা তাঁর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। কাজেই তার পক্ষে বাপের রাগটা মেয়ের ওপরে মিটিয়ে নেওয়াটাই স্বাভাবিক। সুনের ধারণা, যে মানুষটাকে সে ঘৃণা করে তাকে ভালোবেসে চাম্পুন নিজের বাবার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। চাম্পুনের যুক্তি, ব্যাখ্যা বা আবেদন-নিবেদন—কোনো কিছুই তিনি কানে তুলতে রাজি হননি।

'বাপ আর মেয়ে দুজনেই যখন সমান জেদি আর একগুঁয়ে, দুজনেরই যখন সমান অবিচলিত মনোভাব, কেউই যখন এতোটুকুও ছেড়ে দিতে রাজি নয়—তখন তার ফলাফলটাও সহজেই আগে থেকে অনুমান করে নেওয়া যায়। ওদের কথা কাটাকাটির পরিণতিতে এলো হিংস্রতা। সুন বড়োসড়ো একখণ্ড চেলাকাঠ চাম্পুনকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। চাম্পুন সময়মতো একটু সরে যেতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন সুন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাম্পুনকে উনি প্রচণ্ড মারধোর করলেন—প্রতিবেশীরাও তার শব্দ শুনতে পেলো। অসহ্য যন্ত্রণায় চাম্পুন প্রাণপণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শুধুমাত্র একটু অস্ফুট গোঙানি প্রকাশ করতে পারলো। তাওকি সুনের পাশবিকতা শেষ হবার পর ও কোনোক্রমে মেঝে থেকে নিজের শরীরটাকে টেনে তুলে বললো, 'আমি তোমাকে বলেছি, এখন অব্দি কেউ আমাকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করলে না। ঈশ্বর আমার সাক্ষী থাকলেন. এবারে আমি আমন্নয়ের কাছে গিয়ে নিজেকে তার কাছে বিলিয়ে দেবো'।

'সবাই জানতো, চাম্পুন নিজের কথা রাখবে—কারণ ও মুখে যা বলে, কাজে ঠিক তা-ই করে। এক সপ্তাহ বাদেই বাবার অনুপস্থিতির সুযোগে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

'যে কোনো চীনাবাড়িতে পরিবারের কর্তাই বাড়ির আইন। সুন শাসিয়ে রেখেছিলেন, চাম্পুন যদি কখনও বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় তাহলে তিনি বাড়ির প্রত্যেককে—প্রত্যেক স্ত্রী, ছেলে আর চাকরবাকরদের—শাস্তি দেবেন। কাজেই চাম্পুনের পক্ষে পালানো কঠিন ছিলো। বলতে গেলে পুরো পরিবারটাই সেদিন

চাম্পুনকে টুঁটি চেপে ধরে নিয়ে আসে আর কয়েকজন গিয়ে খবর দিয়ে নিয়ে আসে বাড়ির কর্তামশাইকে। প্রথম প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ চাম্পুনকে সেদিন অনেক শাস্তি পেতে হয়।

'এরপরেও ও বেশ কয়েকবার পালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাওকি স্নুন ওকে ওর শোবার ঘরে একটা খুঁটির সঙ্গে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখার হুকুম দিলেন। রাত্রিবেলা ওকে অবিশ্যি খানিকটা স্বাধীনতা দেওয়া হতো—তবে তখন খুঁটি থেকে শেকলটা খুলে দিলেও, সেটা ওর গোড়ালিতে বাঁধা থাকতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও চাম্পুন পালাবার চেষ্টা করছে দেখে ওর বাবা ওর এক বিমাতাকে হুকুম দিয়ে রাখলেন, প্রতি রাতে ঘুমোতে যাবার আগে সে যেন চাম্পুনের দেহ থেকে সমস্ত পোশাক খুলে নেয়। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, এই শেষ পন্থাটা নির্ঘাত অন্যগুলোর চাইতে বেশি কার্যকর হবে। তিনি শপথ করেছিলেন, বাপ-বেটির এই দ্বন্দ্বে একজন ধ্বংস হয়ে গেলেও তিনি নিজের জায়গা থেকে একচুলও নড়বেন না।

'তবু একদিন সকালে দেখা গেলো, চাম্পুনের ঘরটা শূন্য। ঘরের ছাদে কাচের ঢাকনাটা সরানো। আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো, সম্ভবত বিছানার চাদরটা গায়ে জড়িয়েই চাম্পুন ওখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

'চাম্পুন ওর প্রেমিক নই আমন্নয়ের কাছে পালিয়ে গিয়েছিলো। আমার বাড়িতে এসে পৌছনোর জন্যে না জানি কতো কষ্ট, কতো বিপদ পেরিয়ে আসতে হয়েছিলো ওকে!

'চাম্পুন নিশ্চয়ই শেকলের খোলা প্রান্তটা ওর কোমরে জড়িয়ে নিয়েছিলো। নিশ্চয়ই আলমারির মাথায় উঠে ছাদের ফাঁকা অংশটা দুহাতে আঁকড়ে ধরেছিলো ও—তারপর পায়ের ধাক্কায় নিজেকে ওপরের দিকে ঠেলে দিয়ে, হাতের ওপরে শরীরের ভর রেখে বেরিয়ে এসেছিলো বাইরে। ও স্বাস্থ্যবতী, চেহারাটাও শক্ত-সমর্থ। এভাবে মুক্তি পেতে ওকে নিশ্চয়ই খুব একটা কষ্ট করতে হয়নি।

'কিন্তু কিভাবে ও আমার বাড়ির পথ খুঁজে নিলো, সেটাই এক অলৌকিক বিস্ময়। কুমির-কণ্টকিত ওই নদীটাই বা কি করে পার হলো ও? কেউই এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। সবাই ধরে নিলো, বিছানার চাদরটা ও নিশ্চয়ই পোশাক হিসেবে ব্যবহার করেছিলো এবং সম্ভবত নদীর স্রোতেই সেটা ভেসে গিয়েছিলো কোথাও।

'তার মানে সেদিন আমার শোবার ঘরের দোরগোড়ায় আমি যাকে দেখেছিলাম, সে সত্যিই চাম্পুন। আমি স্থিরনিশ্চিত, ও সত্যিই ওখানে গিয়েছিলো। খোলা দরজাটাতেই প্রমাণ হয়, ওটা কোনো অলীক দৃশ্য ছিলো না। আমি এক ছুটে বারান্দায়

বেরিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিলো। সেখানে ওর কোনো চিহ্নই ছিলো না তখন। আমি নদীর ধার অব্দি ছুটে গিয়েছিলাম, সকাল অব্দি মরিয়া হয়ে পাগলের মতো ওকে খুঁজেছিলাম। তারপর বুঝতে পেরেছিলাম, ও ইচ্ছে করেই নিজেকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ওই সামান্য সময়ের মধ্যে ওর পক্ষে তেমন দূরে চলে যাওয়া সম্ভব নয় যে ও সেখান থেকে আমার ডাক শুনতে পাবে না।

'সামান্য সময়ের মধ্যেই বোধবুদ্ধি ফিরে পেয়ে আমি ছুতোরদের ডেরায় ছুটে গেলাম। তারপর জনা বিশেক লোক যোগাড় করে তাদের হুকুম দিলাম, যাতে নদীর ধারে ইতস্তত ছড়িয়ে গিয়ে তারা চাম্পুনের কোনো চিহ্ন খুঁজে বের করতে পারে। অন্ধকার নেমে আসা অব্দি আমি তন্নতন্ন করে তাদের দিয়ে জায়গাটা খোঁজালাম, বাড়িতে ফিরলাম সূর্যাস্তের পরে।

'বাংলোতে না থেকে আমি সেদিনই সোজা তাইমুয়াং-এ রওনা হয়ে গেলাম। নিজেকে বললাম, চাম্পুন নিরাপদে বাড়িতেই আছে এবং এই খবরটুকু জানার জন্যে আমি প্রয়োজন হলে তাওকি মুনের পায়ে চুমু খেতেও রাজি।

'তাইমুয়াং-এ পৌঁছে আমার চরের মুখে খবর পেলাম, চাম্পুন বাড়িতে নেই। তা সত্ত্বেও আমি একেবারে সুনিশ্চিত হতে চাইছিলাম, তাই সোজা চাম্পুনের বাবার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। শত হলেও চাম্পুন আমাদের দুজনেরই প্রিয় এবং আমরা পরস্পরকে যতো ঘৃণাই করি না কেন, ওর শুভাশুভই আমাদের কাছে সব চাইতে বড়ো কথা। কিন্তু ওই হতচ্ছাড়া চীনেটা একটা সত্যিকারের পশু। আমার মুখের ওপরে হেসে উঠে সে জানালো, চাম্পুন যদি বাড়িতে ফিরে আমার মতো বেহায়া হয় তাহলে সে ওকে পিটিয়েই মেরে ফেলবে এবং তারপর একটা শবাধারে পুরে ওর লাশটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

'বাড়িতে ফিরে গিয়ে আমি ফের জনা তিরিশেক লোক সংগ্রহ করলাম। তারপর তাদের দু দলে ভাগ করে নদীর দুই তীর ধরে ফের চাম্পুনের সন্ধানে পাঠালাম। নদীপথ ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই ওর পক্ষে নদী পার হওয়া সম্ভব নয়। মনে হলো, হয়তো নদীর সঙ্কীর্ণ অংশটা দিয়েই ও নদী পেরিয়েছে। একটা নৌকোয় চেপে নদীপথ ধরে আমি ওই দুটো অনুসন্ধানকারী দলকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

'গত চব্বিশ ঘণ্টা আমি শুধু হেঁটেছি কিংবা ছুটেছি। চার-পাঁচ চুমুক ব্র্যাণ্ডি ছাড়া অন্য কিছু খেয়েছি বলেও মনে পড়ে না। মাঝখানে নিশ্চয়ই একটু ঝিমুনি এসে গিয়েছিলো। হঠাৎ নৌকোর হালটা সজোরে নদীর কূলে ধাক্কা

খেয়ে ঠেকে যাওয়ায় চমক খেয়ে ঘুমটা ভেঙে গেলো। কি হলো জিগেস করায় একটা মাঝি আঙুল তুলে যেন কি একটা জিনিস আমাকে দেখালো।

'কুমির কিভাবে মানুষ খায়, জানেন ?'

বললাম, 'না।'

'কুমির—তা সে যতোই বড়োই হোক না কেন—একবারে একটা মানুষের শরীর গিলে ফেলতে পারে না। আবার মুখটা বড়ো হলেও, ওরা মাংস কেটে কেটে খুবলে খুবলেও খেতে পারে না। পাগুলো ভীষণ ছোটো ছোটো বলে সেগুলো শিকারের দেহটা চেপে ধরে মাংস ছেঁড়ার কাজে কোনো সাহায্য করতে পারে না। কাজেই খাওয়ার জন্যে লাশটাকে ওরা সর্বদা ডাঙায় নিয়ে তোলে। তারপর লাশটার একটা অংশ মুখে কামড়ে রেখে, সেটাকে কোনো গাছের সঙ্গে ধাক্কা মারতে থাকে। এইভাবে গুঁতো খেয়ে খেয়ে লাশটা থেকে যে অংশটা ঠিকরে বেরিয়ে যায়, কুমির সেটাকে খেয়ে নেয়। যতোক্ষণ পুরো জিনিসটা খণ্ড-বিখণ্ড না হচ্ছে, ততোক্ষণ কুমির সেটাকে গুঁতো মারে আর খায়।'

এই পর্যন্ত বলে রোগী কথা বন্ধ করে দিলো, শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো দূরের দিকে। এক অস্বস্তিকর নীরবতায় বিচলিত হয়ে আমি চড়া গলায় জিগেস করলাম, 'মাঝি-মাল্লারা চাম্পুনকে খুঁজে পেয়েছিলো কি ?'

'না,' রোগী জবাব দিলো, 'ওরা যা পেয়েছিলো তা হচ্ছে, শেকল জড়ানো একটা মানুষের পা…হাঁটু থেকে বিচ্ছিন্ন। একটা গাছের নিচু ডালে ওটা ঠেকে ছিলো…

'আচ্ছা স্যার, আপনি কি আমাকে বলতে পারেন—কুমির যাতে ওকে খেয়ে নেয় সেজন্যে চাম্পুন কি ইচ্ছে করেই নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলো ? না কি ও সাঁতার কেটে বাবার কাছে ফিরে যাবার চেষ্টা করেছিলো—স্বীকার করতে চেয়েছিলো, ও ভুল মানুষকে ভালোবেসেছিলো ?'

অনুবাদ / দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নায়েমা

মোহাম্মদ দিব

আলজেরিয়ার অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার মোহাম্মদ দিবের জন্ম ১৯২০ সালে মরক্কো-আলজেরিয়ার সীমান্ত-শহর তলেসনে। জীবনে শিক্ষকতা, গালিচে-শ্রমিক, রেলকর্মী, সাংবাদিকতা প্রভৃতি নানা ধরনের কাজ করেন এবং এই বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতাকে গল্প-উপন্যাসে নিপুণভাবে কাজে লাগান। দীর্ঘকাল ফ্রান্সেও অতিবাহিত করেন। বৈপ্লবিক চেতনা ও সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর মমতাই তাঁর সাহিত্যের সব চাইতে বড় বৈশিষ্ট্য। 'লা গ্র াদ' মেসন,' 'লিনসেন্দি' এবং 'লে মোতিয়ার এ তিসার' তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা এবং 'রক্ষাকবচ' তাঁর আর একটি অসাধারণ গল্প।

পাঁচ সপ্তা কেটে গেছে, তবু নায়েমার কোনো খবর নেই। সামান্যতমও কোনো আভাস নেই। অনেকের ধারণা ওকে বেদো সেনাছাউনিতে বন্দী করে রাখা হয়েছে। বেদো সেনাছাউনিতে বন্দীদের সাধারণত মুক্তি-পণ হিসেবেই জামিনের জন্যে আটকে রাখা হয়। ফলে বন্দীদের কপালে যা ঘটে, সে সম্পর্কে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব কথা শোনা যায়।

কতটা সত্যি কে জানে? না, সঠিক কিছু জানার কোনো উপায় নেই, কেননা সেখান থেকে কেউ আজ পর্যন্ত ঘরে ফিরে আসেনি। দ্যাখো ধৈর্য ধরে, যদি কোনো ফাঁকফোকর দিয়ে নায়েমার খবর পাওয়া যায়। হয়তো কানো মন্ত্রবলে শোনা যাবে ওকে বিচারের জন্যে হাজির করা হয়েছে। অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আমাদের আর অন্য কোনো উপায় নেই।

বাচ্চাগুলোকে আমি প্রায়ই পার্কে নিয়ে যাই। ওটাকে আমরা বলি 'খুদে বাগিচা'। সেখানে বিকেলের খানিকটা সময় কাটিয়ে আসি। শরতের ছোঁয়া লাগে পত্রপল্লবে, আকাশের নীলে মিশে থাকে তাদের পিঙ্গল জাফরানী আভা। বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব হয় না। সন্ধের আগেই সবাই বাগিচা ছেড়ে চলে যায়, তার পরে থাকাটা বিপজ্জনক। তবু, বাচ্চারা ওখানে থাকতেই বেশি ভালোবাসে। আমিও একমাত্র ওখানেই একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। এ যুদ্ধে আমাদের সবার অবস্থা হবে একই রকম।

তবু কেউ যদি নিরাপদে ফিরে আসতে পারে, জীবনে অনেক কিছু শিখতে পারবে। সাত বছরের ছেলে রহিম, যুদ্ধের তিনটে বছর কাটিয়েছে এরই মধ্যে।

নির্বাক জিজ্ঞাসা নিয়ে ও এমন গম্ভীরভাবে আমার দিকে তাকায় যে নিজেরই বড় অস্বস্তি লাগে, কেমন যেন অপরাধী-অপরাধী মনে হয়।

কয়েক দিন আগে আমি ওকে জিগেস করেছিলাম ও অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে কেন।

ও বলেছিলো, 'আচ্ছা বাজান, হাতবোমা ছোঁড়ার সময় মিছিমিছি সময় নষ্ট করা উচিত ?'

প্রশ্ন শুনে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠেছিলো। কি বলবো ওকে ? বানিয়ে বলবো, ওসব ভাঁওতাবাজি এখন আর চলে না, রহিমের কাছেও না। 'আক্রমণ', 'খুন', 'ওত পাতা' প্রভৃতি শব্দ সারাক্ষণই ওর ভাবনার মধ্যে আনাগোনা করে। আমি ওকে আর সতর্ক হতে শেখাই না। শেখালেও ও বুঝবে না। দুজনের ভাবনার মধ্যে কোথায় যেন একটা চিড় ধরেছে।

আর একদিন, কোনো কিছু না ভেবে, এমনিই হাসতে হাসতে জিগেস করে-ছিলাম, 'এখন কি করা উচিত বলে তোর মনে হয় বল তো ?'

'বোমা মেরে সবকটাকে খতম করে দেওয়া।'

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা না করে ও ঝটপট জবাব দিয়েছিলো, নিষ্পাপ চোখে তখনও তাকিয়ে ছিলো আমার দিকে।

'তুই লোকের জান নিবি ?'

'নিশ্চয়ই। তুমি নেবে না ?'

আমি ছোট্ট করে জবাব দিয়েছিলাম, 'না।'

ওর বিস্ময়ভরা সেই চোখের দৃষ্টি এখনও আমি স্পষ্ট দেখতে পাই।

অন্যান্য বাসিন্দারা এখন আর নায়েমার কথা তেমন করে উল্লেখ করে না। যেহেতু ও এখন বন্দী, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি বাচ্চাদের কাছে মায়ের ভূমিকটাও পালন করতে। অন্য ফ্ল্যাটের মেয়েরা এসে রান্নাবান্না, ধোয়ামোছা, কাচাকুচি ইত্যাদি সংসারের অধিকাংশ কাজই করে দিয়ে যায়। ওরা নিজেরাই এসব কাজের ভার নিয়েছে। কোনো পুরুষমানুষ এসব কাজ করুক সেটা ওদের আদৌ পছন্দ নয়। আমি না থাকলে ওরা অনেক সময় বেনালি, জাহিয়া আর রহিমকে খাইয়েও দিয়ে যায়। বোরখা-পরা এক মহিলা লিবারেশন ফ্রন্ট থেকে নিয়মিত ভাতার টাকাটা এনে আমার হাতে দিয়ে যান। উনি কখনও ঘুঙুট তোলেন নি, ফলে ভদ্রমহিলা যে কে তা কেউ জানে না। তাছাড়া ওঁকে আজেবাজে প্রশ্ন করতেও কারুর সাহসে কুলোয় না।

সারাক্ষণই চাপা উত্তেজনায় বাড়িটা থমথম করে। তখনও নিশাস্তিকা, মন্দ-

মধুর হিমেল একটা দিন সবে শুরু হচ্ছে, অথচ এরই মধ্যে সারাটাবাড়ি ভরে উঠেছে ভয়-জাগানো নানান কণ্ঠস্বরে। ভাগ্য ভালো যে ওটা কেবল একটা নকল বিপদ-সংকেত। এই ধরনের স্নায়বিক উত্তেজনার আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ এখানে প্রায়ই ঘটে এবং সেটা চরমে পৌঁছোয় বোমা-বিস্ফোরণের ঠিক পরেই। সেই রকম কোনো ঘটনায়, সাধারণত বাইরে থেকেই কেউ প্রথম খবরটা নিয়ে আসে, চেঁচিয়ে সবাইকে জানায়, সবাই তখন নিচের উঠোনে ছুটে এসে নিজের নিজের মন্তব্য জুড়ে দিয়ে খবরটা প্রচার করে। আজ ভোরে অবশ্য তেমন কিছু ঘটেনি, তবে দিনটার এই তো সবে শুরু।

এই সব উতরোলের মধ্যে নায়েমার কথাই আমার কেবল মনে পড়ে। ও এখন কোথায়, ওকে নিয়ে ওরা কি করছে, কিছুই জানি না বলে মনটা যন্ত্রণায় ছটফট করে। শহরে প্রতিদিনই এত লোক নিখোঁজ হচ্ছে, মরছে, এত লোককে কবর দেওয়া হচ্ছে যে কেউ আর বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। আজকের ঘটনা একটা দিনের ব্যবধানেই মন থেকে মুছে যায়।

যাদের গুলি করে মারা হয়েছে শহরের সর্বত্রই সাঁটা রয়েছে তাদের ছবি। প্রতিদিনই আদালত থেকে জারি করা হচ্ছে মৃত্যু-পরোয়ানা। প্রাণদণ্ডের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে, প্রতিদিন ভোরের আলোয় দেখা যাচ্ছে হাত-পা কাটা মৃত-দেহগুলোকে পড়ে থাকতে। অধিকাংশ প্রতিবেশীর ধারণা নায়েমা আর ফিরে আসবে না। সাহস করে ওরা আমাকে বলে না বটে, কিন্তু ওদের মুখ দেখলেই আমি সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারি।

গতকাল অচেনা দুজন লোক রাস্তায় আমাকে থামিয়ে দর্জির দোকানটার ওপর নজর রাখতে বলেছিলো। ওরা চলে যাবার পর দর্জি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আমাকে বলেছিলো, 'হাঁ, ওরা এখানে কি যেন একটা রেখে গ্যাছে।'

'তার মানে ?'

দর্জি ছোট্ট করে শুধু বলেছিলো, 'বোঝো তো সবই।'

হ্যাঁ, বুঝেছিলাম। এবং এটাও বুঝতে কোনো অসুবিধে হয়নি যে বিপদের মুখে এবার আমাকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

বিকেলে রাস্তা পেরিয়ে সক্এল-গেজেল চকের দিকে যাবার সময়েই ঘটনাটা ঘটলো। এ তল্লাটে সব সময় ভিড়ভাট্টা লেগেই থাকে। প্রথমে ভিড়টা একটু থমকে পেছু হটে এলো, তারপরেই শোনা গেলো চিৎকার-চেঁচামেচি। পর পর দুটো গুলির

শব্দ, পরক্ষণেই প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের আওয়াজ। ঠেলাঠেলিতে অনেকেই অনেককে মাড়িয়ে গেলো। চকিতে চকটা ফাঁকা হয়ে গেলো। দেখলাম একটা লোক মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। গ্রেফতার এড়াবার উদ্দেশ্যে আমি সরে এলাম, কেননা বাতাস ফালা-ফালা করে ফেলা পুলিসের বাঁশির তীক্ষ্ণ আওয়াজ আমি আগেই শুনতে পেয়েছিলাম।

পাশের গলিতে একটা মুচির দোকানে আশ্রয় নিলাম।

হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকতে দেখে মুচি বেশ হকচকিয়ে গেলো। 'কি ব্যাপার, কি হয়েছে? নতুন কিছু ঘটলো নাকি?'

দম নেবার জন্যে একটু থেমে বললাম, 'নতুন বলতে সক-এল-গেজেলে একজন খুন হয়েছে।'

'ও!' ওর শীর্ণ লম্বাটে মুখে ফুটে উঠলো ম্লান একটা হাসির রেখা। 'আমি ভাবলুম আপনি বুঝি শান্তির খবর নিয়ে এসেছেন।'

'শান্তি?' চাপা স্বরে আমি বললাম। 'এই শব্দটা কেউ কখনও শুনেছে নাকি!'

স্পষ্ট মনে আছে, কথাটা শেষ করে সবে মনের ভয়টাকে ঢোকার জন্যে যখন বোকার মতো একটু হেসেছি, তখনই আরও দুটো বিস্ফোরণে গলিটা থর থর করে কেঁপে উঠলো। খুব কাছেই শোনা গেলো ভয়ার্ত চিৎকার আর সেই সঙ্গে এক ঝাঁক গুলির শব্দ। আমাদের চোখের সামনে কয়েকটা মূর্তি হঠাৎ দ্বিগুণ বেঁকে মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে।

সাব-মেশিনগানের একটানা আওয়াজ আরও কাছে এগিয়ে এলো। মুচিকে বললাম দোকানের কপাটটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কোনো কথা না বলে ও দরজায় খিল তুলে দিলো, আমরা দুজনেই মেঝেতে পড়ে রইলাম।

কানে তালা লাগানো আওয়াজ গলিটাকে যেন ঝাঁট দিয়ে গেলো। তেমন মারাত্মক ভয় পেয়েছিলাম বলে মনে হয় না। বরং বেশ শান্ত, সংযতই ছিলাম, শুধু এর পর কি ঘটবে জানার কৌতুহলটাই ছিলো অদম্য। মন্থর পায়ে এগিয়ে চলেছে সময়।

হঠাৎ দরজায় হাতুড়ি পেটানোর শব্দ শোনা গেলো, যেন কেউ ওটাকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে। মুচির ইচ্ছে দরজাটা খোলে, অনুসন্ধিৎসু চোখে ও তাকালো আমার দিকে। ইশারায় ওকে নড়তে নিষেধ করলাম। দরজায় আঘাতের শব্দ আরও ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে উঠলো, ওরা আরও হিংস্র আরও মরিয়া হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে একজন সৈন্য ভেতরে ঢুকলো। কোনোদিকে না তাকিয়ে

সে মুচির ঘাড় ধরে সোজা টেনে নিয়ে গেলো। চৌকাঠের সামনে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে ওর বুকে এমন জোরে আঘাত করলো যে মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরুতে লাগলো, রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে রইলো সারাক্ষণ। লক্ষ্য করলাম মাথার ওপরে একটা তাক রয়েছে। ওটার ওপর উঠে ঘাপটি মেরে রইলাম। সৈন্যরা অবশ্য আর ফিরে আসেনি।

আবছা আঁধারে গোটানো চামড়ার সঙ্গে প্রায় মিশে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। তক্তার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি গলির এককালি অংশ। দোকানের ভেতরে ঘনিয়ে উঠছে সায়ান্ধকার। আমি চুপটি করে পড়ে রয়েছি, লক্ষ্য রাখছি সতর্ক দৃষ্টিতে, নাকে আসছে চামড়ার দুর্গন্ধ, কেটে যাচ্ছে মুহূর্তগুলো।

গোলমালের অবস্থা অনেকটা শান্ত হয়েছে, শুধু দূরে শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট কিছু গোলাগুলির শব্দ। উঠে গা হাত-পা ঝাড়লাম। ভাঙা দরজা দিয়ে বাইরে বেরুনোর সময় মুচির দেহটাকে ডিঙিয়ে যেতে হলো। জনমানবহীন আশ্চর্য নির্জন একটা পথ ধরে আমি এগিয়ে চললাম।

মরার জন্যে আমরা প্রস্তুত, কিন্তু কিভাবে এই জীবনটাকে ছাড়তে হয় কেউ এখনও শেখায়নি। সেই রাতে আমার যা কিছু ভাবনা, শহরের অলিগলি, যুদ্ধ— সবই নৈঃশব্দ্যে ভরা। উঠে বসে আমি চারদিকে তাকালাম, সবকিছুই কেমন যেন অবাস্তব মনে হচ্ছে। বাচ্চারা ঘুমোচ্ছে। কিন্তু ওরা এখানে কেন? এই শহরে ওদের অস্তিত্বের মূল্যই বা কতটুকু? হঠাৎ ইচ্ছে হলো উঠে পোশাক পাল্টাই, সান্ধ্য-আইন সত্ত্বেও ছুটে বেরিয়ে পড়ি পুরনো শহরটার দিকে। ফের ঘুম আসতে বেশ সময় লাগলো, ঘুমিয়ে পড়ার পরেও মনে হলো উত্তাল উর্মিমালায় মাথাটা কেবলই পাক খাচ্ছে।

আকাশে আলো ফুটতে না ফুটতেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। নানান কাজে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে লোকজনের ব্যস্ততা, ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঘন্টি বাজিয়ে সাইকেল-আরোহীরা যাওয়া-আসা করছে, ফেরিওয়ালাদের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে পাশ-পথে। সক-এল-গেজেল চকে শুধু সেই সব দোকানগুলো বন্ধ যাদের মালিকরা খুন হয়েছে। দেওয়াল আর পাল্লাগুলো বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। রাস্তাময় ছড়িয়ে রয়েছে ভাঙা কাঁচ আর ইটের টুকরো।

আমি মুচির দোকানটায় পৌঁছে গেলাম।

বন্ধ। অথচ গতকাল আমি খুলে রেখে গিয়েছিলাম। এখন দেখছি রাস্তার ওপর দরজাটায় একটা তালাও ঝুলছে। তালাটার দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। মুচির কি হলো? আমি যতটুকু জানি তার চাইতে বেশি কিছু খবরের আশায় আশে-

পাশের দু-একজন দোকানদারের সঙ্গে দেখা করলাম। কিন্তু ওদের কাছ থেকে একটা কথাও বার করতে পারলাম না, শুধু এইটুকু জানতে পারলাম শবানুগমন হবে না। আত্মীয়-স্বজনদের খবর না দিয়ে রাত্তিরেই সমস্ত মৃতদেহ তুলে নিয়ে গিয়ে সরকারী-ভাবে গোর দেওয়া হয়েছে।

গলি থেকে বেরিয়ে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে খানিকক্ষণ ঘুরলাম। এমন সুন্দর রোদ-ঝলমলে একটা দিন, অথচ আমার সঙ্গে যেন তার কোনো আত্মিক সম্পর্ক নেই। আমাকে ভাবতে হবে। অথচ উদ্বেলিত আকাশ, সুগন্ধ জড়ানো বাতাস আর অনেক কিছুরই স্নিগ্ধ সৌরভ আমাকে ভাবার কোনো অবকাশই দিচ্ছে না।

দীর্ঘক্ষণ আমি ঘুরে বেড়ালাম। হঠাৎ অনুভব করতে পারলাম সবকিছুতেই মিশে রয়েছে রক্তের গন্ধ আর স্বাদ।

আবার রাত এলো, আবার ঘুম গেলো ভেঙে। আমি কান পেতে শুনলাম। দূরের বাড়িগুলো থেকে ভেসে আসছে চিৎকার-চেঁচামেচি আর আর্তনাদ। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে সেই ভয়চকিত রলোরোল। শোনা যাচ্ছে বাতাসে সাঁই সাঁই গুলির শব্দ, সেই সঙ্গে সাব-মেশিনগানের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। শ্বাস রুদ্ধ করে আমি চুপচাপ পড়ে রইলাম। শুনতে পেলাম ভয় আর যন্ত্রণায় মেশা নারী-পুরুষের আর্তস্বর। পরক্ষণেই আবার সবকিছু নিশ্চুপ। আমি চোখ বন্ধ করলাম। অ্যাপোক্যালিপ্সের জন্তুজানোয়ারগুলো চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দূরে শোনা গেলো মোটরের গর্জন, একটু পরে তাও মিলিয়ে গেলো।

ভোর হলো। আলোয় ঝলমল করছে নীল আকাশ। যারা পথে বেরুলো, সবারই মনে উদ্বেগের ছায়া।

কাটাছেঁড়া বিকৃত মৃতদেহগুলোকে জড়ো করে রাখা হয়েছে শহর-তোরণের সামনে। বারোজনের মধ্যে তিনজন মহিলা।

যুদ্ধ চলছে, হয়তো আরও কয়েক বছর ধরে চলবে। বিস্ফোরণ আর গোলাগুলির আওয়াজ ছাড়া জীবনটা যে কি রকম তা আজ আর কেউ কল্পনাও করতে পারে না। চারদিকেই শোনা যায় ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব খবরের কানাকানি। পথ চলতে গিয়ে বারবার পেছন ফিরে তাকানো, কিংবা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে সটান মাটিতে শুয়ে পড়াটা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। সন্দেহের সামান্যতম কোনো ইঙ্গিতেই আমি সতর্ক হয়ে উঠি, কি ঘটতে পারে দেখার জন্যে আদৌ অপেক্ষা করি না। একবার ঘর থেকে বেরুলে জীবন নিয়ে ফেরা সম্ভব কি না কেউ বলতে পারে না।

বাজার, চত্বর আর চৌমাথা, বিশেষ করে দাঙ্গা-দমনকারী সৈন্যরা যেসব জায়গায় টহল দিয়ে ফেরে, সেগুলো এখন আমি সযত্নে এড়িয়ে চলি, যেমন এড়িয়ে চলি কাঁটা-তারের বেড়া দেওয়া পথ আর গলিগুলো। গোলমালের সময় ওসব জায়গা আদৌ নিরাপদ নয়, যে কোনো সময় ফাঁদে পড়ে যেতে পারি।

হাত পা বাঁধা অবস্থায় আমরা যখন কসাইগুলোর দয়ার ওপর নির্ভর করে পড়ে রয়েছি, প্রকৃত লড়াই চলছে তখন অন্যখানে। ভেঙে-পড়া আইন-শৃঙ্খলা আর গোল-মালের এই যে প্রাত্যহিক আতঙ্ক, এর বিরুদ্ধেই আমাদের আত্মরক্ষা করতে হচ্ছে। পেছুহটা কিংবা দোদুল্যমানতার জন্যে আমাদের ইতিমধ্যেই যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। আপাতত এখানকার অবস্থা প্রকৃত লড়াইয়ের চাইতে অনেক খারাপ।

মাঝে মাঝে মনে হয় প্রতিদিন এই যে অজস্র দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটছে, এর কোনো একটাতে প্রাণ গেলেই বুঝি বাঁচি। এই রক্তস্নান, কসাইখানার এই দুর্গন্ধ আমাকে আতঙ্কে ভরিয়ে তোলে, দম বন্ধ হয়ে আসার মতো ছটফট করি। পরক্ষণেই আবার বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় আকুল হয়ে উঠি, জানতে ইচ্ছে করে যুদ্ধশেষের চেহারাটা কেমন দাঁড়াবে। তখন মনে হয় এ পৃথিবীর তামাম সৈন্য আর পুলিসী শক্তির বিরুদ্ধে আমিও রুখে দাঁড়াতে পারি।

যুদ্ধের পরে যারা বেঁচে থাকবে তারা কি জীবনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে? শান্তি ফিরে আসার কি অর্থ দাঁড়াবে তাদের কাছে? আমাদের কাছে হারিয়ে গেছে এ পৃথিবীর যাকিছু গন্ধ আর রঙ। ওরা কি আর কখনও ফিরিয়ে আনতে পারবে মানুষের প্রকৃত মুখচ্ছবি?

একটু আগে তিজাউই কাফেতে বসতে না বসতেই টহলদারী এক ঝাঁক আরক্ষী আমাদের ঘিরে ফেললো এবং বাইরের টেবিলে যারা বসেছিলো তাদের সবার সঙ্গে আমাকেও মাথার ওপর হাত তুলিয়ে ভেতরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলো। আমরা গাদা-গাদি করে দাঁড়িয়ে রয়েছি, অপেক্ষা করছি কখন দেহ-তল্লাসির পর পরিচয়পত্রটা পরীক্ষা করে দেখার পালা আসবে। স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের কালো নলগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বোকার মতো একটু নড়লেই খতম। এতটুকুও না দমে আমরা চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে রয়েছি, থমথম করছে এক আশ্চর্য নৈঃশব্দ্য। মনে মনে ভাবলাম, 'না, ওরা আমাদের কিছুতেই কাবু করতে পারবে না।'

এক ঘণ্টা ধরে চললো খানাতল্লাসির পালা। এই এক ঘণ্টায় প্রতিটা মানুষকেই দিতে হলো ধৈর্যের পরীক্ষা। শেষে যখন ছাড়া পেলাম, বাইরে তখন বিপজ্জনক বিকেল। অপমানে আমার গলার ভেতরটা জ্বলছে। সাড়ে চারটেয় সান্ধ্য আইন

শুরু হলেই রাস্তাঘাট সব ফাঁকা হয়ে যাবে। কাফে থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি না গিয়ে ভাবলাম একটু ঘুরবো। বাড়ির সদরগুলো কি যেন এক ভয়ঙ্কর প্রত্যাশায় থমথম করছে। নিঃশব্দে, সতর্ক হয়ে লোকজন চলাফেরা করছে। নিজের ভারে শহরটা যেন বেঁকে গেছে, তার সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে দুঃসময়ের ক্ষতচিহ্ন।

তরুবীথির শেষে, ধূসর আকাশের পটভূমিতে মাথা তুলে দাঁড়ানো মনসুরা পাহাড়ের গাঢ় নীল চূড়াগুলো আমার মনে অফুরান সুখস্বপ্নের ছায়া ফেললো। আহা, এখন এই পার্কটার মধ্যে যদি খানিকক্ষণ কাটাতে পারতাম!

আমার ঘুরে বেড়ানোর আসল উদ্দেশ্য ছিলো প্লাস দ্য ওতেল দ্য ভিল-এ খবরের কাগজ বিক্রির দোকানটায় হানা দেওয়া। দোকানদারের সঙ্গে একটু-আধটু জানা-শোনা থাকায় না কিনে সব কাগজগুলোর ওপরেই একবার চোখ বোলাতে পারি। পড়ে দেখলাম খবরগুলো প্রায় আগের দিনেরই মতো। আবার হাঁটতে শুরু করলাম। জাদুঘরের রেলিং ধরে হাঁটতে হাঁটতে সবে যখন মোড়টায় পৌঁছেছি, তখনই ঘটনাটা ঘটলো। প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দে চারদিকের দেওয়ালগুলো এমন ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠলো যেন দমকা বাতাসের ঝাপটায় আমাকে ছিটকে দিলো, আগুনের হলকা ঝলসে দিলো চোখ-মুখ। পরক্ষণেই শোনা গেলো কাঁচ ভেঙে পড়ার ঝনঝন শব্দ আর চিৎকার-চেঁচামেচি। গাছ দিয়ে ঘেরা পার্কটার চারপাশেই লোকজন ছোটা-ছুটি করছে। আমি সবচেয়ে কাছের গলিটাতে ঢুকে পড়লাম। সেখানেও চিৎকার, আর্তনাদ আর ফরমানে কান পাতা দায়।

খাটো আগ্নেয়াস্ত্রের একঝাঁক গুলি রাস্তাটাকে ঝাঁট দিয়ে গেছে। আমার ঠিক সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লো একটা লোক, তারপরেই একজন মহিলা। দীর্ঘ ওড়নায় জড়িয়ে গেলো ওর দেহটা।

রাস্তাটা জমাট বেঁধে গেছে।

উচ্চকিত শব্দে সাইরেন বাজিয়ে কয়েকটা ফৌজি ট্রাক এসে ভয়ঙ্করভাবে ব্রেক কষলো, লাফিয়ে নামলো একঝাঁক সশস্ত্র সেপাই। ওদের একজন, তুষার-নীল চোখ, ইশারায় আমাকে সরে যেতে বললো। আমি ফিরে চললাম। কিন্তু পরের রাস্তার ঠিক মোড়েই কয়েকজন আরবীয় স্বেচ্ছা-সৈনিক চিৎকার করে আমাকে থামতে বললো।

আমি থামলাম। তারপর সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম ওদেরই দিকে এগিয়ে যাবো। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করছি এই বুঝি গুলি চালাতে শুরু করবে। আমি বেশ শান্ত আর স্থিরই ছিলাম, শুধু ঘৃণায় ভরে উঠেছিলো সারা মন। জোর করে নিজেকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে ভাবলাম, 'গুলি খাওয়া মানুষটাকে পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়তে দেখে ওরা মজা লুটবে, তা আমি কিছুতেই

হতে দেবো না।' ওদের মধ্যে কয়েকজনের মুখ আমি চিনি, দু-একজন আমার সঙ্গে স্কুলেও পড়তো।

'খবরদার নড়বে না!' দলের একজন চিৎকার করে উঠলো।

তবু আমি আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলাম, তারপর হঠাৎই মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠলো। এর পর ঠিক কি ঘটেছিলো আমার মনে নেই। হয়তো ঘাড়ের কাছে আঘাত খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, তারপর ওরা আমাকে টেনে এনেছে এই পার্কটার মধ্যে। এখন দেখলাম অন্য কয়েকজন আলজেরীয় আরবের সঙ্গে আমিও দাঁড়িয়ে রয়েছি, গায়ে বন্দুকের নল ঠেকানো। আহত আর নিহতদের দেহগুলো ছড়ানো রয়েছে চারদিকে। আমাদের ঠিক সামনেই একজন মুমূর্ষু ক্ষীণ স্বরে গোঙাচ্ছে, 'বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!'

তাকে সাহায্যের জন্যে কেউ একটুও নড়লো না। পার্কের মধ্যে এবং রাস্তায় তখনও চলেছে মানুষ-শিকারের তাণ্ডব। কুঁজো হয়ে সঙ্গিন বাগিয়ে উর্দিপরা মূর্তিগুলো অন্য মূর্তিগুলোকে তাড়া করছে। পালাতে গিয়ে কেউ কেউ হঠাৎ ধূসর মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে।

ঠিক তখনই একটা লোক সরাবখানা থেকে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় কাকে যেন দেখিয়ে হাত-পা নেড়ে চিৎকার করতে লাগলো, 'ওই যে, ওই লোকটা! আমি নিজের চোখে ওই লোকটাকে এখানে বোমা রাখতে দেখেছি!'

অন্যরা বিহ্বল বিস্ময়ে জীর্ণ কালো কামিজ গায়ে, ভাঙা একটা ঝুড়ি আঁকড়ে ধরা লোকটার দিকে তাকালো। স্বেচ্ছাসৈনিকদের কয়েকজন দৌড়ে গিয়ে তাকে হিড়হিড় করে টেনে আনলো। লোকটা প্রতিরোধ করার কোনো রকম চেষ্টাই করলো না। পার্কের মাঝখানে টেনে নিয়ে গিয়ে ওরা ওর বুকে পেটে পর পর কয়েকটা গুলি করলো। লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, ভাঙা ঝুড়িটা তখনও আঁকড়ে রয়েছে শক্ত করে।

যে লোকটা ওকে অভিযুক্ত করেছিলো, একজন বই বিক্রেতা, আনন্দের চোটে সে চিৎকার করে উঠলো, 'ন্যায়বিচার দীর্ঘজীবী হোক!'

দেখে যাকে রাজমিস্ত্রির যোগাড়ে বলে মনে হয়েছিলো, পার্কের মাঝখানে পড়ে থাকা ছোটোখাটো চেহারার ওই নিঃস্ব লোকটা, মৃত্যুতে যাকে আরও ছোটো দেখাচ্ছে, নিঃসন্দেহে যার জন্যেই আমরা সবাই বেঁচে গেলাম, ওর মৃত্যু যেন তামাম দুনিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাচ্ছে। আমি ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না, পড়তে পারলাম না ওর নীরব প্রতিবাদের ভাষা।

একটু বাদেই আমাদের ছেড়ে দেওয়া হলো। তুলে নেওয়া হলো ফৌজী-

অবরোধ, লোকজন আবার চলতে শুরু করলো। সাইকেল-আরোহীরা ছুটছে, খদ্দেররা দোকানে ঢুকছে, যারা ভেতরে ছিলো তারা বাইরে বেরিয়ে আসছে। জরাজীর্ণ চেহারার একজন ভিখিরি করুণ স্বরে চেঁচাচ্ছে, একজন ফেরিওয়ালা তার গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলেছে। আতঙ্কের ভাবটা কেটে গেছে, শুধু বাতাসে জড়িয়ে রয়েছে রক্তের হালকা একটা গন্ধ। হালকা হলেও মন-মেজাজ আর সব-কিছুর ওপরেই তা ভারি হয়ে চেপে বসেছে। বাড়ির পথে আমি সোজা হেঁটে চললাম।

সেই উৎকণ্ঠা, সেই উন্মত্ততা, সেই একই হাঁ-মুখ অতল গহ্বর আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে রেখেছে।

পরের দিন সকালে দেখা গেল পুরনো নগর-আঙিনার চত্বরে কুড়িটা মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। অন্য অনেকের মতো আমিও ছুটলাম দেখতে। রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে মৃত মানুষের জলজলে চোখগুলো তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে।

যাতে কেউ চত্বরের ভেতর ঢুকতে না পারে তার জন্যে সৈন্যরা সব প্রবেশপথ-গুলোই আগলে রেখেছে। আর এগোনো গেলো না। আমি নানান ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঢুঁ মারলাম।

হঠাৎ ভারি অদ্ভুত ধরনের একটা মিছিলকে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো, যা এর আগে কেউ কখনও কল্পনাও করেনি। মিছিলটা শুধুমাত্র শিশু আর অবগুণ্ঠনহীন আরব মহিলাদের। উত্তাল স্রোতের মতো ওরা এগিয়ে আসছে, মুখে মুক্তিসংগ্রামের গান। হিংসা, ক্রোধ, যন্ত্রণা, না প্রতিরোধ—কোন্ দুর্বার শক্তি এইসব খালি-পা শিশু আর মহিলাদের উদ্ধত মেশিনগানের সামনে তাড়িয়ে এনেছে বলা মুশকিল। কাঠির সঙ্গে বাঁধা, পুরনো কাপড় ছিঁড়ে বানানো সাদা আর সবুজ নিশানগুলো উড়ছে মাথার ওপরে। ভাড়াটে সৈন্যরা চত্বরটাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ালো। বেষ্টনী ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার সময় মেয়েদের ধাক্কায় অনেক ফৌজী টুপিই মাটিতে খসে পড়লো।

সেই মুহূর্তে গর্জে উঠলো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলো। চোখের সামনে দুলে উঠলো সব-কিছু। আমরা যারা এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রুক্ষ গলায় আকাশ-কাঁপানো ওদের গান শুনছিলাম, ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে ওদের সঙ্গে গান গাই, আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ওদের সেই একই মৃত্যু আর রক্তের ঘূর্ণিস্রোতে মিশে যাই।

আমাদের ওপর শুরু হলো বুলেট বৃষ্টি। সবাই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে এ ওকে মাড়িয়ে যাচ্ছে, হাঁটু ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে অনেকেই।

নিশুত রাত। হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো নৈঃশব্দ্য। দূর থেকে ভেসে আসছে গোলাগুলির আওয়াজ। আগুনের ঝলকে নানান যতিচিহ্ন ফুটে উঠছে অন্ধকারের বুকে। দুধারের বাড়িগুলোকে কাঁপিয়ে ছুটে যাচ্ছে অর্ধেক-খালি ট্রাকগুলো। তারপর সব নিশ্চুপ। আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। রাত্রির বুকে নৈঃশব্দ্য গড়ে তুলছে অন্য এক দেওয়াল।

দুধের ফেনার মতো তাজা ভোর এলো, ছড়িয়ে পড়লো আলোর সমুদ্র। সিকা-তারা মুখর হয়ে উঠেছে তাদের গানের সুরে। ঝাঁকে ঝাঁকে বাচ্চারা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়।

আজ উদ্দাম একটা আশা আমাকে উজ্জীবিত করে তুলেছে। সমস্ত দুর্যোগ সত্ত্বেও, বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই কি এই আশার জন্ম! বিশ্বাস করি বা না করি, শপথ করেই বলতে পারি—আগামী কালই আসবে সেই নিরাপত্তা, শান্তি আর বিজয়-উৎসবের দিন! শয্যা থেকে নিজেকে টেনে তুললাম। দীপ্তিবিচ্ছুরিত এই যে হিম্মত, একে আমি সঞ্জীবিত করে রাখবো নিজের মধ্যে—না, একে আমি বিলিয়ে দেবো অন্যকে সাহস দেবার জন্যে।

এদিকে গাঁ উজাড় করে উদ্বাস্তুরা আসতে শুরু করেছে। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, গায়ে তাদের মাটির গন্ধ, নিঃশ্বাসে ভয় আর চোখের চাউনিতে বোবা ক্রোধ। আমি শহরের চারপাশে যে ক্ষেত-খামারগুলোর শান্তির কথা ভাবছি, সেই শান্তির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে কত না আশঙ্কা! এমন কি নিশ্চুপ গাছগুলো, যাদের বিবর্ণ পত্রপল্লব স্বাদ পেয়েছে অদৃশ্য অগ্নিশিখার, তারাও কি যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে।

কিন্তু দোরগোড়ায় কিংবা উঠোনে মেয়েদের জটলা করতে দেখে, তাদের গলা শুনে আমার কেমন যেন অদ্ভুত ধারণা হয়—কিছুই পালটায়নি, কখনও পালটাবেও না। ঠিক এমনিভাবেই বিরাজ করবে সুন্দর মরসুমের দিন। কুয়াশা বা বৃষ্টি তাকে কখনও নষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু কি অর্থহীনই না এই সুন্দর মরসুম!

আমি এখনও মুক্ত এবং বেঁচে আছি। কিন্তু রোজই অবাক হয়ে ভাবি কি এমন করেছি যার জন্যে এই পুরস্কার, আর এতে লাভটাই বা কি! প্রতিনিয়তই গোলাগুলির শব্দে আমার নায়েমার কথা মনে পড়ে যায়, পরক্ষণেই আবার ভাবি যেকোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটার কথা। রাত্তিরে আঁধারের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আমি যখন শুয়ে থাকি আর কান পেতে শুনি শহর থেকে আসা সামান্যতমও শব্দ, তখনই আমার নায়েমার কথা মনে পড়ে যায়। বিশেষ করে ভোরে, বাচ্চারা যখন জেগে ওঠে, তখনই ওর উপস্থিতির প্রয়োজন সব চাইতে বেশি করে মনে হয়। মনের মধ্যে

যে সুতীব্র ব্যথা নিয়ে আমি রাত্তিরে শুতে যাই, ভোরে ওঠার সময়েও তা আমাকে কিছুতেই ছেড়ে যায় না, নইলে এই উজ্জ্বল নীল ভোর, যা প্রায় শীতের দিনের সকালেরই মতো, পৃথিবীর সঙ্গে আমার নিশ্চয়ই মিলন ঘটিয়ে দিতে পারতো।

যদিও এই প্রতীক্ষার অর্থ যা অবশ্যম্ভাবী তাকেই প্রায় স্বীকার করে নেওয়া, তবু মনে হয় জীবন যেন একটা বিবশ দুঃস্বপ্নের মতো। ধীরে ধীরে আমিও ভাবতে শুরু করেছি নায়েমার সঙ্গে আর দেখা হবে না, ও আর কখনও ফিরে আসবে না, এই ঘরটাতে ও আর কখনও ঘুরে বেড়াবে না। তবু আমি টিঁকে থাকি, কান পেতে শুনি এ বাড়ির প্রতিটা শব্দ আর কণ্ঠস্বর, আড়িপাতি পড়শিদের কথায়।

কয়েকদিন খুব ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ঘুচে গেছে শরতের চাকচিক্য, দেখা দিয়েছে ধূসর মরসুমের দিন। গাছগুলো পরস্পরে জড়াজড়ি করে রয়েছে, বিশীর্ণ ডালপালার ওপর ঘনিয়ে উঠেছে কালো মেঘ। এমন কি আমার হতাশা আর উদাসীনতা সত্ত্বেও, এই ঋতু পরিবর্তনে আমি খুশি হলাম। নির্মল, উজ্জ্বল আলোয় স্নাত শরতের শেষ দিনগুলো আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিলো।

তারপর শুরু হলো বর্ষা—সত্যিকারের মুক্তি। বেশ কয়েকদিন ধরে চললো অবিরাম, পরিব্যাপ্ত ধারাপাত। শুকনো মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে চললো জলস্রোত। রাস্তার দাঙ্গাহাঙ্গামা আপাতত স্থগিত।

এই দিনলিপির পাতা যখন উলটে চলেছি, তখনও বৃষ্টি ঝরছে, মনে হচ্ছে সেই যে শুরু হয়েছে আর কখনও থামবে না। এরই মধ্যে বেশ কয়েক দিন আর সপ্তাহ ধরে বৃষ্টিতে ভিজে শহরের জঙ্গল ভেঙে অজস্র বাড়ির দরজায় দরজায় কড়া নেড়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি আমার বিবির খোঁজ নেবার, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। এখনও মেঘলা আকাশ থেকে অঝরে বৃষ্টি পড়ছে নেড়া গাছ আর কালো হয়ে থাকা বাড়িগুলোর মাথায়। নিচু হয়ে নেমে আসা সেই একই আকাশ, স্রোত-বওয়া রহস্যময় সেই একই পথগুলোর দিকে আমি তাকিয়ে রয়েছি, চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছে সেই একই অশরীরী মূর্তিগুলো। তখনও আমি মনে মনে পোষণ করছি এক ধরনের আশা, অবশ্য সে আশা এমনই দুরধিগম্য সব আনাচে কানাচে ঠাঁই নিয়েছে যে তাকে আশা বলতেও সংকোচ হয়। একটা পাথরকে গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অতল গহ্বরে, আমি তার বিরামবিহীন পতনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমি নিজে সেই পাথর, আর কোনদিন তল খুঁজে পাবো না জেনেও বুকের মধ্যে আঁকড়ে রেখেছি ক্ষীণ আশাটাকে।

মাঝে মাঝে বৃষ্টির বিরতিতে যখনই সামান্য একটু আলো ফুটে বেরোয়, আমি

ছুটে যাই, ঘুরে বেড়াই শহরের রাস্তায় রাস্তায়। নিজের জীবনের প্রতি কোনো উৎসাহ নেই বলে অন্যের জীবনের সুখ-দুঃখের প্রতি আগ্রহ অনুভব করি। এমনি ভাবে, নিজের সম্পর্কে ভাবনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। তারপর একদিন ভোরে, বেশ ভোরে, কে যেন ভাড়াটে বাড়িটাতে এসে আমার খোঁজ করলো।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো। আমাকে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সে খুব নিচু গলায় বলতে শুরু করলো যে মুচিটা খুন হবার পর থেকে ওরা বেশ মুশকিলে পড়েছে। দোকানটা খুব যুতসই জায়গায় ছিলো এবং পুলিস এখনও পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেনি। তাই ওই আস্তানাটাকে ওরা আবার কাজে লাগাতে পারে।

'আপনি নিশ্চয়ই ওর দোস্ত ছিলেন,' লোকটা বললো, 'দাঙ্গার পরের দিন সকালে আপনিই তো ওর খোঁজ-খবর নিতে গিয়েছিলেন, তাই না? সেই ঘটনার পর থেকে আমরা এমন কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না যাকে ওর জায়গায় বসিয়ে দোকানটাকে আবার কাজে লাগাতে পারি···বিশেষ করে এমন কেউ যিনি এ অঞ্চলে পরিচিত। ওই ঘরটা সত্যিই আমাদের খুব প্রয়োজন। আপনি যদি অনুগ্রহ করে···না না, এত তাড়াহুড়ো করার কোনো দরকার নেই, আপনি বরং ভেবেচিন্তে পরেই বলবেন। ইচ্ছে করলে নাও বলতে পারেন।'

তার বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, তারপর জিগেস করলাম, 'চাবি আছে?'

লোকটা পাজামার পকেট থেকে রিংসমেত দুটো চাবি বার করলো। চাবিটা নিতেই সে চলে গেলো।

আমার দিনলিপিটা এখানেই শেষ। এখন আমি ভাবছি আমার প্রিয়তমা নায়েমার কথা, সেই মুচি আর অন্য অনেকের কথা, যারা এখনও পর্যন্ত আমাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে। ওরা খুব ভালো করেই জানে কেন ওরা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছে।

অনুবাদ / অসিত সরকার

পূর্ণ-অপূর্ণ

এলিসিও দিয়েগো

কিউবার কবি ও গল্পকার এলিসিও দিয়েগোর জন্ম ১৯২১, মতান্তরে ১৯২০ সালে, হাভানায়। হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনা করেন, যুক্ত-রাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বিস্তীর্ণভাবে ঘুরে বেড়াবার অবকাশ পান। রূপকধর্মী, কখনও বা হালকা বিদ্রূপের ছলে উপকথা ধরনের ছোটো ছোটো স্কেচগুলি একসময়ে অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'দিভারটিমিয়েনটস্' ১৯৪৬ তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন।

আজন্ম অন্ধ একটা মানুষ ঘটনাচক্রে এমন একটা জিনিস পেয়ে গিয়েছিলো, যেটা শেষ অব্দি পৃথিবীতে তার একমাত্র সম্পদ হয়ে উঠলো। জিনিসটা আসলে কি, তা কোনোদিনই তার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিলো না। তবু মানুষটা তৃপ্তি পেতো তার কিছু কিছু অংশে আঙুল ছুঁইয়ে, অবিশ্বাস্য সুষমার দানে তিলে তিলে গড়ে ওঠা তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে। কিন্তু এতে সে পুরোপুরি খুশি হতে পারতো না। কারণ যেটুকু সে জেনেছে, তা শুধু অজানায় হারিয়ে থাকা অংশগুলোকে জানার তৃষ্ণাকেই জাগিয়ে তোলে। জিনিসটাকে কোনোদিনই সম্পূর্ণ আপন করে পাবে না জেনে, সেটাকে সে একজন বধির মানুষকে দিয়ে দিলো। বধির মানুষটাকে সে শিশুকাল থেকেই চিনতো—সেদিন বিকেলে সে অন্ধের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো।

'কি সুন্দর মেয়েগুলো!' বধির উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

'কোন্ মেয়ে?' অন্ধ চিৎকার করে জানতে চাইলো।

'এই তো, এগুলো!' জিনিসটার দিকে আঙুল তুলে চিৎকার করেই জবাব দিলো বধির। কিন্তু অবশেষে সে বুঝতে পারলো, এভাবে কোনোদিনই তারা একমত হতে পারবে না। তাই জিনিসটাকে সে অন্ধের হাতে তুলে দিলো। অন্ধ সেই পরিচিত বস্তুটাতে আঙুল ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে যেন নতুন করে তাকে অনুভব করার চেষ্টা করতে লাগলো প্রাণপণ।

'হ্যাঁ, মেয়েই তো!' অন্ধ অস্ফুটে বিড়বিড় করে জিনিসটা ফিরিয়ে দিলো বধিরকে।

বধির জিনিসটাকে বাড়িতে নিয়ে গেলো। জিনিসটা হাতে হাত ধরে থাকা তিনটি মেয়ের মূর্তি। তাদের চুল, হাত আর পোশাক এক অসীম কোমল লাবণ্যে একাকার হয়ে মিশে গেছে। প্রায় স্বচ্ছ মর্মর পাথরে গড়া ওদের অবয়ব। ভেতর

থেকে ফুটে ওঠা আলোর আভায় ওরা আলোকিত। ঈগলের মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টি বধিরের, মূর্তিটার বেদীতে সে একটা স্প্রিং আবিষ্কার করে ফেললো। স্প্রিংটা টিপে দিতেই নাচতে শুরু করে তিন কন্যা। কিন্তু বধির মর্মে মর্মে অনুভব করে, ওদের সে কোনোদিনই সম্পূর্ণ আপন করে পাবে না। তাই তিন নর্তকীকে সে তার এক বন্ধুকে দিয়ে দেয়।

'কি অপূর্ব সুর!' মেয়েগুলোর দিকে আঙুল তুলে লোকটা বললো।

'সেটা কি?' বধির জিগেস করে।

'নাচের বাজনা,' বন্ধুটি তাকে বুঝিয়ে দেয়।

'হ্যাঁ,' বধির বলে, 'আমি জানতাম বাজনা থাকতেই হবে। কিন্তু সেটা কেমন, তা আমি জানতে পারিনি।' তিন নর্তকীর মূর্তিটা সে তার বন্ধুকেই দিয়ে দেয়।

বন্ধুটি মূর্তিটাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। বাজনাটা যেন বেতবনের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। নিজে থেকে সেটা শুরু হয়, নিজে থেকেই ফুরিয়ে যায়। অবাক হয়ে নর্তকীদের শরীর, ওই সুর আর ওদের নাচের অপরূপ একত্বের কথা চিন্তা করে মানুষটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে অনুভব করে, ওদের সে কোনোদিনই সম্পূর্ণ আপন করে অধিকার করতে পারবে না। তাই তার সঙ্গে দেখা করতে আসা একজন প্রাজ্ঞ মানুষকে মূর্তিটা দিয়ে দেয় সে।

'এ যে তিন মূর্তিময়ী সুষমা!' পণ্ডিতপ্রবর উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, 'এ কোন্ রত্ন তুমি পেয়েছো, জানো? এঁরা সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী তিন গ্রীক দেবী—ডিউক অফ্ বার্গাণ্ডির জন্যে বল্ডউইন এটা তৈরি করেছিলেন!'

মানুষটা তখন বুঝতে পারলো, নামের মধ্যেই জড়িয়ে আছে ওই নর্তকীদের রহস্যময় নির্বিকার অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা।

'তাহলে আপনিই ওঁদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন,' মূর্তিটার দিকে দেখিয়ে মানুষটা বললো। পণ্ডিত তখন তিন সুষমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

বন্ধ পাঠাগারে বসে প্রাজ্ঞ মানুষটি ওঁদের নাচ দেখতে দেখতে সরবে ওঁদের কথা চিন্তা করতে থাকেন। চিন্তা করেন ওঁদের আসল নাম…নাচে আত্মহারা ওঁদের শরীর…ওঁদের নাচ আর ওই বাজনার মধ্যে গড়ে ওঠা গোপন সম্পর্কের কথা। চিন্তা করেন ওঁদের দেহের অলৌকিক জন্মকথা, যা গড়ে উঠেছে স্রষ্টার অসীম ভালোবাসা আর ঈশ্বরের স্বর্গীয় আশীর্বাদে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রাজ্ঞ মানুষটি মারা গেলেন—মারা গেলেন এক অস্বস্তিকর অনুভূতিকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, জীবিত অবস্থায় তিনি কোনোদিনই ওঁদের সম্পূর্ণ আপন করে পাবেন না।

প্রাজ্ঞ মানুষটির অজ্ঞ পরিজনরা তাদের মতোই অজ্ঞ এক ব্যবসায়ীর কাছে তিন সুষমাকে বিক্রি করে দিলো। ব্যবসায়ী অন্যান্য খেলনার সঙ্গে জানলার কাছে কাচের আড়ালে রেখে দিলো তিন কন্যাকে। একদিন ছোট্ট একটি ছেলে মূর্তিটা দেখতে পেলো। কাচের সঙ্গে নাক ঠেকিয়ে বহুক্ষণ ধরে তিন কন্যাকে দেখতে দেখতে সে বিষণ্ন হয়ে ভাবলো, ওদের সে কোনোদিনও নিজের করে পাবে না। এবং বাস্তবে ঠিক তা-ই ঘটলো—ছেলেটি বাড়িতে চলে যাবার খানিকক্ষণের মধ্যেই এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দোকানটা ধ্বংস হয়ে গেলো আর সেই সঙ্গে দোকানের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেলো সেই তিন সুষমা।

সেদিন রাতে ছেলেটি ওদের স্বপ্ন দেখলো। স্বপ্নে সে দেখলো—ওরা তার, সম্পূর্ণ তার, চিরদিনের জন্যে শুধু তার।

অনুবাদ / দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

হাতির দাঁতের চিরুনি

নগুয়েন সাঙ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের পটভূমিতে লেখা 'হাতির দাঁতের চিরুনি' একটি অসাধারণ ছোটো গল্প। গল্পটির একাধিক বাংলা অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও এটিকে সংকলনে নেওয়ার লোভ সামলানো সত্যিই দুষ্কর। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়—গল্পটির লেখক নগুয়েন সাঙ সম্পর্কে কোনো তথ্যই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, কেননা ভিয়েতনামের 'পুতুল সরকার'-এর পক্ষে এই ধরনের বৈপ্লবিক গল্পের লেখককে স্বনামে আত্মপ্রকাশ করতে দেওয়াটা ছিলো অত্যন্ত বিপজ্জনক। ছদ্মনামের আড়ালেও নগুয়েন সাঙ-এর অন্য কোনো ছোটো গল্প আমার চোখে পড়েনি। তবে জন্ম সাল অনুমান ১৯২৫-এর কাছাকাছি।

ম্লান জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া শরবনের মাঝখানে লুকিয়ে আছে কুটিরটা। চারদিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটা গরান গাছ। জোয়ারের জল এসে সমস্ত জায়গাটাকে ধুইয়ে দিয়ে যায়। এটা যোগাযোগ রক্ষাকারী দলের একটা গোপন আস্তানা। আস্তানাটা ছোটো কিন্তু ভিড়ে বোঝাই। কখন যাবার পালা আসে, সেই প্রতীক্ষায় এক ধরনের বন্দীদশার অনুভূতি নিয়ে আমরা তক্তোপোশে পা আড়াআড়ি করে বসে আয়েস করছিলাম। সময় কাটাবার জন্যে স্থির করলাম, গল্প বলা হবে। আমাদের সেই বর্ষীয়ান সঙ্গীটিকে আমি কোনোদিনও ভুলতে পারবো না। দারুণ ওস্তাদ গল্প বলিয়ে ছিলো সে। তার স্থূল রসিকতাগুলো—প্রতিরোধের রসিকতাগুলোও—আমাদের হাসিয়ে মারতো। কিন্তু সেই রাতে তাকে কেমন যেন অন্য রকম লাগছিলো। সে নিজে থেকেই কথা বলতে চাইছিলো, অথচ আমরা সবাই যখন রাজি হলাম তখন মানুষটা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। মাথাটা সামান্য নিচু করে ভীষণ নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলো সে—আর দৃষ্টি মেলে রাখলো চতুর্দিকের বিশাল জলরাশির দিকে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু শোনার প্রত্যাশায় আমরা তখন রঙ্গ-রসিকতা করা বন্ধ করে দিলাম। বাইরে ঝোড়ো বাতাস বয়ে চলেছে, জল-তরঙ্গ ভেঙে ভেঙে পড়ছে গরান গাছগুলোর গায়ে। কুটিরটা টলমল করে কেঁপে কেঁপে উঠছে একটা নৌকোর মতো। কয়েকটা সারস অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে উঠলো, অন্যেরা ডানা ঝাপটিয়ে বাতাসে গা ভাসালো। ঢেউ আর দমকা বাতাস মানুষটাকে যেন কোন দূর অতীতের ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো। যেন কোনো দূরাগত কণ্ঠস্বর শুনবে বলে উৎকর্ণ হয়েছিলো সে। তারপর নিচু গলায় সে তার কাহিনী শুরু করলো—

আমাদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে রইলো দিগন্ত আর দূরের ঝিলমিলে নক্ষত্রগুলোর দিকে।...

কাহিনীটা এক বছরেরও বেশি আগেকার। কিন্তু তারপর থেকে যতোবার কাহিনীটা আমার মনে পড়েছে, আমি হতবিহ্বল হয়ে গেছি—মনে হয়েছে আমি যেন সদ্য সদ্য একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছি।

সেদিন আমি এম.জি. ফাঁড়ি থেকে ডি. এ. ফাঁড়িতে যাচ্ছিলাম। মোটর বোটটা তীর ছেড়ে রওনা হতেই আমরা সকলে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠলাম, বোটটা কে চালাচ্ছে। আগ্রহটা শুধুমাত্র অনুসন্ধিৎসার তাগিদে নয়। রওনা হবার আগে সংযোগ রক্ষাকারী ঘাঁটির নেতা আমাদের বলে দিয়েছিলেন, আমাদের সামনে এক দীর্ঘ এবং বিপদসংকুল যাত্রাপথ। মোটর বোট ছাড়া আমাদের পায়ে হেঁটেও যেতে হবে অনেকটা। জলে জল্লাদবাহিনী আমাদের সহজেই দেখে ফেলতে পারে, আর স্থলপথে আমরা সহজেই কম্যাণ্ডো বাহিনীর মুখে গিয়ে পড়তে পারি। জল্লাদেরা আকাশপথে এসে আমাদের মাথায় ঘূর্ণি তুললে, আমাদের শান্ত হয়ে থাকতে হবে এবং কঠোরভাবে আমাদের সারেঙের নির্দেশ মতো চলতে হবে। তার অর্থ, আমাদের ভাগ্য আমরা সারেঙের হাতেই তুলে দেবো। স্বাভাবিক কারণেই আমি তাই জানতে চেয়েছিলাম, সারেঙটি কে। কিন্তু অন্ধকারে শুধু দেখতে পেলাম, আমাদের চালক একটি ছিপছিপে তরুণী—আমেরিকায় তৈরি একটা কারবাইন তার কাঁধে ঝোলানো, গলায় রুমাল বাঁধা।

জনশ্রুতিতে জেনেছিলাম, এই ঘাঁটিতে যোগাযোগ রক্ষার কাজে একটি দারুণ চালাক-চতুর মেয়ে আছে। একদিন মেয়েটি একদল কর্মীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। নদী পার হবার আগে, নদী থেকে বেশ খানিকটা দূরে, একটা ধান-খেতের মধ্যে ও সবাইকে দাঁড়াতে বলে। তারপর পুরুষ সঙ্গীটিকে নিয়ে মেয়েটি জায়গাটা একটু দেখেশুনে নেবার জন্যে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু নদীর কাছাকাছি একটা বেড়া-লাগানো ফলের বাগানে পৌঁছেই ও বুঝতে পারে, ওরা শত্রুপক্ষের গোপন আস্তানার মধ্যে এসে পড়েছে। বিচলিত হবার এতোটুকুও লক্ষণ না দেখিয়ে মেয়েটি তখন ওর বন্ধুটিকে বলে, 'সব ঠিক আছে। তুমি গিয়ে মুসাফিরদের এখানে নিয়ে এসো। আমি নৌকোটা ওপারে নিয়ে যাবো।'

মেয়েটি বেশ উঁচু গলাতেই কথাগুলো বলেছিলো, যাতে শত্রুরা তা শুনতে পায়। কিন্তু ওই কথাগুলোর মাধ্যমেই ও পুরুষ-সঙ্গীটিকে একটা গোপন সংকেত জানিয়ে দেয় এবং সে দ্রুত ফিরে গিয়ে ওখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অন্য একটা

জায়গা দিয়ে সবাইকে নিঃশব্দে নদী পার করিয়ে দেয়। এদিকে মেয়েটি তখন ওখানে ছুটো গ্রেনেড পেতে, নিজেও নিরাপদে নদী পার হয়। একটা বড়োসড়ো দলকে জালে ধরার আশায় শত্রুপক্ষ নিস্পন্দ হয়ে অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু সময় বয়ে চলে, কিছুই হয় না। অবশেষে প্রতারিত হয়েছে বুঝতে পেরে কম্যাণ্ডোরা একে অন্যকে খিস্তিখাস্তা দিতে দিতে নিজেদের ঘাঁটির দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু যাবার পথে তারা ওই গ্রেনেডের ফাঁদে পা দেয় এবং তাতে বেশ কয়েকজনের প্রাণহানি হয়। পরে এই কাহিনীকেই খানিকটা পল্লবিত করে সবাই বলতে শুরু করে, মেয়েটির ঘ্রাণশক্তি সাংঘাতিক তীক্ষ্ণ—গন্ধ শুঁকেই ও শত্রুসৈন্যের অবস্থিতি, তারা ইয়াংকি না পুতুল সরকারের সৈন্য—সবই বুঝতে পারে।

আমি ভাবছিলাম, আমাদের মোটর বোটের চালিকা যদি সেই মেয়েটিই হয়, তাহলে খুব একটা দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ থাকে না।

'এই ঘাঁটিতে কজন মহিলা কাজ করছেন?' অনুসন্ধিৎসু ভঙ্গিতে আমি জানতে চাইলাম।

'মোটে দুজন, একজন রাঁধুনি আর আমি।'

জবাবটা শুনে ভীষণ স্বস্তি পেলাম। নিঃসন্দেহে এই মেয়েটিই সে। কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো, ওর বয়েস আঠারো বা বড়োজোর কুড়ি। মেয়েটিকে আমার বেশ ভালো লাগছিলো, আরও কয়েকটা প্রশ্ন জিগেস করতে ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু মোটর বোটের চাকাটা নিয়ে ওকে ব্যস্ত থাকতে দেখে, আমি আমার ইচ্ছেটাকে ত্যাগ করলাম। কাছিটা চাকতির মধ্যে জড়িয়ে মেয়েটি টানটান হয়ে দাঁড়ালো, তারপর কাছের অন্য একটা মোটর বোটের দিকে ফিরে বললো, 'আমি আগে রওনা হচ্ছি। ঠিক আছে?'

'সব ঠিক। তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।' পাশের বোট থেকে যোগাযোগ কর্মীরা বললো। কখনও কখনও ওরা মেয়েটিকে 'হাই বোন' (বড়দি) আবার কখনও বা 'উত্ বোন' (ছোটো বোন) বলে ডাকে। সবাইকে 'ছোটো ভাই' বলে সম্বোধন করে মেয়েটি বিচক্ষণের মতো কয়েকটা কথা বললো। তারপর মার্জিত-বিনীত ভঙ্গিতে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত দরকারী জিনিসগুলোকে নিজেদের পকেটে বা আলাদা পুলিন্দা করে নিতে বললো, যাতে হেলিকপ্টার বা কম্যাণ্ডোদের চোরাগোপ্তা আক্রমণ হলে ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যায়।

খানিকটা নরম আর মিষ্টি স্বরে মেয়েটি এই সম্ভাব্য বিপদগুলো সম্পর্কে আমাদের সাবধান করে দিলো—যা ঘাঁটির নেতাটির ভঙ্গির সঙ্গে মেলে না। আস্তে আস্তে গরান গাছের ঘন বেষ্টনী পেরিয়ে আমাদের মোটর বোট দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে চললো। বাতাসে মধুর হিমেল স্পর্শ। মেয়েটির নির্দেশ মতো যাত্রীরা নিজেদের

মালপত্র নিয়ে ব্যস্ত। দরকারী কাগজপত্র আর পথ-খরচার টাকাটা বাদে আমার কাছে মূল্যবান জিনিস বলতে আর কিছুই ছিলো না—ওগুলো আমি সর্বদা নিজের পকেটেই রাখি। কিন্তু হঠাৎ হাতীর দাঁতের ছোট্ট চিরুনিটার কথা মনে পড়ে গেলো। তাই ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে চিরুনিটা খুঁজে বের করলাম। তারপর দরকারী কাগজপত্রের সঙ্গে সেটাকে বুকপকেটে রেখে, পকেটটা একটা সেফটি পিন দিয়ে সাবধানে গেঁথে রাখলাম।

ছোট্ট ওই চিরুনিটা আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন। ওটার দিকে তাকালেই আমি এক ধরনের উৎকণ্ঠা আর অনুশোচনার দাহ অনুভব করি।

নতুন করে শান্তি স্থাপন হবার ঠিক পরবর্তী দিনগুলোর কথা। আমি ও আমার এক বন্ধু আমাদের গাঁয়ে ফিরছিলাম। মেকং নদীর মোহনার কাছে পাশাপাশি বাড়ি আমাদের। ফরাসীরা আমাদের গ্রাম আক্রমণ করার পর ১৯৪৬ সালের শুরুতে আমরা দুজনেই প্রতিরোধ সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলাম। আমার বন্ধুটি ছিলো তার পরিবারের ষষ্ঠ সন্তান, তাই তাকে সাউ বলে ডাকা হতো। সাউয়ের একমাত্র মেয়েটির বয়েস তখন বড়োজোর এক বছর। সাউয়ের স্ত্রী যতোবার মুক্তাঞ্চলে সাউয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতো, সাউ প্রতিবারই স্ত্রীকে বিশেষ করে পীড়াপীড়ি করতো যাতে ও পরের বার মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। কিন্তু জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হতো বলে সাউয়ের স্ত্রী মেয়েকে সঙ্গে নিতে ভরসা পেতো না। ওর পক্ষেও ওই পথ পেরিয়ে আসাটা খুব একটা সহজ কাজ নয়। তাই সাউ ওকে দোষ দিতে পারতো না। দীর্ঘ আট বছর ধরে মেয়েকে সে শুধু ছোট্ট একটা ছবির মাধ্যমেই দেখেছে। এখন বাড়ি ফেরার পথে পিতৃত্বের এক বর্ণনাতীত অনুভূতি তাকে চঞ্চল করে তুললো। নৌকোটা ঘাটের দিকে এগুচ্ছিলো। হঠাৎ সাউ দেখতে পেলো, বছর আষ্টেক বয়সের একটি ছোট্ট মেয়ে—মাথায় বব্‌ছাঁট চুল, পরনে কালো পাতলুন আর লাল ফুলের ছাপওলা একটা জামা—তাদের বাড়ির সামনের দিকের উঠোনে একটা আম গাছের ছায়ায় আপন মনে খেলছে। সাউ তখন সুনিশ্চিত, ও তারই মেয়ে। নৌকোটা তীরে পৌছনো অব্দি অপেক্ষা না করে সে তক্ষুণি লাফিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা পেছন দিকে সরে গেলো—আমি তখন প্রায় ঝুলছি। সাউ তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে গেলো, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'থু, আমার মামন সোনা!'

ঠিক সেই মুহূর্তে আমি সাউয়ের ঠিক পেছনেই ছিলাম। সে আশা করেছিলো, মেয়ে ছুটে এসে দু হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরবে। সামনের দিকে ঝুঁকে, দু হাত

বাড়িয়ে, মেয়েকে উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরার জন্যে প্রস্তুত হয়ে, আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলো। তার ডাকে চমকে উঠে ছোট্ট মেয়েটা চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে রইলো—ভীষণ উদভ্রান্ত আর বিহ্বল দেখাচ্ছিলো ওকে। ওদিকে সাউ কিছুতেই নিজের আবেগকে সামলে রাখতে পারছিলো না। অতর্কিত আবেগে আত্ম-হারা হলেই তার ডান গালের কাটা দাগটা লাল হয়ে ওঠে, মুখটা ভয়ঙ্কর দেখায়। সেই বীভৎস মুখ আর বাড়ানো হাত নিয়ে সাউ আস্তে আস্তে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যায়—কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে অস্ফুটে বলে, 'আয় সোনা মা! আয়!'

ছোট্ট মেয়েটি ব্যাপারটা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলো না—চোখ পিট পিট করে ও আমার দিকে তাকাচ্ছিলো—যেন জানতে চাইছিলো, লোকটা কে। আচমকা ওর মুখখানা পাংশুল হয়ে উঠলো। একছুটে পালিয়ে যেতে যেতে ও চিৎকার করে উঠলো, 'মা, ও মা!'

সাউ নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার চোখ দুটো তখনও মেয়েকে অনুসরণ করছে, মুখটা বেদনায় বিকৃত, হাত দুটো অবসন্নের মতো ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে।

অনেকটা পথ পেরিয়ে আসতে হয়েছে বলে বাড়িতে থাকার জন্যে আমাদের হাতে মোটে তিনটে দিন সময়—বাবাকে ভালোমতো চিনে নেবার জন্যে সময়টা ওই মেয়েটির পক্ষে আদৌ যথেষ্ট নয়। সেদিন রাতে ও বাবাকে মায়ের সঙ্গে শুতে দিলো না। তীব্র আপত্তি দেখিয়ে ও নিজে বিছানা থেকে নেমে, মাকেও খাট থেকে টেনে নামালো। প্রতিদিন প্রায় পুরো সময়টাই সাউ মেয়ের সঙ্গে লেগে রইলো, ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলো—কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। সাউ ভীষণ আশা করেছিলো, মেয়ের মুখ থেকে সে 'বাবা' ডাক শুনবে, কিন্তু ওই শব্দটা মেয়ের মুখ থেকে কিছুতেই বেরুলো না। রাতে খাওয়ার সময় মা যখন বাবাকে ডেকে দিতে বললো, মেয়ে মায়ের মুখের ওপরে বলে বসলো, 'তুমি নিজেই ডাকো না!'

মা এবারে রাগে ফেটে পড়লো, বড়ো একটা খাওয়ার কাঠি তুলে নিয়ে মেয়েকে মারের ভয় দেখিয়ে, কথা শুনতে বললো। থু তখন শুধু বললো, 'খেতে এসো।'

সাউ কিছু না শোনার ভান করে চুপটি করে বসে রইলো, অপেক্ষা করতে লাগলো মেয়ের মুখ থেকে 'বাবা' ডাকটা শুনবে বলে। থু কিন্তু রান্নাঘর থেকেই গলা চড়িয়ে বললো, 'খাবার দেওয়া হয়েছে।' সাউ তবু নড়লো না। মেয়ে এবারে রাগ দেখিয়ে মায়ের দিকে ফিরে তাকালো, 'আমি তো তোমার কথা মতো কাজ করলাম, কিন্তু কেউ তো আমার ডাক কানেই তুলছে না!'

সাউ সামান্য মাথা নেড়ে মেয়ের দিকে তাকায়, মৃদু হাসে। হয়তো খুব বেশি ব্যথা পেয়েছে বলেই তার চোখ ফেটে জল বেরোয় না। ভাতের হাঁড়িটা আগুনে

বসিয়ে তার স্ত্রী ওবেলার রান্নার জন্যে কিছু আনাজ কিনতে বেরিয়ে যায়। যাবার সময় মেয়েকে বলে যায়, দরকার হলে ও যেন বাবাকে সাহায্য করতে বলে। হাঁড়িটা ফুটছিলো। থু ঢাকনা খুলে একটা বড়োসড়ো চপস্টিক দিয়ে ভাতটা নেড়ে দেয়। হাঁড়িটা বেশ ভারি, ওর পক্ষে ওটাকে নামিয়ে ফ্যান গালা রীতিমতো কষ্টকর কাজ। একবার সাউয়ের দিকে তাকালো ও। আমি ভাবলাম, এবারে ওর খেলা শেষ—এখন বাবাকে ডেকে সাহায্য করতে বলা ছাড়া ওর আর কিচ্ছুটি করার নেই। কিন্তু থু এক মুহূর্ত চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে উঁচু গলায় বলে উঠলো, 'ভাত ফুটছে। আমার হয়ে ফ্যানটা একটু গেলে দাও।'

এবারে আমাকেই ব্যাপারটাতে মাথা গলাতে হলো। কিভাবে কথাবার্তা বলতে হয় তা শেখাবার চেষ্টায় আমি থুকে বললাম, 'তোমার বলা উচিত ছিলো ঃ বাবা, ফ্যানটা গালতে আমাকে একটু সাহায্য করো না!'

মেয়েটি যেন আমার কথা গ্রাহ্যই করলো না। ফের চড়া গলাতেই ও বললো, 'হাঁড়ি ফুটছে। ভাতগুলো বেশি নরম হয়ে যাবে।'

সাউ তবু অনড় হয়ে বসে থাকে।

আমি থুকে ভয় দেখিয়ে বলি, 'ভাতটা নষ্ট করে ফেললে মা কিন্তু নির্ঘাত তোমাকে মারবে। তার চাইতে বাবাকে একটু সাহায্য করতে বলো না কেন। একবার শুধু 'বাবা' বলে ডাকো। দ্যাখোই না চেষ্টা করে।'

ভাতটা উথলে উঠতেই মেয়েটা যেন একটু ভয় পেয়ে গেলো। নিচের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো, তবু জিদ ছাড়লো না। এক টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে ও হাঁড়িটা নামাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। ভাতগুলো তখন আরও জোরে জোরে ফুটছে। প্রচণ্ড চাপে পড়ে মেয়েটা তখন প্রায় কাঁদো-কাঁদো। একবার হাঁড়িটার দিকে, তারপরেই আমাদের দিকে তাকাচ্ছে ও। ওর অসহায় ভাবভঙ্গি যেমন করুণ তেমনি মজাদার। আমরা ভাবছিলাম, এবারে ও হাল ছেড়ে দেবে। কিন্তু শেষ অব্দি ও বড়োসড়ো একটা হাতা দিয়ে ফ্যান তুলে তুলে ফেলতে লাগলো আর বিড় বিড় করে কিছু বলতে লাগলো, যেগুলো আমরা ঠিক শুনতে পেলাম না। সত্যি, কি সাংঘাতিক মেয়ে!

খাওয়ার সময় সাউ মাছের খানিকটা হলদে ডিম থুয়ের পাতে তুলে দিলো। থু চপস্টিক দিয়ে সেটাকে পাতের একপাশে সরিয়ে রাখলো এবং তারপরেই, একেবারে হঠাৎ, চতুর্দিকে ভাতটাত ছিটিয়ে ডিমটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ওর ব্যবহারে রেগে গিয়ে সাউ ওর পাছায় একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলো। তারপর চিৎকার করে বললো, 'এতো জেদী কেন তুমি?'

আমি ভেবেছিলাম, ছোট্ট মেয়েটা এবারে কেঁদে উঠবে কিংবা ছুটে পালাবে। কিন্তু ও নিচের দিকে তাকিয়ে চুপটি করে বসে রইলো। এক মুহূর্ত পরে ও ডিমটা তুলে নিয়ে ফের নিজের বাটিতে রাখলো। তারপর নিঃশব্দে উঠে এগিয়ে গেলো নদীর ঘাটের দিকে। এক লাফে নৌকোয় উঠে মেয়েটা শেকলের বাঁধন খুলে ফেললো, ইচ্ছে করে অহেতুক ঝনঝন শব্দ তুললো শেকলে, তারপর বৈঠা নিয়ে ওপারে যাবার জন্যে নৌকো চালিয়ে দিলো। সেদিন দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো থু। দিদিমাকে ও সবকিছু বললো আর কাঁদলো। সন্ধ্যাবেলা মা ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। পরের দিনই সাউ চলে যাবে, তাই সাউয়ের স্ত্রী শেষ রাতটা স্বামীর সঙ্গে একা কাটাতে চাইছিলো—ফলে মেয়েকে ফিরিয়ে আনার জন্যে ও তেমন করে পীড়াপীড়িও করলো না।

পরদিন সকালে আত্মীয়-স্বজনরা দলে দলে সাউকে বিদায় জানাতে এলো। দিদিমার সঙ্গে ছোট্ট মেয়েটাও ছিলো তাদের মধ্যে। সাউ তখন সবাইকে অভ্যর্থনা জানাতে ব্যস্ত। মনে হচ্ছিলো মেয়ের দিকে তার কোনো খেয়ালই নেই। স্ত্রী তার জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে দিয়েছে। এক কোণে একটা দরজার থামের সঙ্গে একা একা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থু ওর বাবাকে ঘিরে রাখা লোকগুলোকে দেখছিলো। কেমন যেন অন্য রকম লাগছিলো মেয়েটাকে—হাবভাবে কোনো দুর্বিনীত ভঙ্গি নেই, ভ্রূ দুটোও কোঁচকানো নয়। আলতো করে ওপরের দিকে উঠে যাওয়া ওর দীর্ঘ অক্ষি-পক্ষ্ম যেন কোনদিনও পলক ফেলেনি, ফলে আরও বড়ো বলে মনে হয় ওর চোখ দুটোকে। স্পষ্টই বোঝা যায়, এখন ও আর কিছুই চিন্তা করছে না।

যাবার মুহূর্তে সবাইকে বিদায় জানিয়েই সাউয়ের চোখ দুটো মেয়েকে খুঁজতে থাকে। থু তখনও সেই কোণটিতে দাঁড়িয়ে। বোঝাই যাচ্ছিলো, সাউ মেয়েকে একবারটি জড়িয়ে ধরতে চায়। কিন্তু পাছে ও পালিয়ে যায়, তাই মেয়ের দিকে সে শুধু তাকিয়েই থাকে। তার দৃষ্টিতে অপার স্নেহ, কিন্তু তাতে এক নিবিড় বিষাদের ছোঁয়া। থুয়ের চোখেও আমি সেই মুহূর্তে একটা ঝিলিক ফুটে উঠতে দেখলাম।

'চলি,' সাউ নরম গলায় বললো।

ভেবেছিলাম মেয়েটা অমনি স্থাণু হয়েই দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত-ভাবে হঠাৎ ও চিৎকার করে উঠলো, 'বাবা, বা…বা…'

নৈঃশব্দ্যকে ছিঁড়েখুঁড়ে ওর সেই চিৎকার প্রত্যেকের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে গেলো। অনেক বছর রুদ্ধ থাকার পর ঠিকরে বেরিয়েছে ওই 'বাবা' ডাক। কাঠবেড়ালির তৎপরতায় দু হাত বাড়িয়ে থু ছুটে গেলো ওর বাবার দিকে। সাউয়ের গলা জড়িয়ে

ধরলো ও। মনে হলো ওর চুলগুলো যেন খাড়া হয়ে উঠেছে। বাবার বুকে লেপ্টে গিয়ে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো, 'আমি তোমাকে যেতে দেবো না, বাবা। তুমি আমার সঙ্গে থাকো!' বাবা মেয়েকে জড়িয়ে রাখলো—মেয়ে চুমু দিতে লাগলো বাবার গালে, চুলে, ঘাড়ে, এমন কি মুখের দীর্ঘ কাটা দাগটাতেও।

দিদিমা তখন গত রাত্রের ঘটনাটা সবাইকে বললেন। থু কেন ওর বাবাকে চিনতে চায় না তা আবিষ্কারের চেষ্টায় উনি থুকে জিগেস করেছিলেন, কেন ওই মানুষটাকে ও বাবা বলে ডাকে না।

'না, ও আমার বাবা নয়।' বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে জবাব দিয়েছিলো থু।

'তুমি তা কি করে জানলে? বাবা তো কতো দি—ন হলো ঘরছাড়া। তাই কি তুমি বাবাকে চিনতে পারছো না?'

'ছবিতে আমি বাবাকে যেমনটি দেখেছি, ওই লোকটা মোটেই তেমন দেখতে না।'

'কিন্তু তাহলেও ও-ই তোমার বাবা। হয়তো এতোদিন বাদে বলে এখন ওকে একটু বেশি বয়সী বলে মনে হচ্ছে।'

'না না, বয়েস বেশি বলে নয়। আমার বাবার গালে কোনো কাটা দাগ নেই।'

দিদিমা তখন সমস্ত কিছু বুঝতে পারলেন। থুকে উনি বুঝিয়ে বললেন, ঘর ছেড়ে তার বাবা এতোদিন ফরাসীদের সঙ্গে লড়াই করেছে আর তাতেই অমন চোট পেয়েছে। খালের অন্য প্রান্তে একটা ফাঁড়িতে ফরাসীরা কি ধরনের অত্যাচার করেছে, তাও তিনি ওকে শোনালেন। মেয়েটা নিঃশব্দে তাঁর সমস্ত কথা শুনেছে, মাঝে মাঝেই শুনতে শুনতে ছটফট করেছে, তারপর বড়োদের মতো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। শেষে ভোর হতেই ও দিদিমার সঙ্গে বাড়িতে ফিরে আসতে চেয়েছে।

বাবার বুকে শক্ত করে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলো মেয়েটা। সাউও তার আবেগ চেপে রাখতে পারছিলো না—কিন্তু মেয়ে তাকে কাঁদতে দেখবে, তাও সে চাইছিলো না। এক হাতে মেয়েকে জড়িয়ে রেখে, অন্য হাতে নিজের অশ্রু মুছছিলো সে। মেয়ের চুলে চুমু দিয়ে সে অস্ফুটে বললো, 'বাবাকে এবারে যেতে দাও, সোনা। আমি শীগগিরি আবার বাড়িতে ফিরে আসবো।'

'না,' মেয়ে চিৎকার করে আরও শক্ত করে বাবার গলা জড়িয়ে ধরলো—দু হাত আর দু পা দিয়ে আঁকড়ে রাখলো বাবাকে। যারা ওখানে হাজির ছিলো, তারা কেউই চোখের জল সামলাতে পারলো না। আমিও খুব সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। সাউকে আরও কয়েকটা দিন থেকে যাবার কথা বলতে

পারলে আমি ভীষণ খুশি হতাম। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু অসুবিধে ছিলো। আমরা জানতাম না আমরা দক্ষিণেই থাকবো, না কি নতুন করে জোট বেঁধে উত্তরে যাবো। আপাতত আমাদের পুরনো দলে গিয়ে যোগ দিতে হবে, তারপর নতুন নির্দেশ নিতে হবে এবং তখন, উত্তরে যেতে হলে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিগুলো সেরে ফেলতে হবে। যাবার সময় হয়ে গেছে। বাবাকে ছেড়ে দেবার জন্যে সবাই মেয়েটাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে।

সাউয়ের স্ত্রী বললো, 'থু, বাবাকে যেতে দাও সোনা! আমাদের দেশ আবার নতুন করে জুড়ে গেলেই বাবা এখানে ফিরে আসবে।'

দিদিমা মেয়েটির চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'লক্ষ্মী মেয়ে, বাবাকে যেতে দাও সোনা! বলে দাও, বাবা যেন তোমার জন্যে একটা চিরুনি কিনে আনে।'

'বাবা, আমার জন্যে একটা চিরুনি কিনে এনো,' থু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো। তারপর মুঠি আলগা করে বাবার কোল থেকে নেমে এসে নিজের পায়ে দাঁড়ালো মেয়েটা।

কিছুদিন বাদে সাউ আর আমি পূর্ব নাম্ বো-তে গিয়ে একটা গণ-সংগঠনে সাধারণ কর্মী হিসেবে কাজকর্ম করি। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত সময়টা ছিলো অন্ধকারময়। মার্কিন-দিয়েম শাসনতন্ত্র তখন প্রতিরোধবাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছে। আমাদের তখন অরণ্যে-জঙ্গলে বাস করতে হয়েছে। সেখানে আমাদের জীবন ও কার্যকলাপ ছিলো ঘটনাবহুল—সে সমস্ত বলতে গেলে সারারাত কেটে যাবে। এমন অনেক রাত গেছে যখন কম্যাণ্ডোরা তিন তিনবার আমাদের ঘিরে ফেলেছে, তিনবারই আমরা পালিয়ে বেঁচেছি। কতোদিন খাওয়া জোটেনি, বুনো গাছের পাতা খেয়ে থাকতে হয়েছে। কিন্তু সেসব অন্য কাহিনী।

জঙ্গলের মধ্যে একটুকরো প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে ছাদ বানিয়ে দড়ির দোলনায় শুয়ে আমরা রাত কাটাতাম। মেয়েকে মেরেছিলো বলে সাউ তখন প্রায়ই খুব বিবেক-দংশন অনুভব করতো। একদিন আমাদের কথাবার্তা চলার মধ্যেই ও হঠাৎ ওর দোলনায় উঠে বসে বললো, 'এখানকার লোকেরা তো প্রায়ই হাতি শিকার করতে যায়। আমার মেয়ের চিরুনি বানাবার জন্যে একটুকরো হাতির দাঁত যোগাড় করা যায় কি না দেখতে হবে।'

তারপর থেকে মানুষটা ওই আশা নিয়েই দিন কাটাতো। এর কিছুদিন বাদেই আমাদের দলের রসদে টান পড়ায় আমরা কিছু বুনো জন্তু শিকার করার কথা ভাবলাম—তবে তীর-ধনুক দিয়ে, রাইফেল দিয়ে নয়—কারণ আমাদের নিরাপত্তার

খাতিরে অরণ্যের নিস্তব্ধতা বজায় রাখতেই হবে। হাতি শিকারের কোনো পরিকল্পনা আমাদের ছিলো না, কিন্তু দৈবক্রমে একদিন একটা হাতিকে আমাদের আস্তানার সামনে দেখা গেলো। আমাদের মধ্যে কেউই হাতি-শিকারে আগ্রহ দেখালো না, কিন্তু সাউ সেটাকে তাড়া করবে বলে স্থির করলো। একটি বন্ধুকে নিয়ে সে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইলো, অপেক্ষা করতে লাগলো হাতিটা ওদের নাগালের মধ্যে আসবে বলে। হাতিটার ঠিক দু চোখের মাঝখানে তীর মেরেছিলো ওরা।

সেই বিকেলটার কথা আমার আজও মনে পড়ে। জঙ্গলের মধ্যে প্রবল বর্ষণ তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। জলের ফোঁটাগুলো ঝিলমিল করছে গাছের পাতায় পাতায়। আমি আমার প্লাস্টিকের ছাদের তলায় বসে কাজ করছি, হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন চিৎকার করছে। চোখ তুলে দেখি, বনপথ দিয়ে সাউ আমাদের আস্তানাটার দিকেই ছুটে আসছে। হাত তুলে সে আমাকে একটুকরো হাতির দাঁত দেখালো। একটা ছেলেমানুষের মুখের মতো ঝলমল করছিলো তার মুখখানা।

পরে একটা কুড়ি মিলিমিটারের টোটাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সাউ ছোট্ট একটা করাত বানিয়ে নেয়। প্রায়ই দেখা যেতো, একজন মণিকারের মতো একাগ্রতা, দক্ষতা আর অধ্যবসায় নিয়ে সে ওই হাতির দাঁতের টুকরোটা দিয়ে চিরুনি তৈরি করার জন্যে কঠিন পরিশ্রম করে চলেছে। গভীর আগ্রহ নিয়ে আমি তার কাজ লক্ষ্য করতাম। সাধারণত দিনে সে কয়েকটা করে দাঁত বানাতো। অবশেষে পুরো চিরুনিটাই একদিন তৈরি হয়ে গেলো। চিরুনিটা খুব একটা বড়ো নয়— লম্বায় দশ আর চওড়ায় দেড় সেন্টিমিটার। বহু কষ্টে সাউ চিরুনির হাতলে খোদাই করে লিখলো : 'ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা সহ, আমার মামণি থূ-কে।'

চিরুনিটা সাউয়ের বিক্ষুব্ধ মনে স্বস্তি এনে দিয়েছিলো, যদিও তার মেয়ে তখনও সেটা ব্যবহার করার সুযোগ পায়নি। কোনো কোনো রাতে দেখা যেতো, সাউ অনিমেষে চিরুনিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, নিজের চুলে ঘষে ঘষে সেটাকে পালিশ করছে। মেয়েকে আবার দেখার জন্যে তার আর্তি ছিলো আকুল, কিন্তু ইতিমধ্যে একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে গেলো। সেটা উনিশ শো আটান্নোর শেষাশেষি, আমাদের হাতে তখনও কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেই। একবার মার্কিন আর পুতুল সরকারের যৌথ আক্রমণ চলার সময় একটা মার্কিন বিমান থেকে ছুটে আসা গুলি বুকে লেগে সাউ মারা যায়। মৃত্যুর আগে শেষ ইচ্ছেটা বলে যাবার মতো শক্তিও তার ছিলো না। শুধু পকেটে হাত ঢুকিয়ে সেই চিরুনিটা সে বের করে এনেছিলো। তারপর চিরুনিটা আমার হাতে তুলে দিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়েছিলো

অপলক। তার সেই শেষ দৃষ্টিপাত বর্ণনা করার মতো ভাষা আমার নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি সেদিন থেকে আমি মাঝে মাঝেই কল্পনায় দেখতে পাই, সাউ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।

'চিরুনিটা তোমার মেয়েকে আমি পৌঁছে দেবো,' ওর দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে আমি নিচু গলায় বললাম। আমার কথাটা শুনে সাউ চিরদিনের মতো চোখ বুজলো।

সেই অন্ধকারের দিনগুলোতে শুধু জীবিতদের নয় মৃতদেরও লুকিয়ে থাকতে হতো। রীতি অনুযায়ী সাউয়ের কবরটাও তাই ভূ-সমতল থেকে উঁচু করে তৈরি করা যায়নি—কারণ কবরের খোঁজ পেলে শত্রুরা সেটাও অপবিত্র করতে পারে। চিনে রাখার জন্যে কাছাকাছি একটা গাছের গায়ে আমি একটা চিহ্ন খোদাই করে রাখলাম।

সেই সময়ে আমরা এভাবেই বেঁচে ছিলাম, এভাবেই মরেছি। সে এক অসহনীয় অবস্থা, তাই আমাদের অস্ত্র হাতে নিয়ে জেগে উঠতে হয়েছিলো।

কিছুদিন বাদে আমি একটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ প্রতিরোধ-ঘাঁটিতে এলাম। একদিন এক আত্মীয় আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। আমি তার মাধ্যমে থুকে হাতির দাঁতের চিরুনিটা পাঠাতে চেয়েছিলাম—কিন্তু শুনলাম থু আর ওর মা নাকি সায়গন না অন্য কোথাও চলে গেছে। মার্কিন আর পুতুল-সরকারের সেনারা সেখানে কমিউনিস্ট নিধন যজ্ঞ শুরু করেছিলো। তারা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চালিয়েছে, সবাইকে ধরে ধরে বন্দী শিবিরে ঢোকাবার জন্যে বাড়ি-ঘর-দোর পুড়িয়ে দিয়েছে এবং কয়েক বছরের মধ্যে গোটা গ্রামটাই সম্পূর্ণ জনহীন হয়ে গেছে।

চিরুনিটা আমি নিজের হাতেই ধরে রইলাম। ওটার দিকে তাকাতেও ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো আমার।

আমাদের মোটর বোটটা মৃদু গুঞ্জন তুলে ছুটে যাচ্ছিলো। যে মেয়েটির হাতে আমাদের জীবন নির্ভর করছে, তার মুখখানা একবারটি ভালো করে দেখার জন্যে এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করছিলাম আমি। রাতটা তেমন অন্ধকার নয়। তারায় ভরা আকাশের এখানে-সেখানে কিছু কিছু আবছা মেঘের আড়াল। ম্লান আলোয় আমি শুধু মেয়েটির অস্পষ্ট দেহরেখা, একটু গোলমতো মুখ আর অবর্ণনীয় দৃষ্টি মেশা একজোড়া চোখ দেখতে পাচ্ছিলাম। এবং তাতেই আমি চমকে উঠলাম—মনে হলো, ওকে আমি আগে অন্য কোথাও দেখেছি।

হঠাৎ কে একজন চিৎকার করে উঠলো, 'উড়ো জাহাজ! উড়ো জাহাজ!'

যাত্রীদের হুড়োহুড়িতে বোটটা দুলে উঠলো। অনেকেই আর্তনাদ করে উঠলো,

'পাড়ে ভেড়াও।'

'কোথায় উড়ো জাহাজ?'

'আমাদের পেছনে—আমি তার আলো দেখেছি।'

'পাড়ের দিকে বোটের মুখ ঘোরাও! একটা জেট আসছে!'

মেয়েটি মোটর বোটের গতি কমিয়ে সামান্য সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'না, ওটা উড়ো জাহাজ নয়। ওটা তারার আলো।'

ওর শান্ত সংযত কণ্ঠস্বর বোটে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলো। ভারি নরম আর মধুর কণ্ঠ মেয়েটির। তারপরেই এঞ্জিনের গতি বাড়িয়ে দিলো ও।

বেশ কয়েকদিন পায়ে চলার পর এই মোটর বোটে ভ্রমণ আমাকে সত্যিই আনন্দ দিচ্ছিলো। তবে শত্রুর বিমান বাহিনী সম্পর্কে আমি তখনও খানিকটা অস্বস্তি অনুভব করছিলাম।

বোটটা এবারে খোলা মাঠ দিয়ে বয়ে চলা একটা খালে গিয়ে ঢুকলো। কোথাও কোনো ঘরবাড়ি নেই, শুধু দূরে দূরে গুটিকয়েক বাঁশঝাড়। যেন আমার গোপন অনুভূতির হদিশ পেয়েই মেয়েটি বোটের গতি বাড়িয়ে দিলো। খালের জল ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো বোটের সামনের দিকে আর পেছন দিক থেকে দুটো দীর্ঘ জলধারা ঢেউ হয়ে ছুটে যেতে লাগলো তীরের দিকে, কাঁপিয়ে তুললো আগাছার ঝাড় আর বুনো ফার্নের শিকড়গুলোকে।

যাত্রীরা শান্ত হয়ে এই দ্রুতগতির জলযাত্রা উপভোগ করছিলো। হঠাৎ মেয়েটি মোটর থামিয়ে চিৎকার করে বললো, 'উড়ো জাহাজ!'

বোটটাকে ও একটা বাঁশঝাড়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলো। আমাদের পেছন পেছন আর একটা বোটও সেখানে এসে আশ্রয় নিলো। এতোক্ষণে আমরা মার্কিনি হেলিকপ্টারগুলোর গুঞ্জন শুনতে পেলাম। জনশ্রুতিতে যেমনটি শুনেছি, মেয়েটির ঘ্রাণশক্তি ঠিক ততোটাই তীক্ষ্ণ কিনা—আমি জানি না। কিন্তু মোটরের আওয়াজের ভেতর থেকেও ও কি করে হেলিকপ্টারের গুঞ্জন শুনতে পেলো, তা সত্যিই এক আশ্চর্য কাণ্ড!

যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায় বোটটা দুলছিলো। তাদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় মেয়েটি বললো, 'আপনারা শান্ত হোন। জল্লাদরা এখনও অনেক দূরে। লাফিয়ে পাড়ে নেমে, আপনারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লুকিয়ে থাকুন। ওরা আমাদের দিকে আলোর ঝলক ছড়ালে, যেখানে আছেন সেখানেই পড়ে থাকবেন—নড়াচড়া করবেন না।'

মেয়েটির কথার মধ্যেই আমি ছাড়া অন্য সকলে পাড়ে নেমে পড়েছিলো। আমিও লাফাতে যাচ্ছি—হঠাৎ মেয়েটি বললো, 'কাকু, আপনি এখানেই থাকুন। বোটে তো আমরা মোটে কজন। চিন্তা করবেন না।'

অন্য কেউ এ উপদেশ দিলে আমি শুনতাম না। কিন্তু মেয়েটির আচার-ব্যবহার আমাকে এমন মুগ্ধ করেছিলো যে আমি বোটেই রয়ে গেলাম।

জল্লাদরা খালের অন্য প্রান্ত থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো, আগে আগে ছুটে এলো তাদের আলোর ঝলক। এক ঝাঁক জাহাজের মতো গর্জন তুলে তারা ক্রমশ আরও কাছে এগিয়ে আসছিলো। এ ধরনের কাজে অ্যামেরিকানরা সাধারণত তিনটে করে হেলিকপ্টার ব্যবহার করতো—একটা আলো ফেলতো আর বাকি দুটো বোমা বর্ষণ করতো।

মেয়েটি ফের আমাকে পরামর্শ দিলো, 'গাছের ডালপালা দিয়ে নিজেকে বেশ করে ঢেকেঢুকে চুপটি করে বসে থাকুন।'

এই প্রথম জল্লাদদের আলোর ছটায় আমি ধরা পড়লাম। আলোটা আমার গায়ে এসে পড়তেই আমি তার প্রচণ্ড তীব্রতা আর মাথার ওপরে তাদের ডানার ঝাপটানি স্পষ্ট করে অনুভব করলাম। ভয় হচ্ছিলো আমাদের বোটটাও ওদের চোখে ধরা পড়ে যাবে। হেলিকপ্টারগুলোর ডানার ঝাপটে যেন একটা ঘূর্ণিঝড়ে ডালপালার আড়ালগুলো উড়ে গেলো, পড়ে রইলো শুধু নিচের নগ্ন থলেগুলো। মনে হলো, এই শেষ—তবু নিজেকে ছোটো করে তুলতে মাথাটা দু কাঁধের মাঝখানে গুঁজে দিলাম। যেন আমার উৎকণ্ঠা অনুমান করেই মেয়েটি ফের আমায় ভরসা দিতে চেষ্টা করলো, 'আমরা নিজেদের দেখতে পাচ্ছি বটে, তবে ওরা কিন্তু আমাদের দেখতে পাচ্ছে না।'

আগের বারের মতো ওর কথাগুলো এবারে আমার মনে তেমন করে কোনো প্রভাব ফেলতে পারলো না। একবার মনে হলো, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু সময়-মতো নিজেকে খুব জোর সামলে রাখলাম।

সেই ভয়ঙ্কর আলোর ঝলকানি ক্রমশ আবছা হয়ে এলো, এঞ্জিনের গর্জন মরে যেতে লাগলো একটু একটু করে। হেলিকপ্টারগুলো চলে গেলো, ফের অন্ধকার হয়ে উঠলো চতুর্দিক। পাছে শত্রুরা ফিরে আসে, সেই ভয়ে আমি তখনও নড়া-চড়া করতে ভরসা পাচ্ছিলাম না।

'ওরা ক্ষমতার বহর দেখাতে এসেছিলো, কিন্তু নিজেরাই কিছু দেখতে পায়নি।' মেয়েটি বললো, 'স্রেফ শান্ত হয়ে শুয়ে থাকলেই হলো, নড়াচড়া করা চলবে না।' তারপর মাঠের দিকে তাকিয়ে ও যাত্রীদের বোটে ফিরে আসার জন্যে ডাকলো।

কয়েকজন একেবারে ভিজে গিয়েছিলো। গজগজ করতে করতে তারা নোংরা পোশাক-আশাক বদলে নিলো। ফের গর্জন করে উঠলো আমাদের মোটর বোট।

মাঝ রাতের পর আমাদের দলটা তীরে নেমে পায়ে হাঁটতে শুরু করলো। ধানখেতের ভেতর দিয়ে কর্দমাক্ত এবড়ো-খেবড়ো পিছল খাতগুলো পেরিয়ে একজন একজন করে এগিয়ে চললাম সকলে। নিজেদের চটিগুলো আমরা হাতে করে বই-ছিলাম, হাতড়ে হাতড়ে এগুচ্ছিলাম এক পা এক পা করে। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই আমরা আছাড় খেয়ে পড়ছিলাম—একজনের পর আর একজন। নদীর তীরের কাছাকাছি একটা জায়গায় এসে মেয়েটি আমাদের দলটাকে থামতে বললো। তার-পর দুজন স্কাউটকে পাঠিয়ে দিলো জায়গাটা একবার পর্যবেক্ষণ করে আসার জন্যে।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই তারা শত্রুপক্ষের কম্যাণ্ডোদের সাক্ষাৎ পেলো। সাধারণত ওরা নদীর ধার বরাবর গাছগাছালির মধ্যে লুকিয়ে থাকে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ওরা খোলা মাঠেই আস্তানা গেড়ে বসেছিলো। চারদিক দিয়ে গুলি ছুটতে লাগলো, উড়ে যেতে লাগলো মাথার একেবারে কাছ ঘেঁষে।

'ভাই তু, তুমি দলটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও,' মেয়েটি হুকুম দিলো। 'আমি এখানে থাকবো।' ওর কথা বলার ধরনে মনে হলো, ও-ই এ দলের নেত্রী। ভীষণ ইচ্ছে করছিলো ওকেও আমাদের সঙ্গে যেতে বলি, কিন্তু ততোক্ষণে ও উধাও হয়ে গেছে। তখনও বাতাসে শিস তুলে গুলিগোলা ছুটছে, তারপর খসে পড়ছে একটু দূরে গিয়ে। খাতটার যথাসম্ভব কাছ ঘেঁষে আমরা শুয়ে রইলাম, মাথা তোলার কোনো চেষ্টাই করলাম না।

হঠাৎ আমার বাঁ দিক থেকে আমি একটা কারবাইনের আওয়াজ পেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুপক্ষের গুলিবর্ষণের নিশানা সে দিকে ঘুরে গেলো। বুঝতে পারলাম, মেয়েটি ইচ্ছে করেই নিজের দিকে শত্রুপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

'তু, ছুটে পালাও,' নির্দেশ এলো। আমাদের দলটা তৎক্ষণাৎ সামনের দিকে ছুটে গেলো। গুলিগোলাতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম না, কিন্তু ভয়ও লাগছিলো না—শুধু ভাবছিলাম, মেয়েটির ভাগ্যে কি ঘটতে চলেছে। মাঠের ভেতর দিয়ে এলো-মেলোভাবে ছুটে আমরা সামনের ঝোপঝাড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম, তারপর সেখান থেকে নদীর কাছে গিয়ে নিরাপদে নদী পেরুলাম।

গুলিবর্ষণ তখন আরও জোরদার হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে থেকে আমি মেয়েটির কারবাইনের আওয়াজ আলাদা করে বোঝার চেষ্টা করলাম—কিন্তু বৃথাই। মেয়েটির জন্যে আমার উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে উঠলো।

কম্যাণ্ডোদের নাগাল থেকে যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে ছুটে আসায় আমরা নির্দিষ্ট

সময়ের আগেই নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। জায়গাটা গ্রামেরই একটা অংশ। কিন্তু ডি. এ. ফাঁড়ি থেকে আগত নতুন পথপ্রদর্শকের জন্যে আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। একটা আনারস খেতে আমরা জড়ো হয়েছিলাম। শত্রুদের ছড়িয়ে-দেওয়া বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থে খেতটা এমনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে একটা গাছেও ফল ধরেনি। আমাদের মধ্যে কেউই হারিয়ে যায়নি। ছুটোছুটির সময় কেউ কেউ রবারের চটি হারিয়েছে, কেউ বা নদী পেরুতে গিয়ে হারিয়েছে কাঁধের ঝোলা। বয়সে সবার চাইতে বড়ো হলেও আমি কিন্তু কিছুই হারাইনি।

আমরা সবাই ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম। পথপ্রদর্শকরা আমাদের এক রাতের বিশ্রাম মঞ্জুর করেছিলো। কেউ কেউ দড়ির দোলনা ঝোলাবার হাঙ্গামা না করে ঝোলাগুলোকে বালিশ বানিয়ে মাটিতেই শুয়ে পড়লো এবং খুব শীগগিরি তাদের নাক ডাকতে শুরু করলো। অস্বস্তি ভরা মন নিয়ে আমি শুধু তন্দ্রায় ঢুলছিলাম। স্বপ্ন দেখলাম আমি যেন নিজের জেলার দিকে চলেছি। অনেক গ্রামই অদ্ভুত রকমের আলাদা দেখাচ্ছে। গ্রামের মানুষদের বাধ্য হয়েই নিজেদের ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে বন্দী শিবিরে গিয়ে বাস করতে হচ্ছে। পরে ওই ঘরবাড়িগুলোকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। বাগানগুলোও একেবারে বদলে গেছে। সাউ আর আমি যখন গ্রামে ফিরছিলাম, তখনকার দৃশ্যগুলো আমি আবার দেখতে পেলাম। দেখলাম আমরা পরস্পরের কাছ থেকে চিরদিনের মতো বিদায় নিচ্ছি, সাউ আমার হাতে চিরুনিটা তুলে দিচ্ছে—যেটা আমি আজও নিজের কাছে রেখে দিয়েছি। মাঝে মাঝেই আমি জেগে উঠছিলাম আর কম্যাণ্ডোদের কাযকলাপের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্যে যারা পেছনে রয়ে গেছে তাদের কথা, বিশেষ করে ওই মেয়েটির কথা ভাবছিলাম। নিজেকেই জিগেস করছিলাম, কি হতে পারে ওই মেয়েটির আর অন্যান্য সংযোগকারীদের? তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ছিলাম সুনিবিড় ক্লান্তিতে।

তারপর এক সময় পায়ের শব্দ, কণ্ঠস্বর আর হাসির অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলাম। জেগে উঠে দেখি, ভোর হয়েছে। আকাশের গায়ে টুকরো টুকরো মেঘ ঝুলে রয়েছে নিশানের মতো। সবাই উচ্ছল ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলছে। মোটর বোটের মেয়েটিও রয়েছে—ওর সারা গা ভেজা, পোশাক-আশাক কাদায় মাখামাখি। তার মানে, ও ঠিক সময় মতোই এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

আমি দলটার দিকে এগিয়ে গেলাম—ওরা তখন পরস্পরকে বিদায় জানাচ্ছে। মেয়েটিকে এবারে আরও ভালোভাবে দেখতে পেলাম। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে ও এইমাত্র একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে বেঁচে ফিরেছে, অথচ দেখে মনে হয় যেন তেমন সাংঘাতিক কিছুই হয়নি। ওর চেহারাটা রোদে-পোড়া, চোখ দুটি উজ্জ্বল,

বয়েস বছর কুড়ির বেশি নয়। কানের ঝুমকো দুলে ওকে আরও ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। আমার দিকে এগিয়ে এলো ও। আমি ওকে প্রশংসা আর কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইছিলাম। তাই স্মিত মুখে বললাম, 'মাগো, তোমার জন্যে আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো। তোমাদের পরিবারে তুমি কতো নম্বর সন্তান?'

'আমি এক নম্বর, কাকু।'

'তাহলে সবাই তোমাকে উত বোন বলে কেন? তার মানে কি তুমি বিবা…'

'না,' আমাকে প্রশ্নটা শেষ করার মতো সময় না দিয়েই ও বললো, 'আমাদের পরিবারে আমিই প্রথম জন্মেছি, আর আমিই শেষ। আমি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান।'

'তোমাদের গ্রামের নাম কি? মনে হচ্ছে, আমি আগে কোথায় যেন তোমাকে দেখেছি।'

'আমি কুলাও সিয়েঙ থেকে এসেছি।'

নিজের গ্রামের নামটা শুনে আমি শিউরে উঠলাম। মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে ফের জিগেস করলাম, 'চো মোই জেলার কুলাও সিয়েঙ গ্রাম—লঙ চাউ সা প্রদেশ, তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'কি নাম তোমার?'

'থু।'

'কি বললে তুমি? থু?' আমি অবাক হয়ে জিগেস করলাম, 'তোমার বাবার নাম সাউ আর মায়ের নাম বিন?'

মেয়েটি এতো অবাক হয়ে গিয়েছিলো যে ও একটিও কথা না বলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করতে লাগলো। ডি. এ. ফাঁড়ির পথ-প্রদর্শকরা তখনই রওনা হবার জন্যে আমাদের তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে বলছিলো। কিন্তু তাদের কোনো কথাই আমি শুনিনি, শোনার মতো কোনো ইচ্ছেও আমার ছিলো না। আমাদের দুজনের মধ্যে কারুরই তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। মেয়েটি তখনও গোল গোল চোখ দুটি মেলে আমার দিকে দৃষ্টি স্থির করে রেখেছে। নিজের মনেই বললাম, এ নিশ্চয়ই আমার ভাইঝিটির চোখ। তারপর জিগেস করলাম, 'তোমার বাবার নাম সাউ, তাই না মাগো?'

'হ্যাঁ…কিন্তু আপনি তা কি করে জানলেন?'

আবেগ সামলে নেবার চেষ্টা করতে করতে আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'আমি তোমার বা-কাকু। তোমার বাবা যেদিন বাড়ি থেকে চলে আসে, সেদিনটার

কথা তোমার মনে আছে? মনে আছে, সেদিন সে তোমাকে একটা চিরুনি কিনে দেবে বলে কথা দিয়েছিলো?'

মেয়েটি আলতো করে মাথা নাড়লো, 'হ্যাঁ, মনে আছে।'

তোমরা তো সবাই জানো, প্রতিরোধ-সংগ্রামের সময় এ ধরনের অপ্রত্যাশিত দেখাসাক্ষাৎ প্রায়শই ঘটতো। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আমি পকেট থেকে সেই হাতির দাঁতের চিরুনিটা বের করে নিলাম।

'তোমার বাবা এটা তোমাকে পাঠিয়েছে। এটা সে নিজের হাতে তৈরি করেছিলো।'

মেয়েটির বিহ্বল হয়ে ওঠা মুখখানিতে ওর চোখ দুটোকে যেন আরও বড়ো বড়ো লাগছিলো। চিরুনিটা হাতে তুলে নিলো ও। মনে হলো, চিরুনিটা যেন বাবার সঙ্গে ওর বিচ্ছেদের দিনটার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। দৃশ্যটা আমাকে এক চরম বেদনায় ভরিয়ে তুললো। আমি জানতাম ও প্রচণ্ড খুশি হয়েছে এবং ওর সেই নিবিড় আনন্দে আমার ব্যাঘাত ঘটাতে ইচ্ছে করছিলো না। ইচ্ছে হচ্ছিলো মিথ্যে করে বলি, 'তোমার বাবা ভালোই আছে। সে বাড়িতে ফিরতে পারছে না, তাই আমাকে বলেছে এটা তোমাকে পৌঁছে দিতে।'

মেয়েটির চোখের পাতা দুটি কেঁপে কেঁপে উঠলো। অস্ফুট কণ্ঠে ও বললো, 'আপনি ভুল করেছেন। আমার বাবা এ চিরুনি পাঠায়নি।'

আমি হতাশ এবং তার চাইতেও বেশি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম। জিগেস করলাম, 'সাউ তোমার বাবা আর বিন তোমার মা, ঠিক কি না?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

মেয়েটি তখন প্রায় কাঁদো-কাঁদো, অশ্রু ছলছল করছে ওর চোখ দুটিতে। তবু আবেগ সামলে ও বললো, 'যদি ভুল না করে থাকেন, তাহলে আপনি মিথ্যে বলছেন। আমি জানি আমার বাবা মারা গেছেন।'

ফের ওর চোখ দুটি চিকচিক করে উঠলো, অশ্রু নেমে এলো ওর দু গাল বেয়ে। বললো, 'আমি সমস্ত দুঃখ-কষ্ট জয় করতে পারি। আমাকে সত্যি কথা বলতে ভয় পাবেন না। দু বছর আগেই আমি জানতে পেরেছি, আমার বাবা মারা গেছেন। তারপরেই আমি যোগাযোগের কাজ করার জন্যে মায়ের কাছে অনুমতি চাইলাম।'

মেয়েটি আরও কিছু বলতে চাইছিলো, কিন্তু বলতে পারলো না—কথাগুলো ওর গলায় আটকে গেলো। মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো ও, চুলগুলো শুধু কাঁপতে লাগলো থিরথির করে। আমিও চুপ করে রইলাম। দলের সঙ্গীরা রওনা হবার জন্যে আমাকে তাড়া দিচ্ছিলো। বুঝতে পারছিলাম, আর বেশিক্ষণ

থাকা যাবে না। তাই থুয়ের ঠিকানা চাইলাম, সংক্ষেপে ওর মা আর আত্মীয়-স্বজনদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলাম।

থুয়ের সঙ্গে দেখা হবার আনন্দটুকু টিকে ছিলো মাত্র কয়েক মুহূর্ত। রওনা হবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছিলো। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশেই ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তাহলে চলি, মাগো!' কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে ও অস্ফুটে কি যেন বললো, আমি শুনতে পেলাম না। খানিকটা দূরে এগিয়ে গিয়ে পেছনে ফিরে দেখি, ও-ও আমাদের পেছন পেছন আসছে। একটা নালার কাছে এসে ওকে থমকে দাঁড়াতে হলো। বাতাসে দুলে দুলে ওঠা ধানের চারাগুলো যেন ঢেউয়ের মতো ছুটে যাচ্ছিলো ওর দিকে। ওর পিছনে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থে পাতা ঝরে যাওয়া নারকেল গাছ-গুলোকে মনে হচ্ছিলো যেন বাতাসে ঝুলে থাকা কোনো রাক্ষুসে মাছের কঙ্কাল। গাছগুলোতে নতুন পাতা এসেছে, দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন আকাশের দিকে উদ্যত একরাশ তলোয়ারের অরণ্য।

অনুবাদ / দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েদী

রোজেলিও সিকাত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিশেষ করে জাপানী অবরোধের পর থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে, ফিলিপাইনের সাহিত্যে তার প্রতিফলন স্পষ্টই চোখে পড়ে। এই সময় বাস্তববাদী সমাজ-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ যে সমস্ত তরুণ সাহিত্যিক নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন, রোজেলিও আর সিকাত তাঁদের অন্যতম। জন্ম ১৯২৭ সালে, আতেনিও শহরে। পেশায় সাংবাদিক। তাগালগ এবং ইংরেজী—উভয় ভাষাতেই লেখেন। 'নতুন দিগন্ত' ১৯৫৯ এবং 'অ্যাগোস সা দিয়ারতা' বা 'নির্জন মরুদ্যান' ১৯৬৫ তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন।

প্রথমে পুরভবন প্রাঙ্গণে ভিড় খুব কমই ছিলো, কিন্তু বেলা যত বাড়তে লাগলো, কাবেস তানোর খুন হওয়ার খবরটা যত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, মানুষের ভিড়ে পুরভবন প্রাঙ্গণ ততই উপচে উঠতে শুরু করলো। ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়ি—জেল-ফটকটার সামনে যাবার জন্যে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

কথাটা কি সত্যি, তাতা সেলো?'

'জমি থেকে উনি আমাকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন, তাই আমি ওঁর গলায় কাস্তের কোপ বসিয়ে দিয়েছি।'

জেলখানার ভেতরে তাতা সেলো, একজন বৃদ্ধ চাষী, লোহার গরাদ শক্ত করে আঁকড়ে রয়েছে। তার কপালে হাঁ-হয়ে থাকা ইঞ্চি খানেক লম্বা গভীর একটা ক্ষত-চিহ্ন। অন্ধকার হাতড়ে বেড়ানো মানুষের মতো উদাস দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রয়েছে, ঝাপসা চোখের কোণ থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা। তার পরনে কনুই আর পিঠের কাছে তাপ্পি দেওয়া জীর্ণ কামিজ, এবং টেকসই সাদা নুনের বস্তা থেকে তৈরি হাটু পযন্ত লম্বা প্যান্ট, তাতে শুকিয়ে যাওয়া কাদার ছোপ ছোপ দাগ। অন্য একজন চাষী তার সঙ্গে কথা কইছে। লোকটার জমি তাতা সেলোর জমির প্রায় লাগোয়া। বিশৃঙ্খল মানুষের ভিড় সামলানো পুলিস-বেষ্টনী ভেদ করে সে কোন রকমে সামনে পৌছতে পেরেছে।

'আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না,' চাষীটা মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, 'সত্যিই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, তাতা সেলো!'

কপালের ক্ষতচিহ্নে তাতা সেলো কাঁপা কাঁপা হাতে আঙুল বোলালো। রক্ত এখন জমাট বেঁধে গেছে। জেলখানা থেকে একটু দূরে, তার ঠিক সামনেই, সেপাইরা

চেঁচিয়ে পেছনে ঠেলে তাকে দেখতে চাওয়া মানুষদের ভিড় সামলাচ্ছে। তাদের মাথার ওপরে সূর্যের জ্বলন্ত উত্তাপ। কোথাও এতটুকু বাতাস বইছে না। পায়ে পায়ে উড়ছে ধুলোর মেঘ।

'কেন উনি আমাকে আমার জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চাইলেন?' ব্যথাহত স্বরে তাতা সেলো বললো। 'আমি কি ওঁকে কখনও ঠকিয়েছি, ওঁর ভাগ কম দিয়েছি? কথাটা কি সত্যি নয় যে ফসল কাটার সময় কাউকে আমি এক আঁটিও খড় দিই না বলে অনেকেই আমাকে অপছন্দ করে?'

গরাদ-ঘেরা জেলখানার সামনে তাতা সেলো একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার দৃষ্টি রয়েছে বাইরের দিকে, কিন্তু কোনোকিছু বা কাউকেই লক্ষ্য করছে না।

'কাবেসাকে কাস্তের কোপ বসানো তোমার উচিত হয়নি।' কথাটা বললো একজন তরুণ, সান রোকোয়ের এক ধনী জমিদারের ছেলে, পরিচয়সূত্রে যার পুলিস-বেষ্টনী আর জেলখানার মাঝে অবাধে ঘুরে বেড়াতে কোনো বাধা নেই। ছেলেটি বেশ লম্বা, পরিষ্কার গায়ের রঙ, চোখে রোদ-চশমা, পরনে খেলোয়াড়দের মতো দামী লাল বুক-খোলা সার্ট। কোমরে হাত রেখে, ধূমপান করতে করতেই সে তাতা সেলোর সঙ্গে কথা বলছিলো।

তাতা সেলো তরুণটির দিকে তাকালো।

'উনি আমাকে জমি থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন,' অনুযোগের স্বরে সে বললো। 'ক্ষেত-খামারে কাজ করতে না পারলে কোথায় যাবো বলুন?'

ভাব-ভঙ্গি এবং চেহারা দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় ধনী তরুণটির বয়েস কুড়ির বেশি নয়। ভারিক্কি চালে সে বললো, 'কাবেসাকে খুন করার সেটাই যথেষ্ট কারণ হতে পারে না। ওঁর জমি তুমি চাষ করো। উনি চাইলে যে কোনো সময়েই তোমাকে জমি থেকে তাড়াতে পারেন।'

তাতা সেলোর শীর্ণ মুখখানা গরাদের ফাঁকে দিয়ে প্রায় বেরিয়ে এসেছে।

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছেন না।' তরুণটির দিকে তাকিয়ে সেলো হাসার চেষ্টা করলো, যে তখন জ্বলন্ত সিগারেটটা মাটিতে ফেলে গোড়ালি দিয়ে পিষছে। 'আপনি হয়তো জানেন না, জমিটা একদিন আমাদেরই ছিলো। বউয়ের অসুখের সময় আমি ওটা বন্ধক রেখেছিলুম। ঠিক সময়ে টাকা দিয়ে কাবেসার কাছ থেকে ছাড়াতে পারিনি বলে তামাদি হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আমি আজও ওই জমিটা কিনে নেওয়ার স্বপ্ন দেখি। সেই জন্যে খামারে তোলার সময় কাউকে আমি এক আঁটিও খড় দিই না। তাছাড়া জমিটা যদি কিনতে নাও পারি, নিজে হাতে চাষ তো করতে পারি! বিশ্বাস করুন, আমি কাবেসার কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি

করেছি, বলেছি, "দোহাই আপনার, আমাকে তাড়াবেন না। বুড়ো হয়েছি সত্যি, কিন্তু আপনি তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন, আমি এখনও শক্ত রয়েছি, এখনও চাষবাসের কাজ নিজেই করতে পারি।" কিন্তু উনি আমার কথা কানেই নিলেন না। বরং এই দেখুন, নিজের চোখেই দেখুন উনি কি করেছেন! বেতের ছড়ি দিয়ে আমার কপাল ফাটিয়ে দিয়েছেন।'

তরুণটি নতুন আর একটা সিগারেট বার করে ধরালো, তারপর পায়ে পায়ে যেখানে একজন পুলিস কর্মচারী দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই দিকে এগিয়ে গেলো।

'সত্যি কি ঘটেছিলো বলো তো, তাতা সেলো?'

চকিতে দৃষ্টি ফেরাতেই তাতা সেলো দেখতে পেলো গরাদের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে একটি চাষীর ছেলে। ম্লান ঠোঁটে সে হাসলো। এখন অন্তত এমন একজনকে পাওয়া গেছে, যে চাষী কিংবা চাষীর ছেলে, যে নিশ্চয়ই তার কথা বিশ্বাস করবে। ছেলেটির মাথার চওড়া কানাওয়ালা টুপিটা কপালের ওপর নেমে এসেছে। রোদে-পোড়া মসৃণ তামাটে চামড়া, হাতে পায়ে ধান গাছের ধারালো পাতায় ছড়ে যাওয়া সাদা সাদা দাগ। কোমরের কাছে, কাদার ছোপ-লাগা প্যান্টের মধ্যে গোঁজা রয়েছে একটা কাস্তে।

'আমাকে খুঁজতে উনি মাঠে গিয়েছিলেন, বাবা,' তাতা সেলো ছেলেটিকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলো। 'খালপাড়ে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিলো। উনি আমাকে বললেন জমি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে, এখন অন্য একজন লোক চাষ করবে। আমি ওঁর হাতে-পায়ে ধরে অনেক কাকুতি-মিনতি করলুম, বললুম আমাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করবেন না। কিন্তু উনি আমার কথা কানেই নিলেন না, বেতের ভারি ছড়িটা দিয়ে মারলেন। মাঠে কাজ না করতে পারলে কোথায় যাবো তুমিই বলো?'

কিছুটা বুঝতে পারার ভঙ্গিতে ছেলেটি চোখের পাতা নাচালো।

'আমি জানি, সত্যিই তোমার যাবার কোনো জায়গা নেই, তাতা সেলো।'

বৃদ্ধের চিবুক বেয়ে নেমে এলো জলের দুটি ধারা। ছেলেটি নীরবে তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে।

'উনি কি মারা গ্যাছেন?'

তাতা সেলোর আঙুলের গাঁটগুলো সাদা হয়ে উঠেছে, মাথাটা ঝুলে পড়েছে হাতের বাঁকে। কান্নার নিরুদ্ধ আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে সারা দেহ।

'সালিং এখন কেমন আছে, তাতা সেলো?'

সালিং তাতা সেলোর একমাত্র মেয়ে। মা-মরা, বছর সতেরো বয়েস। কাবেসাং তানোর বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। মাত্র দুদিন আগে ঘরে ফিরে এসেছে। তাতা

সেলোর আপত্তি সত্ত্বেও গতবছর নবান্ন উৎসবের সময় চাষীরা ওকে 'রানী' নির্বাচন করেছিলো।

'সালিং এখন কেমন আছে, তাতা সেলো ?'

তাতা সেলো দু হাতে গরাদ দুটো আরও শক্ত করে চেপে ধরলো। নগরপাল এখনও তাতা সেলোর সঙ্গে কথা বলেননি। পুলিস-প্রধানকে নিয়ে তিনি যখন এলেন তখন প্রায় এগারোটা। এতক্ষণ ওঁরা কাবেসার বাড়িতে ছিলেন। প্রচণ্ড গর্জন করে ভিড়ের মধ্যে এসে জীপটা থামতে না থামতেই সবাই ছেঁকে ধরলো।

'উনি কি মারা গ্যাছেন, মেয়র ?'

'কোথায় কোপ মারা হয়েছে ?'

নগরপালের কাছাকাছি পৌঁছনোর জন্যে ঘেমে নেয়ে ওঠা মানুষগুলো তখন নিজেদেরই মধ্যে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিয়েছে। মেদবহুল হাত দুটো তুলে নগরপাল ওদের শান্ত হতে বললেন। দশাসই চেহারার পুলিস প্রধান কিন্তু কয়েকজনকে লাথি মেরে সামনে থেকে সরিয়ে দিলেন।

'কোন জায়গায় কোপ মারা হয়েছে ?'

'মুখে,' ঠোঁটের ডান কোণ থেকে পুরুষ্ট তর্জনীটাকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে গিয়ে উনি ঘাড়ের পেছনে কানের পাশ পর্যন্ত একটা জায়গা নির্দেশ করলেন। 'দাঁতগুলো একেবারে ছিটকে বেরিয়ে গ্যাছে। বেচারি কাবেসাকে চেনাই যাচ্ছে না।'

জনতা আবার বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠায় পুলিসকে লাঠি চালাতে হলো। নগরপাল এবার সিদ্ধান্ত নিলেন দফতরে ডেকে পাঠিয়ে তাতা সেলোর সঙ্গে কথা বলবেন। দু-জন সেপাই গেলো বন্দীশালা থেকে তাকে আনার জন্যে।

'তোমার নির্ঘাত জেল হবে!' তাতা সেলো দফতরে ঢুকতে না ঢুকতেই নগরপাল মন্তব্য করলেন, তারপর ইশারায় তাকে সামনের কুর্সিটায় বসতে বললেন। 'সত্যি করে বলো তো, কি এমন ঘটেছিলো যে কাবেসার গলায় কোপ বসাতে গেলে ?' নগরপালের গলায় ফুটে উঠলো কর্তৃত্বের সুর।

জবাব দেবার আগে তাতা সেলো একটু সময় নিলো।

'উনি আমাকে আমার জমি থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, প্রেসিদেন্তি।' নগরপ্রধানকে মেয়র না বলে 'প্রেসিদেন্তি' বলেই সম্বোধন করলো তাতা সেলো। আসলে কুয়েজোনের সময়ে মেয়রকে 'প্রেসিদেন্তি' বলেই সম্বোধন করা হতো। 'আমি চলে যেতে চাইনি। জমিটা একসময়ে আমাদেরই ছিলো, আমি শুধু বন্ধক রেখেছিলুম। ঠিক সময়ে টাকা দিতে পারিনি বলে উনি জমিটা তামাদি করে নিয়েছিলেন।'

'ওসব কথা আমি আগেই শুনেছি।' টেবিল চাপড়ে নগরপাল বলে উঠলেন।

তাতা সেলো রীতিমতো দমে গেলো। পরে যখন আবার মুখ তুললো, তার ঝাপসা চোখের কোণে টল টল করছে দু ফোঁটা অশ্রু।

'আমি এখনও শক্ত আছি, নিজে হাতে চাষ করতে পারি,' ধরা ধরা গলায় তাতা সেলো বললো। 'জমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটা কি ওঁর উচিত হয়েছে, আপনিই বলুন? খাটার মতো শক্তি আমার এখনও আছে।'

'কোথায় নিয়ে গিয়ে তুমি কাবেসাকে কোপ বসিয়েছিলে?'

'খালের ধারের জমিতে আমি যখন আল বাঁধছিলুম, কাবেসা তখন সেখানে গিয়েছিলেন। আমি জানি উনি অনেকক্ষণ ধরেই আমাকে লক্ষ্য করছিলেন, তাই আমিও ওঁকে আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করছিলুম যে আমার শক্তি আছে। চাষ-বাষের কাজে আমি এখনও যথেষ্ট খাটতে পারি। হঠাৎ উনি আমাকে ডাকলেন। খালপাড়ে আমি ওঁর কাছে গেলুম। উনি বললেন জমিটা ছেড়ে দিতে হবে, এখন থেকে অন্য আর একজন কাজ করবে।'

'আমি বললুম, "কেন, হুজুর? আমি কি আপনাকে মান্য করিনি? ভাগে আমি কি কখনও আপনাকে ঠকিয়েছি?" উনি বললেন, "জমি তোমাকে ছেড়ে দিতেই হবে।" আমি আবার বললুম, "কেন হুজুর, আপনি তো নিজে চোখেই দেখছেন আমি এখনও খাটতে পারি!" উনি কিন্তু আমার কোনো কথাই কানে নিলেন না। হাতে-পায়ে ধরে অনেক কাকুতি-মিনতি করলুম, উনি বেতের ছড়ি দিয়ে আমার কপাল ফাটিয়ে দিলেন।'

'আর সেইজন্যে তুমি ওঁর গলায় কাস্তের কোপ বসিয়ে দিলে?' চাপা গলায় পুলিস-প্রধান গর্জে উঠলেন।

মুহূর্তের জন্যে নগরপালের সারা দফতর জুড়ে নেমে এলো একটা নীরবতা। সবার, এমন কি কেরানিদেরও দৃষ্টি এখন স্থির হয়ে রয়েছে তাতা সেলোর ওপর। জবুথবু হয়ে সে বসে রয়েছে, নোংরা প্যান্টের ওপর হাতের আঙুলগুলো অস্থির ভাবে কাঁপছে। জুতো না পরার ফলে চামড়া ফেটে যাওয়া কাদামাখা রুক্ষ গোড়ালি দুটো ঘষছে সদ্য মোম-পালিশ করা মেঝেতে।

'আমি শুনেছি তোমার মেয়ে কাবেসার বাড়িতে কাজ করতো,' নগরপাল জিগেস করলেন।

তাতা সেলো কোনো জবাব দিলো না।

'তোমাকে জিগেস করা হচ্ছে।' পুলিস-প্রধান কনুই দিয়ে তাকে গোঁতা দিলেন।

তাতা সেলো মুখ তুললো।

'সালিং ঘরে ফিরে এসেছে, প্রেসিদেন্তি।'

'কবে ?'

'দুদিন আগে।'

'ও ফিরে এলো কেন ?'

তাতা সেলোর হাত দুটো আপনা থেকেই মুঠো হয়ে গেলো, নত হয়ে এলো চোখের পাতা। চাপা স্বরে সে বললো, 'ও অসুস্থ, প্রেসিদেন্তি।'

পুরভবনের ঠিক উলটো দিকের গির্জায় বারোটা বাজার ঘণ্টাধ্বনি শোনা যেতেই নগরপাল তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্নভোজের জন্যে বেরিয়ে গেলেন। তাতা সেলো রইলো পুলিস-প্রধান সমেত তিনজন আরক্ষীর হেফাজতে।

'তাহলে তুমি কাবেসাকে খুন করেছো ?' তাতা সেলোর দিকে তাকিয়ে পুলিস-প্রধান রুক্ষ-স্বরে বললেন, তারপর নতমুখে নিশ্চল বসে থাকা বৃদ্ধ মানুষটার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন।

'উনি আমাকে আমার জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন, হুজুর।'

পুলিস-প্রধানের বাদামী হাতের মুঠোটা চকিতে ছিটকে গেলে, তাতা সেলো মুখ থুবড়ে পড়লো মেঝেতে। কপালের ক্ষতস্থানটা হাত দিয়ে চেপে ধরলেও আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে এলো গাঢ় রক্তের ধারা।

'উনি আমাকে মেরেছেন, বেত দিয়ে আমার কপাল ফাটিয়ে দিয়েছেন, হুজুর।' সজল চোখে কাঁপতে কাঁপতে সে পুলিস-প্রধানের খাকি উর্দিটা আঁকড়ে ধরলো।

পিঠের কাছে তালি দেওয়া কামিজটা খামচে ধরে পুলিস-প্রধান তাকে টেনে তুলেই প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুঁষি মারলেন তার পেটে।

'উনি আমাকে মেরেছেন, বিশ্বাস করুন হুজুর,' কাতরাতে কাতরাতে তাতা সেলো কোনো রকমে বললো, 'বেতের ছড়ি দিয়ে উনি আমাকে মেরেছেন।'

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেপাই দুজন তখন নির্বিকার চিত্তে নিজেদের মধ্যে কথা কইছে। ওদের একজন বললো, 'আমার চাকরির জন্যে কাবেসাই মেয়রের কাছে তদ্বির করেছিলেন।'

পুলিস-প্রধান যখন আর একবার ঘুঁষি চালালেন, তাতা সেলো তখন এক-টুকরো ছেঁড়া নেকড়ার মতো নেতিয়ে পড়লো মাটিতে।

পরের দিন নিশান্তিকায় আবার টকটকে লাল সূর্য উঠলো। পুরভবন প্রাঙ্গণ তখন ঝাঁট দেওয়া হয়নি, আগের দিনের ছেঁড়া কাগজের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সারা মাঠে। ফলে যখনই দমকা বাতাস বইছে, ছেঁড়া কাগজের টুকরো আর ধুলোর ঘূর্ণি

পরস্পরে লুকোচুরি খেলছে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার পুরভবন প্রাঙ্গণে ভিড় বাড়তে শুরু করলো। মাঠ থেকে আসা চাষীদের চাইতে শহরে লোকের সংখ্যাই ছিলো বেশি। কেননা বিকেলে কাবেসাং তানোকে সমাধিত করার খবরটা আগেই ছড়িয়ে পড়েছিলো। এখন ওরা অবাক বিস্ময়ে খুনী তাতা সেলোর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছে যেন সে খাঁচায় বন্দী কোনো অস্বাভাবিক জীব।

গতকালের মতো আজও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সূর্য। তখন প্রায় দুটো। নেতিয়ে পড়ে থাকা বাবার বিষণ্ণ মূর্তি দেখে তাতা সেলোর মেয়ে আঁতকে উঠলো।

সালিং এসেছে শুনে নগরপাল ওকে দফতরে ডেকে পাঠালেন। একটু পরে তাতা সেলোকেও নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। সেপাই দুজনকে প্রায় ধরাধরি করে আনতে হলো, কেননা তাতা সেলোর তখন হাঁটার ক্ষমতা ছিলো না।

মেয়েকে নগরপালের সামনে বসে থাকতে দেখে তাতা সেলোর মনে হলো তার হারানো শক্তি যেন একটু একটু করে ফিরে আসছে। সালিংও দৌড়ে গেলো বাবাকে জড়িয়ে ধরার জন্যে।

'এখানে কেন এলি? অসুস্থ শরীরে তোর এখানে আসা উচিত হয়নি, সালিং।' সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়া গলায় তাতা সেলো কোন রকমে বললো।

প্রায় অচেতন বাবার শীর্ণ শরীরটাকে আঁকড়ে সালিং চুপচাপ বসে রইলো। ওর সুন্দর মুখখানা ম্লান, ঘন কালো চুলগুলো এলোমেলো, পরনের পোশাকটা পালটানো হয়নি গত দুদিন।

'যা হয় হোক, তুই ঘরে যা, সালিং!' কোনো রকমে ফিসফিসিয়ে বললো সে। 'ঘরে যা মা···ওদের কাউকে কিছু বলিস না···'

কুসিতে এলিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নগরপাল হুকুম দিলেন তাকে জেলখানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার। জনতা আবার ভিড় করলো ফটকের সামনে। শোনা গেলো গুঞ্জন আর নানা ধরনের মন্তব্য।

কে যেন বললো,'আমি জানি, গতকাল রাত্তিরে ভিজে বস্তা জড়িয়ে ওকে মারা হয়েছে, সেই জন্যে গায়ে কোনো দাগ নেই।'

'শুনলুম ওর মেয়ে এসেছে?'

'হ্যাঁ, মেয়রের ঘরে বসে রয়েছে।'

সেপাই দুজন তাতা সেলোকে কারা-কুঠরিতে ফিরিয়ে আনতেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়লো এক কোণে। কিন্তু দরজার তালা লাগানোর শব্দে সে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো, কোনো রকমে নিজেকে টেনে নিয়ে গেলো গরাদের সামনে। দু হাতে গরাদ

দুটোকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরলো, যেন এখুনি মুচড়ে ভেঙে ফেলবে। সেপাই দু-জনকে সে ডাকতে চাইলো, কিন্তু গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরুলো না। তাছাড়া সেপাই দুজন তখন চলে গেছে। গরাদের মধ্যে দিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে সে ইশারা করার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার আগেই মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে। কেউ একজন তাকে না ডাকা পর্যন্ত সে ওই ভাবেই পড়ে রইলো।

'তাতা সেলো…তাতা সেলো…'

তাতা সেলো ধীরে ধীরে মুখ তুললো। তার ঝাপসা দৃষ্টির সামনে কারো চেহারা স্পষ্ট না হয়ে উঠলেও, গলার স্বরটা তার খুব একটা অচেনা নয়।

কণ্ঠস্বরটা গতকালের সেই কিষাণ ছেলেটির। এখন সে উবু হয়ে বসে একটা হাত বাড়িয়ে তাতা সেলোর হাতটা জড়িয়ে ধরেছে।

'প্রেসিদেন্তির ঘরে সালিং রয়েছে,' ক্ষীণ স্বরে তাতা সেলো কিশোরটিকে বললো, 'তুমি ওকে বাড়ি যেতে বলো…তুমি বরং ওকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাও…' তার মুখটা আবার মাটিতে থুবড়ে গেলো। কিশোরটি মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলো, তবু মনে মনে স্থির করলো বৃদ্ধের ইচ্ছাকেই পূরণ করবে।

বিকেল প্রায় চারটে। সূর্য ঢলে পড়েছে এক পাশে। জেলখানার গরাদ ধরে তাতা সেলো বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সূর্যের একফালি বাঁকা রশ্মি এসে পড়েছে ব্যাকুল হয়ে কি যেন খুঁজে ফেরা তার ঝাপসা দুটি চোখে। কারা-কুঠরির বাইরে দাঁড়িয়ে অনুতপ্ত কিশোরটি বলছে তাকে নগরপালের দফতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাতা সেলো কিন্তু তার কথা কিছুই শুনছে না, নিজের মনেই সে তখন বিড়বিড় করে কি সব যেন বলছে…

অনুবাদ / অসিত সরকার

বেলথাজারের দুর্লভ একটি বিকেল

গ্যাব্রিয়েল গার্থিয়া মার্কোয়েজ

তাই শুধু তথ্যগত দিক থেকে জানিয়ে রাখি—কলোম্বিয়ার এই লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের জন্ম ১৯২৮ সালে আরাকাতাকার ছোট্ট একটি গ্রামে। বোগোটার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করার পর সাংবাদিকতাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন এবং বিশ্বের বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন। বর্তমানে স্পেনের বার্সিলোনায় বসবাস করছেন। অত্যন্ত স্বাভাবিক অথচ নিজস্ব একটি ভঙ্গির জন্যে মার্কোয়েজের গল্প বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। 'লিফ স্টর্ম', 'নো ওয়ান রাইটস টু দ্য কর্নেল' এবং 'ইনোসেন্ট ইরেনদিরা' তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন।

খাঁচাটা তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। অভ্যেসের বশে বেলথাজার সেটাকে ঘরের ছাঁইচে ঝুলিয়ে রাখলো। দুপুরে তার খাওয়াদাওয়া যখন শেষ হলো ততোক্ষণে সবাই বলতে শুরু করেছে, ওটা পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে সুন্দর খাঁচা। এতো লোক ওটাকে দেখতে এসেছে যে বাড়ির সামনে রীতিমত একটা ভিড় জমে উঠেছে। অতএব খাঁচাটাকে নামিয়ে, বেলথাজারকে দোকান বন্ধ করে দিতে হলো।

'তোমাকে দাড়ি কামাতে হবে,' স্ত্রী উরসুলা তাকে বললো, 'একটা সন্ন্যাসীর মতো দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর দাড়ি কামানো খারাপ,' জবাব দিলো বেলথাজার।

তার গালে দু সপ্তাহের দাড়ি—ছোটো ছোটো, শক্ত শক্ত আর খোঁচা খোঁচা—ঠিক যেন খচ্চরের কেশর আর কোনো ভয়-পাওয়া বালকের সাধারণ অভিব্যক্তির মতো। কিন্তু অভিব্যক্তিটা কপট। ফেব্রুয়ারীতে বেলথাজারের বয়েস তিরিশ হলো, চার বছর ধরে সে উরসুলার সঙ্গে বাস করছে, কিন্তু বিয়ে করেনি এবং ওদের কোনো সন্তানাদিও হয়নি। জীবন তাকে সতর্ক হবার জন্যে অনেক যুক্তি দেখিয়েছে, কিন্তু ভয় পাবার জন্যে একটাও না। সে জানতোই না যে কিছু কিছু লোকের কাছে তার সদ্য সদ্য তৈরি করা খাঁচাটা পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে সুন্দর। শিশুকাল থেকে সে খাঁচা বানানোয় অভ্যস্ত, অন্যগুলোর তুলনায় এটাকে তার আদৌ তেমন কঠিন কাজ বলে মনে হয়নি।

'তাহলে একটু বিশ্রাম নাও,' মহিলা বললো। 'ওই দাড়ি নিয়ে তুমি কোথাও মুখ দেখাতে যেতে পারবে না।'

বিশ্রাম করতে করতেই প্রতিবেশীদের খাঁচাটা দেখাবার জন্যে তাকে বেশ কয়েক-বার দড়ির দোলনাটা থেকে নেমে আসতে হলো। তখন পর্যন্ত উরসুলা খাঁচাটার দিকে সামান্যই মনোযোগ দিয়েছে। আসলে ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো—তার কারণ ওই খাঁচাটার পেছনে পুরোপুরি লেগে থাকতে গিয়ে ওর স্বামী নিজের ছুতোরখানার কাজে অবহেলা করেছে, দু সপ্তাহে খুব কম সময়ই ঘুমিয়েছে, শুধু এপাশ-ওপাশ করেছে আর বিড়বিড় করে অসংলগ্ন প্রলাপ বকেছে এবং দাড়ি কামানোর কথা চিন্তাও করেনি। কিন্তু সত্য সম্পূর্ণ হওয়া খাঁচাটার চেহারা দেখে ওর সমস্ত বিরক্তি জল হয়ে গেলো। বেলথাজার যখন ঘুমের চটকাটা থেকে জাগলো ততোক্ষণে উরসুলা তার পাতলুন এবং একটা জামা ইস্ত্রি করে, দোলনাটার কাছে একটা কুর্সিতে রেখে দিয়েছে আর খাঁচাটাকে নিয়ে রেখেছে খাওয়ার টেবিলে। চুপচাপ বসে খাঁচাটাকে দেখছিলো ও।

'এটার জন্যে তুমি কতো নেবে?' জিগেস করলো উরসুলা।

'জানি না,' বেলথাজার জবাব দিলো। 'তিরিশ পেসো চাইবো, দেখি যদি বিশ দেয়।'

'পঞ্চাশ চেয়ো। এই দু সপ্তাহে তুমি অনেকটা ঘুম নষ্ট করেছো। তাছাড়া খাঁচাটাও তো বেশ বড়োসড়ো। আমার মনে হয় এতো বড়ো খাঁচা আমি জন্মেও দেখিনি।'

বেলথাজার দাড়ি কামাতে শুরু করলো।

'তোমার কি মনে হয় ওরা আমাকে পঞ্চাশ পেসো দেবে?'

'মি. চেপে মন্তিয়েলের কাছে সেটা কিছুই নয় আর খাঁচাটাও ওই দাম পাবার যোগ্য।' উরসুলা বললো, 'তোমার ষাট চাওয়া উচিত।'

বাড়িটা দমবন্ধ করা ছায়ায় পড়ে আছে। এটা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ, ঘুঘুরে পোকাগুলোর অবিশ্রান্ত গুঞ্জনে গরমটা যেন আরও কম সহনীয় বলে মনে হয়। পোশাক-আশাক পরে, বাড়িটাকে একটু ঠাণ্ডা করে তোলার বাসনায় বেলথাজার উঠোনের দরজাটা খুলে দিতেই একদল বাচ্চাকাচ্চা খাওয়ার ঘরে ঢুকে পড়লো।

খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিলো। অশক্ত, পঙ্গু স্ত্রীর সঙ্গে দুপুরের খানা খেতে খেতে জীবন সম্পর্কে সুখী, কিন্তু নিজের পেশায় ক্লান্ত হয়ে ওঠা বৃদ্ধ চিকিৎসক ডক্টর অক্টেভিয়ো জিরালদো বেলথাজারের খাঁচাটার কথা চিন্তা করছিলেন। ভেতরের উঠোনে—গরমের দিনে যেখানে ওঁরা টেবিলটা পাতেন—অনেকগুলো ফুলের টব আর দুটো খাঁচা বোঝাই ক্যানারি পাখি। ওঁর স্ত্রী পাখি ভালোবাসেন এবং এতো বেশি ভালোবাসেন যে উনি বেড়াল দেখতে পারেন না, কারণ তারা পাখিগুলোকে খেয়ে

ফেলতে পারে। সেদিন বিকেলে স্ত্রীর কথা ভাবতে ভাবতে ডক্টর জিরাল্দো একটি রোগীকে দেখতে গেলেন এবং সেখান থেকে ফিরে বেলথাজারের বাড়িতে গেলেন খাঁচাটাকে একবার ভালো করে দেখবেন বলে।

বেলথাজারের খাওয়ার ঘরে অনেক লোক। প্রদর্শনীর জন্যে খাঁচাটাকে টেবিলের ওপরে রাখা হয়েছে: ওপরে তারের তৈরি বিশাল গম্বুজ, ভেতরে তিনটে তলা, এধার থেকে ওধারে যাবার বারান্দা-পথ, খাওয়া এবং ঘুমের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন কুঠরি, তাছাড়া পাখিদের বিনোদনের জন্যে আলাদা জায়গায় দোলনা ঝোলানো—এ যেন বিশাল এক বরফ-কারখানার ছোট্ট একটা নকশা। স্পর্শ না করে খাঁচাটাকে ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে ডাক্তার ভাবলেন, যতোটা নাম ছড়িয়েছে আসলে খাঁচাটা তার চাইতেও ভালো এবং স্ত্রীর জন্যে আজ অব্দি তিনি যতো খাঁচার স্বপ্ন এঁকেছেন এটা তাদের চাইতে অনেক বেশি সুন্দর।

'এ হলো কল্পনার উল্লম্ফন।' ভিড়ের জটলা থেকে বেলথাজারকে খুঁজে নিয়ে ডাক্তার তার দিকে জননীসুলভ দৃষ্টি মেলে ধরলেন। 'তুমি একজন অসাধারণ স্থপতি হতে পারতে হে।'

বেলথাজার লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো, 'ধন্যবাদ।'

'সত্যি বলছি,' ডাক্তার বললেন। যৌবনকালে সুন্দরী ছিলেন—এমন মহিলাদের মতো তার চেহারাটিও মসৃণ ও ঈষৎ নাদুসনুদুস। হাত দুটিও নরম-কোমল। ল্যাটিন বলতে থাকা পুরোহিতের মতো কণ্ঠস্বরে তিনি বললেন, 'এর মধ্যে পাখি রাখারও কোনো প্রয়োজন নেই।' খাঁচাটাকে তিনি দর্শকদের চোখের সামনে ঘুরিয়ে ধরলেন, যেন ওটাকে তিনি নিলামে বিক্রি করতে চলেছেন। তারপর বললেন, 'গাছে ঝুলিয়ে দিলে এটা নিজে থেকেই গান গাইবে।' খাঁচাটা ফের টেবিলে রেখে, এক মুহূর্ত একটু চিন্তা করে, ফের তিনি সেটার দিকে তাকালেন, 'বেশ, তাহলে আমিই এটা নেবো।'

'এটা বিক্কিরি হয়ে গেছে,' উরসুলা বললো।

'এটা মি. চেপে মন্তিয়েলের ছেলের,' ব্যালথাজার বললো, 'সে বিশেষ করে এটার ফরমাশ দিয়েছিলো।'

ডাক্তার এক সম্মানজনক ভঙ্গিমা গ্রহণ করলেন, 'নকশাটা কি সে-ই তোমাকে দিয়েছিলো?'

'আজ্ঞে না,' বেলথাজার বললো। 'একজোড়া ট্রুপিয়ালের জন্যে সে একটা বড়ো খাঁচা চেয়েছিলো—এই রকম একটা।'

ডাক্তার খাঁচাটার দিকে তাকালেন, 'কিন্তু এটা তো ট্রুপিয়ালের খাঁচা নয়।'

'ট্রুপিয়ালের খাঁচা বইকি,' টেবিলের দিকে এগুতে এগুতে বেলথাজার বললো। বাচ্চাগুলো ঘিরে ধরলো তাকে। তর্জনি দিয়ে বিভিন্ন কুঠরিগুলোকে দেখিয়ে সে বললো, 'মাপজোকগুলো সব সাবধানে হিসেব করে নেওয়া হয়েছে।' তারপর আঙুলের গাঁট দিয়ে সে গম্বুজটাতে আঘাত করতেই এক অনুনাদী ঝঙ্কারে সমস্ত খাঁচাটা ভরে উঠলো।

'এর চাইতে শক্ত তার আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না,' বেলথাজার বললো। 'প্রত্যেকটা জোড়ের মুখ বাইরে থেকে আর ভেতর থেকে ঝালা লাগানো আছে।'

'এটা একটা তোতাপাখির পক্ষেও বেশ বড়ো,' একটা বাচ্চা ওদের কথাবার্তায় বাধা দিয়ে বললো।

'ঠিক তাই,' বেলথাজার বললো।

ডাক্তার মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'বেশ। কিন্তু সে তো তোমাকে খাঁচার নকশাটা দেয়নি! সঠিক কোনো মাপজোক বা ছিরিছাঁদের কথাও বলেনি। শুধু ট্রুপিয়াল-দের মতো করে একটা যথেষ্ট বড়োসড়ো খাঁচা বানাতে বলেছিলো। ঠিক কি না?'

'আজ্ঞে, ঠিক।'

'তাহলে কোনো অসুবিধে নেই। ট্রুপিয়ালের পক্ষে যথেষ্ট বড়োসড়ো একটা খাঁচা বানাবার কথা এক জিনিস আর বিশেষ করে এই খাঁচাটার কথা বলা আর এক জিনিস। এমন কোনো প্রমাণ নেই যে ঠিক এই খাঁচাটাই তোমাকে করতে বলা হয়েছিলো।'

'ঠিক এই খাঁচাটাই,' বেলথাজার বিভ্রান্ত হয়ে উঠলো, 'আর তাই আমি এটা গড়েছি।'

ডাক্তার একটা অধৈর্য ভঙ্গিমা প্রকাশ করলেন।

'তুমি তো আর একটা খাঁচা গড়ে দিতে পারো,' স্বামীর দিকে তাকালো উরসুলা। তারপর ডাক্তারকে বললো, 'আপনার তো তেমন কোনো তাড়া নেই!'

'আমি আজ বিকেলেই এটা দেবো বলে স্ত্রীকে কথা দিয়েছি।'

'আমি ভীষণ দুঃখিত, ডাক্তারবাবু।' বেলথাজার বললো, 'কিন্তু যেটা একজনকে বিক্রি করা হয়ে গেছে, সেটা আমি আর আপনাকে বিক্রি করতে পারি না।'

ডাক্তার দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললেন। তারপর একটা রুমাল দিয়ে ঘাড় থেকে ঘাম মুছে নিয়ে, নীরবে খাঁচাটার সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলেন স্থির অথচ শূন্য-দৃষ্টিতে তাকিয়ে—যেমন করে মানুষ ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া জাহাজের দিকে দৃষ্টি মেলে রাখে।

'এটার জন্যে ওরা তোমাকে কতো দিয়েছে?'

বেলথাজার কোনো জবাব না দিয়ে উরসুলার চোখ দুটোকে খুঁজতে চাইলো।

'ষাট পেসো,' জবাব দিলো উরসুলা।

ডাক্তার খাঁচাটার দিকেই তাকিয়ে রইলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'খুব সুন্দর! দারুণ!' তারপর হাসি মুখে দরজার দিকে এগুতে এগুতে প্রচণ্ড উদ্দীপনা সহকারে নিজেকে হাওয়া করতে শুরু করলেন এবং এই ঘটনাটার চিহ্ন চিরদিনের মতোই তাঁর স্মৃতি থেকে উধাও হয়ে গেলো।

'মন্তিয়েল খুব বড়োলোক,' বললেন উনি।

দেখে যেমন মনে হয়, আসলে জোসে মন্তিয়েল ঠিক ততোটা ধনী নন—কিন্তু তা হবার জন্যে তিনি যে কোনো কাজ করতে পারেন। কয়েকটা বাড়ির পরেই তার বাড়ি, যা নানান ধরনের জিনিসপত্রে বোঝাই এবং তার মধ্যে বিক্রি হতে পারে না এমন কোনো জিনিসের সন্ধান কেউ আজ অব্দি পায়নি। খাঁচার সংবাদটাতে তিনি নির্বিকার হয়েই ছিলেন। মৃত্যুভয়ে আবিষ্ট তাঁর স্ত্রী দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে দরজা-জানলা বন্ধ করে, ঘণ্টা দুই ঘরের ছায়ার দিকে চোখ মেলে শুয়েছিলেন আর জোসে মন্তিয়েল তখন দিবানিদ্রা উপভোগ করছিলেন। অনেক কণ্ঠস্বরের সোরগোলে অবাক হয়ে মহিলা বৈঠকখানা ঘরের দরজাটা খুলতেই বাড়ির সামনে একটা ভিড় দেখতে পেলেন। ভিড়ের মাঝখানে খাঁচা হাতে বেলথাজার, তার পরনে সাদা পোশাক, গালের দাড়ি সত্ত সত্ত কামানো, মুখে এক সুন্দর সারল্যের অভিব্যক্তি—যে অভিব্যক্তি নিয়ে গরিবরা ধনীগৃহের দিকে এগিয়ে যায়।

'কি অপূর্ব জিনিস!' জোসে মন্তিয়েলের স্ত্রী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। ঝলমলে মুখে বেলথাজারকে ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে উনি বললেন, 'এমন জিনিস আমি জীবনেও দেখিনি।' তারপর দরজার সামনে জমে ওঠা ভিড়ে বিরক্ত হয়ে ফের যোগ করলেন, 'কিন্তু ওরা আমার বসার ঘরটাকে খেলা দেখার জায়গা করে তোলার আগে, তুমি ওটাকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

জোসে মন্তিয়েলের বাড়িতে বেলথাজার নতুন নয়। কাজের দক্ষতা এবং দ্রুততার জন্যে ছোটখাটো ছুতোরগিরির কাজে বিভিন্ন সময়েই তাকে এ বাড়িতে ডাকা হয়েছে। কিন্তু বড়োলোকদের মাঝখানে সে কোনোদিনই ঠিক স্বস্তি পায় না। সে ওদের কথা, ওদের কুৎসিত এবং ঝগড়াটে সহধর্মিণীদের কথা, ওদের দেহে সাংঘাতিক সাংঘাতিক অস্ত্রোপচারের কথা ভাবে এবং সর্বদাই ওদের জন্যে এক ধরনের করুণা অনুভব করে। বড়োলোকদের বাড়িতে ঢুকলে সে কিছুতেই পা না টেনে টেনে হাঁটতে পারে না।

'পেপে বাড়িতে আছে?' খাঁচাটা খাওয়ার টেবিলে রেখে জিগেস করলো সে।

'স্কুলে গেছে, তবে ফিরতে আর বেশি দেরি হবে না,' জোসে মন্তিয়েলের স্ত্রী বললেন। 'মন্তিয়েল চান করছে।'

আসলে জোসে মন্তিয়েল স্নান করার মতো সময় পাননি। তাড়াহুড়ো করে উনি নিজের শরীরে খানিকটা অ্যালকোহল রগড়ে নিচ্ছিলেন, যাতে ব্যাপারটা কি হচ্ছে তা দেখার জন্যে চট করে স্নানঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। ভদ্রলোক এমনই সাবধানী যে উনি বিজলী-পাখা ছাড়াই ঘুমোন, যাতে ঘুমের মধ্যেও বাড়ির যে কোনো গোলমাল তাঁর কানে যায়।

'আদেলেইদ!' উনি চিৎকার করে উঠলেন, 'ওখানে হচ্ছেটা কি?'

'এসে ছাখো, কি সুন্দর একটা জিনিস!' ওঁর স্ত্রী চিৎকার করেই জবাব দিলেন।

অস্বাভাবিক মোটা এবং রোমশ চেহারার জোসে মন্তিয়েল তোয়ালেটা গলায় জড়িয়ে শোবার ঘরের জানলায় গিয়ে হাজির হলেন।

'ওটা কি?'

'পেপের খাঁচা,' বেলথাজার বললো।

জোসের স্ত্রী হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকালেন।

'কার?'

'পেপের,' জবাব দিলো বেলথাজার। তারপর জোসে মন্তিয়েলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'পেপে এটার জন্যে ফরমাশ করেছিলো।'

ঠিক সেই মুহূর্তে কিছু ঘটেনি, কিন্তু বেলথাজারের মনে হলো কে যেন তক্ষুণি তার সামনে স্নানঘরের দরজাটা খুলে দিলো। অন্তর্বাস পরা অবস্থাতেই জোসে মন্তিয়েল শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে ডাকলেন, 'পেপে!'

'এখনও ফেরেনি,' ওঁর স্ত্রী নিস্পন্দ অবস্থায় অস্ফুটে বললেন।

ঠিক তখুনি পেপে দোরগোড়ায় এসে হাজির হলো। ছেলেটির বয়েস বছর বারো। মায়ের মতো তারও চেহারায় শান্ত কারুণ্য, দীর্ঘ অক্ষিপক্ষগুলি আলতো হয়ে উঠে গেছে ওপরের দিকে।

'এখানে আয়,' জোসে মন্তিয়েল ছেলেকে বললেন। 'তুই ওটার জন্যে ফরমাশ করেছিলি?'

বাচ্চাটা মাথা নত করলো। জোসে মন্তিয়েল চুল ধরে টেনে ছেলেকে তাঁর চোখের দিকে তাকাতে বাধ্য করলেন।

'জবাব দে।'

বাচ্চাটা ঠোঁট কামড়ে রাখলো, কোনো জবাব দিলো না।

জোসে মন্তিয়েল বাচ্চাটা'কে ছেড়ে দিয়ে রাগে গনগন করতে করতে বেল-

থাজারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আমি ভীষণ দুঃখিত, বেলথাজার। কিন্তু কাজটাতে হাত দেবার আগে আমার সঙ্গে তোমার কথা বলে নেওয়া উচিত ছিলো। একটা বাচ্চার সঙ্গে চুক্তি করার কথা একমাত্র তুমিই ভাবতে পারো।' কথা বলতে বলতে ভদ্রলোকের মুখটা ফের শান্ত হয়ে উঠলো। খাঁচাটার দিকে না তাকিয়ে, উনি সেটাকে তুলে নিয়ে বেলথাজারের হাতে তুলে দিলেন।

'এক্ষুণি এটা নিয়ে কেটে পড়ো। তারপর যাকে পারো, বিক্কিরি করার চেষ্টা করোগে। আমি তোমার কাছে মিনতি করছি, এই নিয়ে আমার সঙ্গে আর কথা বাড়িয়ো না।' বেলথাজারের পিঠে মৃদু চাপড় মেরে উনি বুঝিয়ে বললেন, 'ডাক্তার-বাবু আমাকে রাগারাগি করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।'

বেলথাজার খাঁচাটা হাতে নিয়ে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে একবার পেপের দিকে না তাকানো অব্দি বাচ্চাটা নিষ্পলক চোখে নিস্পন্দ হয়েই দাঁড়িয়ে ছিলো। তারপরেই সে গলা দিয়ে কুকুরের গর্জনের মতো একটা গরগর আওয়াজ তুলে, মেঝেতে আছড়ে পড়ে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলো।

জোসে মন্তিয়েল তার দিকে তাকালেন, একটুও টললেন না। ওর মা ওকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। 'ওকে তুলো না,' জোসে বললেন। 'ও মেঝেতে ঠুকে ঠুকে মাথা ভাঙুক, তখন তার মধ্যে খানিকটা নুন আর লেবু দিয়ে দিয়ো—যাতে ও মনের সুখে রাগতে পারে।'

বাচ্চাটা তখনও চিৎকার করছে, কিন্তু ওর চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে না। আর ওর মা ওর কব্জি দুটো চেপে ধরে রেখেছেন।

'ছেড়ে দাও ওকে,' জোসে মন্তিয়েল ফের বললেন।

একটা ক্ষিপ্ত জন্তুর মৃত্যুযন্ত্রণা দেখতে হলে যেমন করে দেখতো, ঠিক তেমনি করেই বাচ্চাকে লক্ষ্য করলো বেলথাজার। তখন প্রায় চারটে বাজে। ওই সময় তার নিজের বাড়িতে, উরসুলা একটা অনেক পুরনো গান গাইতে গাইতে পিঁয়াজ কুঁচোচ্ছিলো।

'পেপে,' বেলথাজার ডাকলো।

স্মিত মুখে বাচ্চাটার কাছে গিয়ে, খাঁচাটা ওর দিকে এগিয়ে দিলো সে। বাচ্চাটা লাফিয়ে উঠে, প্রায় তার মতোই বড়োসড়ো খাঁচাটাকে জাপটে ধরলো এবং কি বলবে বুঝতে না পেরে খাঁচাটার জালির ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রইলো বেলথাজারের দিকে। এতোক্ষণ সে এক বিন্দুও অশ্রুপাত করেনি।

'বেলথাজার,' জোসে মন্তিয়েল নরম গলায় বললেন, 'আমি তোমায় ওটাকে নিয়ে চলে যেতে বলেছিলাম।'

'ওটা দিয়ে দাও,' মহিলা বাচ্চাটাকে নির্দেশ দিলেন।

'ওটা তুমি রাখো,' বেলথাজার বললো। তারপর জোসে মন্তিয়েলকে বললো, 'আর যা-ই হোক, ওটা তো আমি এইজন্যেই বানিয়েছিলাম!'

জোসে মন্তিয়েল তাকে অনুসরণ করে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তারপর তার পথ আটকে বললেন, 'বোকামো কোরো না, বেলথাজার। তোমার ওই আসবাবটা তুমি নিজের বাড়িতেই নিয়ে যাও। তোমাকে একটি সেণ্টও দেবার ইচ্ছে আমার নেই।'

'তাতে কিছুই এসে যায় না,' বেলথাজার বললো। 'স্রেফ পেপেকে উপহার দেবো বলেই আমি ওটা তৈরি করেছিলাম। ওটার জন্যে কোনো দাম নেবো বলে আমি আশাও করিনি।'

দর্শকবৃন্দ দরজাটা আটকে রেখেছিলো। বেলথাজার যখন তাদের ভেতর থেকে পথ করে বেরুচ্ছে, জোসে মন্তিয়েল তখন বৈঠকখানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছেন। উনি তখন প্রচণ্ড পাংশুল এবং ওঁর চোখ দুটো লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

'বুদ্ধু কোথাকার! তোর ওই ফালতু জিনিসটা নিয়ে যা এখান থেকে।' জোসে মন্তিয়েল তারস্বরে বললেন, 'একটা বাইরের লোক এসে আমার বাড়িতে হুকুম চালাবে, তা আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করবো না। কুত্তির বাচ্চা!'

সর্বসাধারণের মিলন সভায় জয়ধ্বনির সঙ্গে বেলথাজারকে অভ্যর্থনা জানানো হলো। ওই মুহূর্তটা অব্দি বেলথাজার ভেবেছিলো, সে সুন্দর একটা খাঁচা তৈরি করেছে—যেমনটি আগে আর কোনোদিনও করেনি, খাঁচাটা তাকে জোসে মন্তিয়েলের ছেলেকে দিয়ে দিতে হয়েছে—যাতে সে কান্নাকাটিটা চালিয়ে না যায় এবং এর মধ্যে কোনোটাই তেমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কিন্তু তারপর সে অনুভব করলো, অনেকের কাছে এর সব কিছুরই একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে এবং ফলে সামান্য উত্তেজনা অনুভব করলো বেলথাজার।

'তাহলে খাঁচাটার জন্যে ওরা তোমাকে পঞ্চাশ পেসো দিয়েছে?'

'ষাট,' বেলথাজার বললো।

'তোমাকে সাবাস, ভাই!' একজন বললো, 'তুমিই হলে একমাত্র লোক, যে মি. চেপে মন্তিয়েলের কাছ থেকে এতোগুলো টাকা আদায় করে নিতে পেরেছে। কাজেই আমাদের উৎসব পালন করতে হবে।'

ওরা বেলথাজারকে একটা বিয়ার কিনে দিলো, পরিবর্তে সেও প্রত্যেককে একবার করে খাওয়ালো। জীবনে এই প্রথম বেহিসেবী মদ্যপান, তাই সন্ধ্যার

মধ্যেই মানুষটা সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে গেলো। তখন সে এক হাজার খাঁচা তৈরি করার এক বিশাল পরিকল্পনার কথা বলতে লাগলো, প্রতিটা খাঁচার দাম হবে ষাট পেসো করে…তারপর দশ লক্ষ খাঁচা—তখন সে ছ কোটি পেসোর মালিক হয়ে যাবে। 'বড়লোকগুলো মরে যাবার আগে, ওদের কাছে বিক্কিরি করার জন্যে আমাদের অনেক জিনিস তৈরি করতে হবে।' বেহেড মাতাল হয়ে বেলথাজার বলতে থাকে, 'ওরা সবাই অসুস্থ, সবাই মরে যাবে। ওদের এমন অবস্থা যে এখন ওরা আর রাগতেও পারে না।' গান-বাজনা শোনার জন্যে গত দু ঘণ্টা ধরে সে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটার মধ্যে ক্রমাগত পয়সা গুঁজে যাচ্ছিলো, যন্ত্রটাও বেজে যাচ্ছিলো অবিরাম। সবাই বেলথাজারের সুস্বাস্থ্য, শুভেচ্ছা আর সৌভাগ্য এবং বড়োলোকদের মৃত্যুকামনায় মদ্য পান করলো—কিন্তু খাওয়াদাওয়ার সময় হতেই সবাই তাকে সভাগৃহে একা ফেলে রেখে চলে গেলো।

পিঁয়াজ কুঁচি দিয়ে ঢাকা এক থালা ভাজা মাংস নিয়ে উরসুলা আটটা অব্দি বেলথাজারের জন্যে অপেক্ষা করেছিলো। কে একজন এসে ওকে বলেছিলো, ওর স্বামী সভা-ঘরে রয়েছে—আনন্দে সে উত্তেজিত, প্রলাপ বকছে, সবাইকে বিয়ার কিনে দিচ্ছে। কিন্তু উরসুলা কথাটা বিশ্বাস করেনি, কারণ বেলথাজার কোনোদিন মাতাল হয়নি। প্রায় মাঝরাতে ও যখন শুতে গেলো, বেলথাজার তখন একটা আলোকিত ঘরে। ঘরের মধ্যে ছোটো ছোটো টেবিল, প্রত্যেকটাতে চারটে করে কুর্সি এবং বাইরে নাচের জায়গা, সেখানে চিড়িয়ারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেলথাজারের মুখটা রুজ পাউডারে মাখামাখি! আর একটা পাও হাঁটতে পারছিলো না বলে সে ভাবছিলো, দুটো মেয়েছেলেকে নিয়ে সে একই বিছানায় শুয়ে পড়তে চায়। ইতিমধ্যে সে এতো খরচ করে ফেলেছে যে নিজের হাতঘড়িটা তাকে বাঁধা রাখতে হয়েছে—কথা দিয়েছে, পরের দিন ওটা সে ছাড়িয়ে নেবে। এক মুহূর্ত বাদে রাস্তায় হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় সে অনুভব করলো, তার জুতোজোড়া খুলে নেওয়া নেওয়া হচ্ছে—কিন্তু তার জীবনের সব চাইতে সুখময় স্বপ্নটাকে সে তখন ত্যাগ করতে চাইছিলো না। যে মহিলারা ভোর পাঁচটার প্রার্থনা-সভায় যাচ্ছিলেন, তাঁরা বেলথাজারের দিকে তাকাতে সাহস পাননি—তাঁরা ভেবেছিলেন, মানুষটা মরে গেছে।

অনুবাদ / দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

এই অন্ধকারে

এ. ফেলিসিয়ান ফার্নান্দো

এ. ফেলিসিয়ান ফার্নান্দো শ্রীলঙ্কার সাহিত্যিক হিসেবে কতোটা প্রতিষ্ঠিত আমি জানি না, তবে ১৯৫০ সালে 'দি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকা আয়োজিত আন্তর্জাতিক ছোটো গল্প প্রতিযোগিতায় সিংহল থেকে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত এই গল্পটি নিঃসন্দেহে নতুনত্বের একটা স্বাদ বহন করে। ছাত্রজীবনে বেশ কিছু ছোটো গল্প লিখে হাত পাকালেও নামকরা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত এটাই তাঁর প্রথম ছোটো গল্প। জন্ম ১৯৩০ সালে শ্রীলঙ্কার বেরুওয়েলা গ্রামে।

প্রকৃতিস্থ অবস্থায় মানুষটা খুবই শান্ত সংযত হয়ে থাকতো। তখন মৃদু মৃদু কণ্ঠে, রীতিমতো প্রাজ্ঞ মানুষের মতো, সে তার অবধায়কের সঙ্গে—মানে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতো। একবার তেমনি এক সময়ে মানুষটা বলেছিলো, সে একটা কাহিনী লিখছে…তার নিজের কাহিনী। সে যা লিখেছিলো তা এই :

[সমস্ত কিছুই তালগোল পাকানো—মানে আমার স্মৃতিচিহ্নগুলি। মল্লিকা, এ কাহিনী তোমার আর আমার। তাই এটা আমি তোমাকে আর আমাকে উৎসর্গ করেছি।]

হ্যাঁ, মল্লিকাকে আমি সত্যিই ভালোবাসতাম। ভীষণ বন্ধু ছিলাম আমরা, তাই না মল্লিকা? বন্ধু ছিলাম সেই শিশুকাল থেকে। পরিচয়ের প্রথম থেকেই আমরা পরস্পরকে ভালো বেসেছিলাম। বড়ো হয়ে আমি হলাম একজন জীবাণুতত্ত্ববিদ, যা মল্লিকা অমন মধুর আগ্রহে চেয়েছিলো। আর মল্লিকা হলো ছলনাময়ী এক চতুরিকা, যা ··

[লেখাটা সত্যিই সামঞ্জস্যহীন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি তো জানো মল্লিকা, আমি পাগল!]

মল্লিকা সুন্দরী ছিলো। ঠিক যেন…ঠিক যেন অণুবীক্ষণের আওতায় থাকা একটা চমৎকার এককোষী শৈবালের মতো সুন্দর। মল্লিকাকে আমি মধু আর সুগন্ধ নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠতে দেখেছিলাম। কিন্তু কেন ও নিজের চতুর্দিকে অতো গুঞ্জরিত ভ্রমরকে উড়ে বেড়াতে দিতো?

সেটা কিন্তু যুক্তিহীন, তাই নয় কি?

কোনো নারী সুন্দরী হলে সে বহু পুরুষকে আকর্ষণ করবেই। সেটা মেয়েটির দোষ নয়। বিষয়টা আমি এভাবেই দেখার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ঈর্ষা সত্যি এক বিচিত্র ঈশ্বর।

এ এক পুরনো, অতি জীর্ণ কাহিনী।...ও কথা দিয়েছিলো, জীবাণুতত্ত্বে আমার পড়াশুনো শেষ হওয়া অব্দি ও অপেক্ষা করবে—তারপর বিয়ে করবো আমরা। সেটা আমার পাঠক্রমের শেষ বছর। নিজে থেকেই স্থির করেছিলাম, একটা মারাত্মক রোগ জীবাণুর উৎপাদন নিয়ে আমি গবেষণা করবো...শেষের পুরো বছরটা জুড়ে ওদের উৎপাদন বৃদ্ধি করবো। বিপজ্জনক জীবাণু নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করতে গেলে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে শিখেছি, তা আমি ব্যবহারিক স্তরে কাজে লাগাতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম, গবেষণালব্ধ জীবাণুগুলোকে দীর্ঘদিন ধরে অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করতে। খানিকটা আপত্তি আর অনিচ্ছার পর আমাদের অধ্যাপকও আমাকে কাজটা চালিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

[দাড়ান ...এ কাহিনী আমি আপনাকে গুছিয়েই বলবো।]

ফেব্রুয়ারিতে আমাদের শিক্ষাবর্ষের শুরু। আট তারিখে আমি গবেষণার কাজ শুরু করলাম। ওই দিন থেকে এক বছরের মধ্যে আমি তোমাকে বিয়ে করবো বলে কথা দিয়েছিলাম, মল্লিকা। মনে পড়ে? সেদিন আমরা ছুটিতে শহরের কল-কোলাহল থেকে দূরে সেই ছোট্ট গ্রামটায় চলে গিয়েছিলাম। তারপর ঝিনঝিন সুর তুলে বয়ে চলা নদীর কূলে বসে আমি বলেছিলাম, 'মল্লিকা, আসছে কাল আমরা কাজ শুরু করছি। তুমি আমাকে শুভেচ্ছা জানাও!' আর তুমি আলতো করে আমাকে চুমু খেয়ে, আমার খুব কাছাকাছি ঘন হয়ে বসেছিলে তখন।

আমি গবেষণার কাজ শুরু করলাম। যে আধারে জীবাণুগুলোকে উৎপাদন করা হবে, সেগুলো এলো প্রথমে। এ জন্যে আমি কয়েকটা দুধের বোতল বেছে নিয়েছিলাম। আমি তোমাকে বলেছিলাম, গবেষণাগারে আমি এক মারাত্মক রোগ-জীবাণুর উৎপাদন এবং প্রতিপালন করবো। বলিনি, মল্লিকা? তুমি বলেছিলে, 'সাবধান কিন্তু, লক্ষ্মীটি!'

[আমি সাবধান...সদা-সর্বদাই আমি সাবধান।]

অধ্যাপককে বলেছিলাম, জীবাণু উৎপাদনের জন্যে আমি জাপেক-ডক্স সলিউশন ব্যবহার করবো। উনি জানতে চেয়েছিলেন, আমি কোন রোগ-জীবাণুর উৎপাদন-পালন-সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করতে চলেছি। বলেছিলাম, আমি ব্যাসিলাস টাইফি নিয়ে গবেষণা করবো বলে স্থির করেছি—যা টাইফয়েড জ্বরের কারণ।

ভারি মারাত্মক ওই খুদে খুদে জিনিসগুলো—মানে টাইফয়েডের জীবাণুরা ।

'বেশ,' অধ্যাপক তখন বলেছিলেন, 'কিন্তু জীবাণুগুলোর পক্ষে অনুকূল পরিবেশ রচনা করার জন্যে তোমাকে গবেষণার মাধ্যমটির সামান্য পরিবর্তন করে নিতে হবে ।'

আমি তা করলাম ।

মল্লিকা, আজ ওরা আমাকে পাগল বলে । কিন্তু ১৯৪৫ সালে যে ছেলেটি রোগ-জীবাণুতত্ত্বের শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলো, যে তোমাকে অতোখানি ভালোবাসতো—সে কি পাগল ছিলো, সোনা ?

[পাগল ? আমি ? নির্বোধের দল ! পাগল হলে এ কাহিনী আমি এতো নিটোল, এতো সুবিন্যস্তভাবে বলছি কি করে···]

মল্লিকা, ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হয়ে আসছিলো—আমি তখন আরও নিবিড় করে কাছে টানছিলাম তোমায় । অস্বীকার কোরো না, তুমিই আমাকে তা বলেছিলে । মনে পড়ে, কিভাবে আমরা গাড়িতে চেপে নুয়োয়ারা এলিভায় যাবার পরিকল্পনা করেছিলাম ? কিভাবে ক্যাণ্ডি হয়ে যাবার পথটাই বেছে নিয়েছিলাম আমরা ? অথচ পরের দিন তুমিই আমাকে বলেছিলে, 'শোনো, আমার এক বন্ধু হাটনে থাকে···আমি তার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই···লক্ষ্মীটি, আমাদের যাবার পথটা একটু অদল-বদল করে নাও না গো ?'···

হ্যাঁ, অধ্যাপক বলেছিলেন, 'জীবাণুগুলোর পক্ষে উপযুক্ত আদর্শ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যে তোমাকে জাপেক-ডক্স সলিউশনটার একটু অদলবদল—মানে সামান্য পরিবর্তন—করে নিতে হবে ।'···

ক্লাসের কাজে আমার বেশির ভাগ সময়টাই খরচ হয়ে যেতো । তাই গবেষণার আরম্ভটা আমাকে বারবারই স্থগিত রাখতে হচ্ছিলো । একবার শুরু করে দিলে, তুমি তো জানো, সেটাকে প্রতিদিনই সময় দেবার প্রয়োজন হয় । কিন্তু তাই বলে আমাদের বিয়েটা স্থগিত রাখা ? না মল্লিকা, তা আমি কখনই ভাবিনি । সেটা চিন্তা করাও আমার পক্ষে অসম্ভব ছিলো । তুমি যে আমার হৃদয়ের বড্ড কাছাকাছি ছিলে, সোনা !

অবশেষে ১৭ই জুন আমি আমার গবেষণার কাজ শুরু করলাম ।

[তারিখটা আমি কি করে মনে করতে পারছি ? নির্বোধের দল ! স্মৃতিশক্তিটা আমার চিরদিনই ভালো । ১৭ই জুন তারিখটা মল্লিকার জন্মদিনের পরের দিন । আমি ঠিক করেছিলাম, মল্লিকার জন্মদিনটা পেরিয়ে যাওয়া অব্দি আমি অপেক্ষা করবো এবং তারপর শুরু করবো আমার কাজ ।]

সেদিন রাতের পার্টিতে তোমাকে যে কি অপরূপ লাগছিলো, মল্লিকা ! তোমার

পরনের সুন্দর ঝিনুক-গোলাপি শাড়িটা রঙিন করে তুলেছিলো আমার মস্তিষ্কের কোষগুলিকে। আমার মস্তিষ্কটা তাই এখন গোলাপি। তোমাকে শাড়িতে লাগাবার যে ক্লিপটা আমি দিয়েছিলাম, মনে আছে?—সেটা ছিলো আমার মায়ের কায়দা-দুরস্ত ক্লিপগুলোর মধ্যে একটা।

[মাকে আমি কোনোদিনও তোমার কথা বলিনি, মল্লিকা।···মাগো, তুমি আমার এ লেখাটা পোড়ো না, মা!]

আঠারো তারিখে আমার গবেষণার মাধ্যমটা প্রস্তুত হয়ে গেলো। এবারে সেটাকে পরিশুদ্ধ—বীজাণুবিহীন—করে নিতে হবে। বাষ্পের সাহায্যে নির্বীজন করে নেওয়াই সবচাইতে ভালো।

অধ্যাপক বলেছিলেন, 'নির্ভেজাল খাঁটি জীবাণু উৎপাদন করতে চাইলে, গবেষণার মাধ্যমকে সম্পূর্ণ বীজাণুবিহীন করে নিতে হবে।'

আমি যা অর্জন করেছিলাম, তা হলো সম্পূর্ণ বীজাণুবিহীনতা—পরিপূর্ণ শূন্যতা।

[আমার সাধারণ দৈনন্দিন কাজের কথা বলে আর কি হবে? ক্লাসে আমি চালাক-চতুর ছাত্র হিসেবেই পরিচিত হয়েছিলাম। বৃদ্ধ অধ্যাপকটি তা স্বীকার করতে চাইতেন না বটে, কিন্তু জানো, আমি ছিলাম তাঁর একজন অন্যতম সেরা ছাত্র।]

মল্লিকা, জীবাণু উৎপাদন সম্পর্কে আমি তোমাকে যে জ্ঞান দিয়েছিলাম—মাধ্যম প্রস্তুত করা, তার নির্বীজন ও শীতলীকরণ, সৃজনকারী জীবাণুর প্রস্তুতিকরণ, তাদের ফলবতী করা, নতুন জীবাণুর পুষ্টি সাধন ও প্রতিপালন এবং তাদের সংরক্ষণ—আমার ধারণা এ সমস্ত তোমার মনে নেই। ওঃ আমার সেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষার কচকচানি শুনে কি হাসিই না তুমি হেসেছিলে সেদিন!

তোমার হাসি সবদা আমাকে তোমার প্রিয় সারিগানের কথা মনে করিয়ে দিতো। কতো মৃদু আর মধুর স্বরে তা গাইতে তুমি···ঠিক যেন নৌকোয় ছলকে ওঠা জল, চাঁদের আলো, নৌকোয় ভেসে চলা তুমি আর আমি, আর ঠাণ্ডা বাতাস···

তারপর মাধ্যমটাকে জুড়িয়ে নিতে হবে। সাবধানে—তার নির্বীজিত অবস্থা বজায় রেখে। এরপর সৃজনকারী জীবাণুগুলিকে ফলবতী করে তোলা। অধ্যাপক বলেছিলেন, মূল সৃজনকারী জীবাণু অর্থাৎ প্রাথমিক পযায়ে যে জীবাণুগুলো বংশ বিস্তার করবে, সেগুলো তিনিই আমাকে দেবেন। তেসরা জুলাই আমি সেই উৎপাদন মাধ্যমকে ফলবতী করে তুললাম।···আমার হাত দুটো সেদিন কেঁপে উঠেছিলো সামান্য।···

সেদিন রাতে বিদায় জানাবার সময় আমি যখন তোমাকে চুমু দিলাম, তখন

তুমিও আমার বুকের কাছে ঠিক তেমনি করে কেঁপে উঠেছিলে. মল্লিকা। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা চীনা-রেস্তোরাঁয় গিয়ে নুডলস খেয়েছিলাম। তুমি সর্বদাই নতুন কিছু করার চেষ্টা করতে। কিন্তু সেদিন চীনা পদ্ধতিতে কাঠি দিয়ে খেতে গিয়ে কি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থই না তুমি হয়েছিলে! আসলে তোমারও সেদিন চামচ ব্যবহার করা উচিত ছিলো, যা আমি করেছিলাম। চীনাদের মতো চপস্টিক ব্যবহার করতে গিয়ে সেদিন তুমি যখন নিজেই নিজের ব্যর্থতায় হেসে কুটিপাটি হচ্ছিলে, তখন ওখানকার চীনা ভদ্রলোকরা কি হাসিই না হেসেছিলেন তোমার সঙ্গে!

মল্লিকা, সেদিন রাতে আমি তোমাকে বলেছিলাম কিভাবে আমি নিজের প্রচেষ্টায় জীবাণু উৎপাদন করেছি। তুমি তা শুনে উত্তেজক ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলে, 'সাবধান কিন্তু!'

আমি সাবধানেই ছিলাম, কিন্তু তুমি ছিলে না।···আগস্ট মাসটা আমাকে তা বুঝিয়ে দিয়েছিলো।

'কন্তু কেন তুমি অমন করলে, সোনা? কেন?

আমার গবেষণালব্ধ জীবাণুগুলিকে আরও খাঁটি করে তোলার বাসনায় আগস্ট মাসে একটা নতুন বোতলে সামান্য পরিবর্তিত মাধ্যমের মধ্যে আমি অল্প কিছু জীবাণু আলাদা করে ঢেলে রাখলাম। এভাবে পাত্রবদল আমি অবিশ্যি আগেও করেছি, কিন্তু সে সমস্ত ক্ষেত্রে মাধ্যমটা একই থাকতো।

এবং আগস্টের শেষ সপ্তাহেই আমি দুঃসংবাদটা পেলাম। সিরির সম্পর্কে আমি তখনই সবকিছু জানতে পারলাম। ওহ্ মল্লিকা···নোংরা কুত্তি···কি করে তুমি দু-জনের সঙ্গে একই খেলা খেলেছিলে এতোদিন? দ্বিমুখী···ত্রিমুখী খেলা! তোমার অন্য সমস্ত প্রেম-উপাখ্যানগুলোও আমার কানে এলো। কেমন করে এলো, তা বলবো না। এলো আচমকা···অতর্কিতে। প্রেমের ভান, প্রেম-প্রেম খেলা, প্রেমের হৃদয়হীন নিষ্ঠুর অভিনয়···

আমি তো তোমার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম, মল্লিকা! সিরি, নিহাল বা অন্যদের মধ্যে এমন কি দেখেছিলে তুমি? আমি যে কি ভীষণ ভালোবাসতাম তোমাকে!···

তারপর আমার বোতলটা ভেঙে গেলো। আহা, বেচারা জীবাণুগুলো!

অধ্যাপক বলেছিলেন, 'এতে বিপদ আছে।···সমস্ত কিছু ভালোভাবে বীজাণু-বিহীন পরিশুদ্ধ করে নেবে।'···আমার গবেষণালব্ধ জীবাণুগুলো এখন বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধ আর শক্তিশালী। কিন্তু মল্লিকা, যেদিন আমি তোমার সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানতে পারলাম, সেদিনও আমার আবেদন-নিবেদনের কাছে তুমি বধির হয়ে রইলে। সেদিন তোমার কাছে গিয়ে আমি তোমাকে ভৎর্সনা করেছিলাম, কিন্তু

সেজন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারতে। আমি তোমাকে আমার কাছে ফিরে আসতে বলেছিলাম, তুমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে আমার দিক থেকে।

ছেনাল মাগী! তুমি কি ভেবেছিলে আমি তোমার পিছু নেওয়া ছাড়বো না? সেদিন আমি ফের ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম তোমার ওপরে।···বলেছিলাম, আমি তোমাকে খুন করে ফেলবো।

মল্লিকা, তোমাকে চিরদিন শাশ্বত অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকতে হবে···জীবাণুদের মতো অপরিবর্তনীয়। দ্যাখো, কিভাবে ওরা অবিরাম বংশবৃদ্ধি করে আর নিজেদের ভেতর থেকে বিষ উগরে দেয়!···

তুমি রেগে গিয়েছিলে, মল্লিকা। বলেছিলে, তোমাকে খুন করলে খুনের দায়ে আমাকেও ফাঁসীতে ঝুলতে হবে।

খুন? তোমার মতো একটা নোংরা কুত্তিকে? তুমি কোনোদিন নিখুঁত খুনের কথা শোনোনি, তাই না?

ওহ্ মল্লিকা, কি ভালোই না আমি বাসতাম তোমাকে!

আমার গবেষণালব্ধ জীবাণুগুলো তখন নিয়মিতভাবে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে। আমার লক্ষ্মী সোনা জীবাণু! ওরা কোনোদিনও আমাকে হতাশ করেনি।

[তোমরা ছাড়া আমার জীবনে আর কি আছে, বলো?]

সেপ্টেম্বর। এমন একটা মাস, যার তেমন বিশেষ কোনো অর্থ নেই আমার কাছে।

মল্লিকা, এখনও তুমি আমার কাছে ফিরে আসতে অস্বীকার করছো? লক্ষ্মীটি··· ফিরে এসো, সোনা! আমি যে শেষ হয়ে গেলাম! হ্যাঁ, সত্যিই আমি বোকা। তাই আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি। আমি সিরিকে ভুলে যেতে পারি। নিহালকে ভুলে যেতে পারি। ভুলতে পারি অন্য সবাইকেও।

[কিন্তু আমি কি আমার অতীতকে ভুলে যেতে পারি? মল্লিকা, তুমি যে আমার অতীত! আমার বর্তমান? আমার বর্তমান টাইফয়েডের ওই জীবাণুগুলো। ওদের সঙ্গে আমি মৃত্যুর বড়ো কাছাকাছি আছি। আমার বেঁচে থেকে কি লাভ? ওই বোতলটা থেকে আমার দূরত্ব সামান্য কয়েক ইঞ্চি মাত্র। ওখানেই আছে আমার বন্ধুরা, যারা জীবন থেকে আমাকে এক সকরুণ স্বস্তি এনে দিতে পারে।]

হ্যাঁ মাস্টার মশাই, আমি সত্যিই আমার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। এ জন্যে আমাকে এতো কথা শোনাবার কোনো প্রয়োজন নেই।···অধ্যাপক বলেছিলেন, 'কাজের দিকে আরও বেশি করে মনোযোগ দাও। তুমি তোমার পাঠক্রম শেষ করতে চলেছো—শেষ দিকটাতে কাজে ঢিলে দিয়ো না।'

[ঠিক কথা। আমার লক্ষ্মী জীবাণুর দল, তোমরা কিন্তু কিছুতেই কাজে ঢিলে দেবে না।]

নভেম্বরে আমাদের পরীক্ষা শেষ হলো। অধ্যাপক বললেন, 'তুমি আরও ভালো করতে পারতে।' পারতাম বইকি। কিন্তু মাস্টারমশাই, আপনি মল্লিকাকে চেনেন না। চেনা উচিত ছিলো। মল্লিকা ভারি মিষ্টি, মাস্টারমশাই। ও একটা নেলাম ফুলের মতো সুন্দর। ও প্রেমের এক অপরূপ নৈবেদ্য।

[আহা রে আমার সোনা জীবাণুর দল ! গতকাল কি আমি তোমাদের অবহেলা করেছিলাম ? কতো দীর্ঘ দিনের বন্ধু আমরা ! কিন্তু শীগগিরি আমরা বিচ্ছিন্ন হবো। আজই কি আমি তোমাদের ধ্বংস করে ফেলবো ? না। তোমরা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছো। তাই আমি একটু বেশিক্ষণ বাঁচতে দেবো তোমাদের…তারপর শেষ করে ফেলবো চিরদিনের মতো।]

শোনো জীবাণুরা, তোমরা কোনোদিন আমাকে জ্বালাতন করোনি—যেমনটি মল্লিকা করেছে। প্রায়ই ও স্রেফ আমাকে উপহাস করার জন্যে ওর একটি সিরি বা একটি নিহালকে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করতো। তোমাকে অমন রূপে দেখা ভারি কষ্টকর, মল্লিকা ! একদিন তুমি আমার ছিলে, কিন্তু আমি তো কই—কোনোদিনও তোমার প্রতি নিষ্ঠুর হইনি ! তাহলে তুমি কেন আমার প্রতি নিষ্ঠুর হবে ? নোংরা ছেনাল মেয়েমানুষ ! আমি তোমাকে খুন করবো…খুন করে ফেলবো তোমাকে।

[সুপ্রভাত জীবাণুরা ! ভালোই আছো তোমরা, তাই নয় কি ?]

আঠারোই ডিসেম্বর মল্লিকা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। সেটা আমার জন্মদিন। আমাকে আর ব্যথা না দিয়ে, তুমি সেদিন দূরে সরে থাকলেই পারতে মল্লিকা। বোকার মতো আমি তোমাকে ওই দিনটা আমার সঙ্গে কাটাতে বললাম। তুমি রাজি হলে—আন্তরিক আগ্রহেই তুমি রাজি হয়ে গেলে। সকাল দশটায় আমি তোমাকে গাড়িতে তুলে নিলাম, আমরা চলে গেলাম আমাদের সেই প্রিয় গ্রামটিতে। মোটরে সেই যাত্রাপথটা তুমি কি উপভোগ করেছিলে, মল্লিকা ? আমি করিনি, কারণ তোমাকে ভীষণ ঘৃণ্য বলে মনে হচ্ছিলো আমার।

কুলকুল সুর তুলে বয়ে চলা নদীটার ধারে বসে আমরা দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে নিলাম। বেশ কয়েক মাস আগে একদিন তুমি আমাকে বলেছিলে, 'সাবধান কিন্তু' ! আমি চিরদিনই সাবধান।

বিকেল চারটে নাগাদ আমরা ফের রওনা হলাম। রওনা হবার আগে চা খেলাম। তবু তেষ্টা পাচ্ছিলো মল্লিকার। ও এক গ্লাস কমলালেবুর রস খেলো—আসার সময় আমিই সেটা নিয়ে এসেছিলাম।

[প্রিয় জীবাণুরা, তোমাদের ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। চলে যেতে হবে আমার গবেষণাগার ছেড়ে। এক্ষুণি। বিদায়, নোংরা শয়তান খুনের দল!]

চব্বিশে ডিসেম্বর মল্লিকা মারা গেলো।

তাহলে আমি নিখুঁত হত্যার পরিকল্পনা করতে পারি, তাই না? তুমি বড্ড বোকা ছিলে, মল্লিকা। মরে যাবার পর ভীষণ কুৎসিত দেখাচ্ছিলো তোমাকে—কুৎসিত আর দুর্গন্ধময়।

তুমি তো জানো, ডাক্তাররা বলেছিলেন: মল্লিকা টাইফয়েডে মারা গেছে।

মল্লিকা…ওই কমলালেবুর রসটা কি তোমার না খেলে চলতো না?

হায় মল্লিকা, আমি যে তোমাকে কি ভীষণ ভালোবাসতাম তা তুমি কোনো-দিনও জানতে পারবে না…

[মানুষটা ছিলো আমাদের আতুরাশ্রমের সবচাইতে হিংস্র রোগী। এ কাহিনীটা লেখার সময় সে সম্পূর্ণ শান্তই ছিলো। কিন্তু তারপরেই ঘরের গদি-মোড়া দেয়ালে সে সজোরে মাথা ঠুকতে শুরু করে। বেচারা!…]

অনুবাদ / দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাপটা-ছেলেটা

মাইকেল অ্যান্টনি

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ছোট্ট একটি দ্বীপ ত্রিনিদাদ। আধুনিক কালে ত্রিনিদাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে স্যামুয়েল সেলভন, ভি. এস. নেইপাল এবং মাইকেল অ্যান্টনি অন্যতম। কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটো গল্পকার মাইকেল অ্যান্টনির জন্ম ১৯৩২ সালে, ত্রিনিদাদে। এখানেই পড়াশোনা করেন। ছাত্রাবস্থায় কবিতায় হাত পাকালেও পরবর্তী কালে সমস্ত ঝোঁক গিয়ে পড়ে গদ্যসাহিত্যে, বিশেষ করে উপন্যাসে। ছোটো গল্প তিনি লিখেছেন খুবই কম। 'ক্রিকেট ইন দি রোড' ১৯৭৩ তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন। স্কেচধর্মী ছোটো ছোটো কাহিনীগুলি বৈচিত্র্যের স্বাদ বহন করে।

'তুর বাপ কই?'

ছেলেটা কোনো জবাব দেয় না। চড়াগুলোর মাঝখান দিয়ে সাবধানে দাঁড় বেয়ে নৌকোটাকে সে তীরের কাছ বরাবর নিয়ে আসে। তারপর নৌকো থামাবার জন্যে বৈঠা দুটোকে নামিয়ে রাখে সামনের দিকে। এবারে কাছিটাকে গোল করে গোঁজের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে তীরে নেমে আসে ছেলেটা।

'তুর বাপ কই?'

বিরক্তি লুকিয়ে মায়ের দিকে তাকালো ছেলেটি। শান্ত গলায় বললো, 'তুমি তো আমার বাপকে চিনো। তুমি তো জানো সি কুথায় আছে।'

'তুকে আমি বলিনি, তাকে না নিয়ে ফিরবি না?'

'আমি তাকে নিয়ে আসতি পারি? সি যকন মদ গিলতি চায়, তকন আমার সাধ্যি আছে তাকে নিয়ে আসার?'

চিরটা কাল এমনি করেই চলে আসছে। ছেলেটির মা চিরদিন এমনি করেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে চোখ মেলে রাখে। প্রতি শনিবার রাতে এই একই ঘটনা। প্রতি শনিবার রাতে মানো গ্রামে যায়, তারপর মদ গিলে অসহায় হয়ে দোকানের মেঝেতে পড়ে থাকে। দোকানের চীনে-মালিক দোকান বন্ধ করার জন্যে তৈরি না হওয়া অব্দি মানুষটা অমনি ভাবেই পড়ে পড়ে খিস্তিখাস্তা দেয় আর বমি করে। তারপর সবাই মিলে তাকে গড়াতে গড়াতে দোকানের বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখে—কে বলতে পারে, তখন তারা হয়তো মানুষটার গায়ে থুথুও ছোড়ে।

ছেলেটির মা নদীর দিকে তাকালো। রাগ আর নিবিড় বেদনায় ওর মুখখানা

কুঁচকে উঠেছে। এখন ওর পক্ষে নদী উজিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। গেলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে। অথচ মানোকে বাড়িতে নিয়ে আসতেই হবে। ছেলেটা কি করছে দেখার জন্যে মুখ ফেরালো ও। ঝোলা থেকে জিনিসপত্র বের করে, গদি-আঁটা বেঞ্চিতে ঠেস দিয়ে বসেছে ছেলেটা।

'তুর বাপকে নিয়ে আসার জন্যি তুকে যেতে হবে, বুঝলি?'

'কাকে যেতে হবে?'

'তুকে!'

'আমি পারবোনি।'

'তুই আমাকে 'না' বলার কে, শুনি?' মা এবারে ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'তুর বাপকে আনার জন্যি তুকে যেতেই হবে, হারামজাদা!'

সোনা তক্ষুণি সচকিত হয়ে বেঞ্চি থেকে উঠে পড়েছে। আজকাল মা তাকে বলতে গেলে প্রায় মারেই না। কিন্তু তাহলেও কিছুই নিশ্চয় করে বলা যায় না। বহুদিন মাকে এতো রাগী দেখায়নি, বহুদিন মা এমন করে পা দাপায়নি।

ধীরেসুস্থে অনিচ্ছাসত্বেও উঠে মায়ের দিকে তাকালো ছেলেটা। কিন্তু বুঝতে পারলো না মায়ের কি হয়েছে। বাবাকে নিয়ে মা আদৌ কেন চিন্তা করবে, মাথা ঘামাবে—ত, সে কিছুতেই ভেবে পায় না। তার বাবা একটা আকাট, অপদার্থ—মানুষটা তাদের জীবন দুর্বিবহ করে তুলেছে। আসলে উপায় থাকলে মানো বহুদিন আগেই বাড়ি থেকে পিট্টান দিতো। এতোদিনে আসিওর দোকানের সামনে মাংস রাখার নোংরা টেবিলটা হতো তার বিছানা। সেটাই তার যোগ্য জায়গা। বদমাস! জানলা দিয়ে থুথু ছুঁড়লো ছেলেটা। বাবার কথা চিন্তা করলেই তার বিরক্ত লাগে, বমি পায়।

কিন্তু সোনার মায়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য রকম। যে মানুষটার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিলো এবং যে এতোটা খারাপ হয়ে গেছে, সে আজও ওর জীবনের যথাসর্বস্ব। ওর জীবনে মানুষটা শুধু দুঃখের পর দুঃখ, অশ্রুর পর অশ্রুর বোঝা বাড়িয়ে গেছে। অথচ তাকে ছাড়া নিজেকে অর্থহীন আর অসহায় বলে মনে হয় ওর। ওর কাছে মানুষটা ওই অর্তোয়ার নদীর মতোই শক্তিমান। ওর মনে পড়ে, যুবক বয়সে মানুষের সাধ্যের মধ্যে এমন কোনো কাজ ছিলো না যা সে করতে পারতো না। ওর চোখে মানুষটা আজও তরুণ—তার বয়েস বাড়েনি, বেড়েছে ওর নিজের। অকাতরে রাম গেলা আর রোজগারের টাকা কটা উড়িয়ে দেবার জন্যে মানুষটাকে ও ঘৃণা করে। কিন্তু টাকার জন্যে ওর ততোটা খারাপ লাগে না, যতোটা খারাপ লাগে মানুষটাকে মাতাল অবস্থায় দেখলে। ও জানে—লোকটা টলতে টলতে ফিরে এলে

ও রাগে কাঁপবে, তাকে গালাগাল দেবে, অভিসম্পাত জানাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষটা ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরেছে বলে ওর ভেতরটা তখন আনন্দে কেঁপে কেঁপে উঠবে।

দোকানে এখন কি হচ্ছে কে জানে, ভাবলো ও। কে জানে, হয়তো ইতিমধ্যেই মানুষটা মাতাল আর অসহায় হয়ে উঠেছে…সবাই তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছে!

মানো যেভাবে সবাইকে খিস্তিখাস্তা করে নিজেকে সকলের কাছে উপহাসের পাত্র করে তোলে, সেটাই তার ছেলে সোনার কাছে সব চাইতে বেশি বিরক্তিকর। এক এক সময় বাবার কথাবার্তা শুনে সে এতো লজ্জা পেয়েছে যে মানুষটাকে তার লাথি মারতে ইচ্ছে হয়েছে। প্রায়ই নির্জন নৈঃশব্দ্যে সে বাতাসে হাতের মুঠি তুলিয়ে বলে, 'এক'দন…একদিন আমি ওকে…'

সোনা লক্ষ্য করেছে, তার মা হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর উপোস—দুই-ই মুখ বুজে মেনে নিয়েছে। প্রতিদিনই মা আরও রোগা হয়ে যাচ্ছে। ছত্রিশ বছর বয়সে মায়ের বয়েস ছাপান্নর চাইতেও বেশি বলে মনে হয়। এর মধ্যেই চুলে পাক ধরেছে। মাঝে মাঝে মায়ের দিকে তাকিয়ে বাবার কথা ভাবতে ভাবতে সে দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'পশু কোথাকার!' প্রায়ই নিজের মনে কথাটা বলে সে। এখনও তার মনের অবস্থা ঠিক অমনি। তাই রাশ রাশ বিরক্তি আর অনিচ্ছা নিয়েই সে নৌকোর বাঁধন খুলতে গেলো।

'নিয়ে আসতি না পারলে ফেলে রেখে চলে আসবো,' ক্রুদ্ধস্বরে বললো সোনা।

'অন্য কাউকে এট্টু হাত লাগাতি বলিস।'

সোনা মায়ের দিকে ফিরে তাকালো, 'কেউ হাত লাগায়ে আমায় বাপকে তুলতি আসবে না। সি সব্বাইকে অপমান করে। গত সপ্তায় বলাইও তাকে নাথি মেরেছে।'

'বলাই উকে নাথি মেরেছে? আর তুই তকন কি করলি?' সোনার মা রাগ আর আহত বিস্ময়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত, আরক্তিম আর জলে ভরা।

যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভঙ্গিতে ছেলেটা গোঁজ থেকে কাছিটা খুলে নেয়, 'আমি আর কি করবো? সিটা তার আর বলাইয়ের ব্যাপার।'

মা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

'আমি কি করতি পারি, বলো?' ছেলেটা বলে, 'আমি তো সব্বক্ষণ বলি, বাবা বাড়ি চলো—বাড়ি চলো, বাবা! আর সি আমাকে কি বলে, জানো? বলে, তুই চুলোয় যা কুত্তা!'

মা তার দিকে ফিরে তাকায়। ওর দু গাল বেয়ে তখনও অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

'সোনা, তুই তুর বাপকে আনতি যা বাছা! তুই দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে দেকলি, বলাই তুর বাপকে নাথি মারলো আর তুই কিছু করলিনি? সি তুকে কত্তো ভালো-বাসে, জানিস? তুর কথা কত্তো চিন্তা করে! সি তুর বাপ হয় রে, নচ্ছার…' রাগে-দুঃখে ফের কান্নায় মুখর হয়ে ওঠে সোনার মা।

যখন ও মাথা তুলে তাকায়, সোনা তখন বৈঠা টেনে টেনে চড়া এড়িয়ে মাঝ-নদীর দিকে এগিয়ে গেছে।

আসিঙের দোকানে তখন সত্যিই প্রলয়ঙ্কর অবস্থা। মানো তার নিয়মিত নিয়ম-মাফিক টালমাটাল পায়ে পানশালার মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সবাইকে খিস্তি-খাস্তা করছে। চীনে-দোকানি তাকে মুখ সামলাতে বলছে বটে, কিন্তু সত্যি বলতে কি মানোর ব্যাপারে তার তেমন কোনো গা নেই। কারণ মানুষটা যে পরিমাণে রাম টানে, তা তার হিসেবের খাতায় অনেকটা। দোকানের মধ্যে ইচ্ছেমতো কথাবার্তা বলার ব্যাপারে ওই 'হিসেবটাই' মানোর রক্ষা-কবচ। কিন্তু অন্য খদ্দেররা ইতিমধ্যে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো। মানোর মাতলামোর সুবাদে শনিবারের রাতগুলোতে এখানে সমস্ত রকমের ঘটনাই ঘটে। মানো হাজির থাকলে এখানে শান্তিমতো কিছু কেনাকাটা করার উপায় থাকে না।

কাজেই এখন, ঝামেলা যখন ঘন হয়ে উঠেছে, তখন সোনার সেখানে আগমন একটা মনোরম স্বস্তি বিশেষ। সোনা ভেতরে গিয়ে ঢুকতেই একজন চিনির বস্তাগুলোর মাঝখানে তার বাবাকে আঙুল তুলে দেখি- দিলো।

'বাবা!'

মানো চোখ তুলে তাকালো, 'তুই ইথানে কেন? তুকে কে পাঠালো?'

'মা তুমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতি বলেছে,' সোনা বললো। নিজেকে সে বললো, একগাদা অজানা-অচেনা লোকের সামনে সে কিছুতেই সংযম হারাবে না।

'কি?'

'তুমাকে নিয়ে যাবার জন্যি মা আমাকে পাঠায়ে দিলো।'

'তুই! আমাকে নিয়ে যাবার জন্যি তুর মা তুকে পাঠালো! তার মানে এখন তুই-ই আমার বাপ, অ্যাঁ?' মাতাল-ক্রোধে টলতে টলতে বৃদ্ধ মানুষটা ছেলের দিকে এগিয়ে গেলো।

সোনা পিছু হটলো না। সে কোনোদিনও এমন কিছু করেনি যাতে জনতার সামনে নিজেকে বোকা বলে মনে হয়। কিন্তু কি হতে চলেছে তা বোঝার আগেই

মানো সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোনার বাঁ কপালে রগের কাছে একটা ঘুঁষি বসিয়ে দিলো।

'তাহলি তুই আমার বাপ, অ্যাঁ? এখন তুই আমার বাপ!' বলতে বলতে ছেলেকে লাথি মারলো মানুষটা।

দু-তিনজন লোক মানোকে পাকড়াও করে, তাকে ছেলেটার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলো। সোনা হাত দিয়ে নিজের পেটটা চেপে ধরলো, যেখানে এইমাত্র তার বাবা লাথি চালিয়েছে। দু চোখে জল এসে গেলো তার। নেশার উন্মত্ততা ক্রমশ আরও বেশি করে মানোকে চেপে ধরছে। এখন সে নিজের পায়ে প্রায় দাঁড়াতেই পারছে না। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে রীতিমতো ধস্তাধস্তি করছে। কিন্তু লোকগুলো তাকে ধরে রেখেছে। সোনা তার নাগালের বাইরেই সরে রইলো।

'ছি ছি, কি লজ্জা!' একজন বললো।

'লজ্জা?' মানো ফুঁসে উঠলো, 'এখন উ কি না আমার বাপ? উর মা আমাকে নিয়ে যাবার জন্যি উকে পাঠিয়েছে?…ছেড়ে দাও আমাকে।' নিজেকে মুক্ত করে নেবার প্রচেষ্টায় আগের চাইতেও বেশি জোরাজুরি করতে করতে মানুষটা চিৎকার করে উঠলো, 'আমি উকে খুন করবো…হে ভগবান, তুমি আমার সহায় হও…আমি খুন করে ফেলবো উকে।'

এই পর্যায়ে মানুষটাকে সামলে রাখার জন্যে কারুরই তেমন কিছু করার ছিলো না। মানুষটার দেহ এখন ক্ষীণ ও দুর্বল—যেন দেহের হাড়গুলোও জল হয়ে যাচ্ছে। যে লোকটা 'ছি ছি, কি লজ্জা' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলো, সে ফের বললো, 'তুমি ওকে বাড়িতে ধরে নিয়ে যাচ্ছো না কেন, বাছা? দেখছো না, ও শুধু শুধু ঝামেলা পাকাচ্ছে?'

'উকে নৌকোয় বয়ে নিয়ে যেতি হবে। আপনারা এট্টু হাত লাগাবেন?' সোনা জিগেস করলো। এখন তাকে অনেক প্রশান্ত লাগছে। এখন তার একমাত্র চিন্তা, বাবাকে কোনো রকমে দোকান থেকে বের করে এই ঝামেলা থেকে কেটে বেরিয়ে যাওয়া! তার মুখের প্রশান্তির নিচে যে কি হয়ে চলেছে তা কেউ জানে না। তার মনের গভীরে ঘৃণার যে কি তীব্র ঝড় বইছে তা কারুর পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

সোনা এবং আরও চারজনে মিলে মানোকে ধরাধরি করে নৌকোয় নিয়ে তুললো। মাতাল অবস্থায় বুড়োটা তখন নাক ডাকাচ্ছে। এই মাতাল অবস্থাতেই পরিস্থিতি শান্ত হলো।

ওরা চারজন নৌকোটাকে জলে ঠেলে দিলো। সোনা তার বাবার দিকে

তাকালো। একটু বাদে পেছন ফিরে সেতুটার দিকে তাকালো সে।

'বাবা,' ছেলেটা ডাকলো। বাবা ঈষৎ গুটিয়ে উঠলো। 'বাবা, তুমি বাড়ি যাচ্ছো,' ফের বললো ছেলেটা।

নৌকোর সামনে অসংখ্য গরান গাছ আর শান্ত নদীর বিস্তীর্ণ নির্জনতা। নৌকোয় শুধু ওরা দুজন। একেবারে একা। মানোর সঙ্গে একা শুধু সোনা আর নদী আর অরণ্য আর ঝিমঝিমে রাত আর নদীর জলে থিকথিকে অসংখ্য কুমির। বাবার দিকে তাকালো সোনা, 'বাবা, তুমি তকন আমাকে নাথি মেরেছিলে। তাই না?'

সোনার মা অনেক রাত অব্দি অপেক্ষা করে ছিলো। এক কাতে শুয়ে ও সামান্য একটু ঘুমিয়েছিলো, তারপর অন্য দিকে ফিরে শুয়েছে। প্রতিটা শব্দেই ও জেগে উঠে কান খাড়া করেছে। জলে বৈঠা টানার কোনো শব্দ নেই। এতোক্ষণে দোকানপাট নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে গেছে, ভাবলো ও। নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে গেছে সমস্ত কিছু। উৎকণ্ঠা নিয়ে উৎকর্ণ হয়ে থাকতে থাকতে ফের এক অস্বস্তিকর তন্দ্রায় ওর চোখ দুটো জড়িয়ে গেলো।

তারপর শোবার ঘরের মেঝেতে মৃদু ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে ঘুম ভাঙলো ওর।

'কে, মানো?'

ওর কণ্ঠস্বর শুনে সোনা এক লাফে পেছিয়ে গেলো, 'আমি, মা!'

সোনার দেহের হাড়গুলোও যেন তরল হয়ে যাচ্ছে। মদের নেশায় নয়, আতঙ্কে। তার বুকের ভেতরকার সিংহটা কখন যেন মেষে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কথা বলতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে গিয়েছিলো। কিন্তু মা তা লক্ষ্য না করে ফের জিগেস করলো, 'এই এলি? মানো কুথায়?'

ছেলেটা কোনো জবাব না দিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই দেয়ালে গোঁজা পেরেক থেকে নিজের পোশাক নামিয়ে নিলো।

'মানো কুথায়?' মা এবারে গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করে।

'বাইরে ঘুমোচ্ছে। নেশায় মাতাল হয়ে গেছে।'

'কুত্তা!' অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সোনার মা দেশলাই খোঁজে।

সোনা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আতঙ্ক এখন তাকে অন্ধ করে দিয়েছে। মাথায় কেমন যেন একটা ঝিম ধরানো অনুভূতি। একবার নদীর দিকে তাকিয়ে ফের বাড়ির দিকে তাকায় ছেলেটা। একটিমাত্র শব্দ বারবার অনবরত তার মনে আঘাত করে চলেছে: পুলিস!

'মানো!' বাড়ির জনহীন শূন্যতার উদ্দেশ্যে মায়ের কা ়ের আহ্বান শুনতে পায় ছেলেটা, 'মানো!'

আতঙ্কপীড়িত সোনা তখন গরান গাছের অরণ্য আর রাতের নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে যায়।

অনুবাদ / দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নিশানা

অলিভিয়া ওয়াকার

ইজেকিয়েল মহেফেল ১৯১৯, নাডিন গর্ডিমার ১৯২৩, অ্যালেক্স লা গুমা ১৯২৫ এবং রিচার্ড রাইভ ১৯৩১-এর মতো দক্ষিণ আফ্রিকার অন্য আর এক-জন শক্তিশালী কথাশিল্পী অলিভিয়া ওয়াকার। জন্ম ১৯৩৩ সালে নাটালের প্রায় নিঃস্ব একটা পরিবারে। প্রথম জীবনে কবিতায় হাত পাকালেও পরবর্তীকালে সাহিত্য-সাধনার সমস্ত ঝোঁক গিয়ে পড়ে গদ্যে। বৈপ্লবিক চেতনার সঙ্গে আঙ্গিকের অনন্যতা মিশে তাঁর ছোট গল্পগুলি এমন একটা পরিণতি লাভ করে যা বিশ্বের অনেক নামকরা সাহিত্যিকের হাতেও দুর্লভ।

আকাশসমান উঁচু পীচগাছের নিচে কৃষ্ণাঙ্গ কয়েদীদের লাল পিরানপরা নুয়ে-পড়া পিঠগুলোকে দূর থেকে দেখাচ্ছে ঠিক বড় বড় পপির মতো। তাদের মৃদু গুঞ্জন, কোদাল চালানোর ধুপধাপ আওয়াজ অরণ্যের শান্ত নীরবতাকে বিঘ্নিত করছে, গ্রীষ্মের স্নিগ্ধ সকাল হারিয়ে ফেলছে তার প্রশান্তি।

খানিকটা তফাতে গাছগুলোর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন রক্ষী। তার রোদে-পোড়া লোমশ একটা হাত অলসভাবে আঁকড়ে রয়েছে রাইফেলের নল, অন্য হাতে দাড়ি চোমড়াচ্ছে। গত রাত্রে বোনের বাড়িতে ভোজের ভাবনাতেই হয়তো সে এখনও মশগুল—আহা, কি খাওয়াটাই না হলো! কিন্তু আজেবাজে সে যতই ভাবুক না কেন, তার নজর আছে ঠিক বদমাসগুলোর ওপর। পুরনো সব পাপীগুলোরই মুখ তার চেনা, শুধু আজ সকালে যেটা নতুন জুটেছে, ওর জন্যেই যত ভাবনা।

ছেলেটার নাম রবার্ট। অন্যগুলোর মতো বকবক না করে সে তখন একমনে কোদাল চালাচ্ছে। প্রথম দিনের ভয়ের ভাবটুকু কেটে গিয়ে তাকে বেশ চনমনে দেখাচ্ছে, দিগন্তলীন অবাধ পারিপার্শ্বিকতার ছাপ পড়েছে তার চোখে মুখে। গত তিনদিনের বিচিত্র সব ঘটনা সে এখনও স্পষ্ট স্মরণ করতে পারছে। গাঁ থেকে ট্রেনে দীর্ঘ পরিভ্রমণের উন্মাদনা কি কম? এখানে আসার আগে সে একটি মাত্র সাদা মানুষের শহর দেখেছে—ইস্টকোর্ট। ছিমছাম শহরটাকে তার বেশ ভালো লেগে-ছিলো—বড় বড় দোকানে চোখ-ধাঁধানো নানা রকমের জিনিস, লজেন্স, ঝকঝকে টিনের মগ আর জামা-জুতো দেখে তার অনেক অতৃপ্ত সকাল কেটেছে সেই শহরের পথে পথে। সেই সব দোকানে যারা কেনাকাটা করতে আসতো, তাদের টুকরো টুকরো কথা সে সাগ্রহে বোঝার চেষ্টা করতো। অল্প কয়েকদিনের জন্যে দেশের

অবৈতনিক একটা স্কুলে সে গুটিকতক ইংরেজি শব্দ শিখেছিলো, তারই দৌলতে ওদের কথা একটু-আধটু বুঝতে পারতো।

সাত বছর বয়সে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে তাকে গরু চরানোর কাজে দেওয়া হয়েছিলো। রোদ-ঝলমলে সুন্দর সকালে ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে গাদাগাদি করে ঠায় বসে থাকার চাইতে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানো তার কাছে অনেক লোভনীয় মনে হতো। ক্লাসে বসে থাকলেও তার মন উধাও হয়ে যেতো দূরের ওই পাহাড়টার দিকে, যেখানে তার খেলার সাথীরা গুলতি দিয়ে পাখি মারছে, পোড়াবার কাঠ-কুটো খুঁজছে, মনের আনন্দে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। মা-ই তাকে ঢলঢলে ছেঁড়া প্যাণ্ট আর আধময়লা কামিজ পরিয়ে স্কুলে পাঠাতো। এসব কি তার ভালো লাগে? এর চাইতে বরং আদুড় গায়ে নেংটি পরে মাঠে বসে বাজপাখির শন্শন্ ওড়া দেখতে কি মজাই না লাগে! মিষ্টি লাগে ঝাঁ ঝাঁ দুপুর রোদে গাছের ছায়ায় গরু-গুলোর একটানা জাবর কাটার আওয়াজ।

কিছুদিন আগে স্কুল পালিয়ে তাদের পাড়ার কুমলোর সঙ্গে পাখি মারতে গিয়ে-ছিলো, গুলতি হাতে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লো অনেক দূরে। হঠাৎ রবার্টের নজর পড়লো ডুমুর গাছের ডালে বসা বাজপাখিটার ওপর। চকিতে তার গুলতি থেকে ছুটে যাওয়া পাথরের নুড়িটা এসে লাগলো পাখিটার বুকে। অব্যর্থ লক্ষ্যে আঘাত হানলেও বাজের প্রাণ শক্ত, একটু সামলে নিয়ে উড়ে গিয়ে বসলো দূরের এক ডালে। তীক্ষ্ণ ফলা উঁচু উঁচু ঘাস ঠেলে ওরা উঠলো পাহাড়ের ওপর, কাছে যেতেই বাজটা টুক করে উড়ে গেলো অন্য একটা গাছে।

এমনি ভাবে সারাটা বিকেল ধরে চললো মানুষ আর পাখিতে লুকোচুরি—কখনও ওপরে কখনও বা নিচে। সূর্য পাটে নেমেছে, এবার গরু নিয়ে ফিরতে হবে, ফলে সেদিনের মতো স্থগিত রইলো পাখি শিকার।

পরের দিনও স্কুল পালিয়ে খুঁজে খুঁজে বার করলো সেই বাজপাখিটার আস্তানা, আবার শুরু হলো পেছু ধাওয়ার পালা। এক সময়ে সুবিধে মতো জায়গা থেকে কুমলো গুলতির আঘাত হানলো বাজপাখিটার বুকে, বেচারি মাটিতে লটকে পড়লো। কাছে আসতেই ডানা ঝাপটে লুকিয়ে পড়লো অ্যাকাশিয়া ঝোপের আড়ালে, তার আর তখন ওড়ার ক্ষমতা নেই।

কি দরকার এখুনি ওটার পেছনে ছুটোছুটি করার, সারাটা দিনই তো পড়ে রয়েছে? তাছাড়া ওটা আর সহজে উড়তে পারবে না, পরে ধীরেসুস্থে গেলেও চলবে।

গাছের ছায়ায় বসে দুটো ভুট্টা আর খানিক জল খেয়ে ওরা খুঁজতে বেরুলো—

দুজনে দুদিক থেকে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তার দেখা মিললো, নিচু একটা ডালে নিস্তেজ ভাবে ঝিমুচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে রবার্টের গুলতির একটা নুড়ি সোজা আঘাত করলো তার মাথায়। বাজটা আবার লুটিয়ে পড়লো মাটিতে, ওরা সউল্লাসে ছুটলো। কিন্তু পাখিটার তখনও প্রাণ রয়েছে, তখনও সে ওড়ার চেষ্টা করছে, শিকারীর হাত থেকে বাঁচার জন্যে পাথরের আড়ালে ঘুরপাক খাচ্ছে। রবার্ট আর কুমলো যখনই তার মুখোমুখি হচ্ছে, তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে পাখিটা ওদের আঘাত হানার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে অবসর ঘটে ওঠার আগেই একটা নুড়ি এসে তাকে মাটিতে লুটিয়ে দিলো, তারপর বড় বড় ডানা দুটো দুপাশে ছড়িয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মারা গেলো।

বিপুল উল্লাসে বাজপাখির পা ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে গেলো নদীর ধারে, মাথাটা খানিকক্ষণ জলের মধ্যে চুবিয়ে রাখার পর ওরা নিশ্চিন্ত হলো তার মৃত্যু সম্পর্কে।

এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার ফলে কারারক্ষীটার হাই উঠছে, রাগ হচ্ছে একচোখো ভগবানটার ওপর। আঃ, যেমন করেই হোক, কালকের ভোজের আসরের সেই মেয়েটাকে তার চাই! মেয়েটা রাজিও ছিলো, কত কষ্টেই না তাকে পটিয়েপাটিয়ে সবার অলক্ষ্যে বাগানে আনতে পেরেছিলো, কিন্তু সব ভেস্তে দিলো তার বউ। ধীরেসুস্থে বেশ মৌজ করে সে যখন সবে মেয়েটাকে একটা খাসা চুমু খেতে যাবে, হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হলো তার বউ—যেমন গলা তেমনি ঝগড়াটে! তারপরেই শুরু হয়ে গেলো হুলুস্থুলু কাণ্ড—দাপাদাপি, ঠেলাঠেলি, প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম। মেয়েটার সামনে বউটাকে সাবাড় করে দিতে পারলে তবে রাগ যেতো। যদিও বাড়ি ফিরেই সে খানিকটা উসুল করে নিয়েছে, বউটাকে ধরে অ্যাইসান ঠেঙিয়েছে যে মাগীকে আর তিনদিন নড়তে হবে না। কিন্তু তাতে তার কি এসে গেলো? সে কি আর মেয়েটাকে ভোগ করতে পারলো? প্রেয়সীর উদ্ধত যৌবন তাকে কামার্ত করে তুলেছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। বোন নিশ্চয়ই ওর ঠিকানাটা জানে, বিকেলে গিয়ে জেনে আসতে হবে। তারপর ওকে নিয়ে যাবে কোনো নিরালা হোটেলে, চেয়েচিন্তে হয়তো একটা গাড়িও যোগাড় করা যাবে, হয়তো ওকে নিয়ে তুলতে পারবে কোনো নির্জন বাগানবাড়িতেও, তারপর…নাঃ, পানের মাত্রাটা কাল সত্যিই বড্ড বেশি হয়ে গিয়েছিলো, এখনও দেখছি মাথাটা ঝিমঝিম করছে।

তীক্ষ্ণ চোখে সে তাকালো কয়েদিগুলোর দিকে—ব্যাটারা আছে তো ঠিক! একঘেয়ে সুরে কি যেন একটা গান গাইছে, ওদের বলিষ্ঠ বাহু আর বাদামী ঘাড়ে

চিকচিক করছে ঘাম। ওঃ, ব্যাটা জুলুটাই দেখছি সর্দারি করছে! মুখে হাসি লেগে থাকলে কি হবে, ওটা পয়লা নম্বরের পাজির পাঝাড়া। দু-দুবার জেল ভেঙে পালিয়েছিলো। জুলুটার পাশেই খাটছে নতুন কয়েদি রবার্ট। তার চালচলন দেখে তো বেশ শান্তই মনে হচ্ছে।

রক্ষীর মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই যে এতকিছু ভেবে চলেছে। তার কাছে সব কেলেই সমান। এদের শায়েস্তা করতে হলে কথায় কথায় হাঁকাও চাবুক, বেচাল কিছু দেখলেই চালাও গুলি। লাই দিলেই এরা মাথায় চড়ে বসবে। অবশ্য তেমন সুযোগ সে কখনই দেয় না। একবার এক কয়েদি তার সঙ্গে চালাকি করে পালাবার চেষ্টা করেছিলো, তার যে হাল করে ছেড়েছিলো, তারপর থেকে আর কেউ পালাবার চেষ্টাও করে না।

আজ হঠাৎ এদের এত গানের ধুম কেন? কেলে কাফ্রীগুলো সত্যিই ভারি অদ্ভুত জীব। কাঠ ফাটা রোদে মাটি কোপাতে দিলেও ব্যাটাদের হাসি থামবে না, গান বন্ধ হবে না। আজও বেদম চলবে বলে মনে হচ্ছে। ভেড়ার লোমের মতো ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুলে ঠাসা মাথাগুলোর মধ্যে কি আছে একমাত্র ভগবানই জানেন! রক্ষী এদের গানের দু-একটা শব্দ কেবল বুঝতে পারে, নিজেদের কাজ নিয়ে গান বেঁধেছে—সত্যিই আজব কাণ্ড!

অলস ভঙ্গিতে রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিয়ে সে আড়চোখে সূর্যের দিকে তাকালো। প্রায় সাড়ে এগারোটা। আর ঘণ্টাখানেক কাটাতে পারলেই ব্যাস! তারপর কালকের সেই মেয়েটাকে···

গানটা রবার্টের মন্দ লাগছে না। স্কুলে এই একটা মাত্র জিনিসেই সে আনন্দ পেতো। ট্রেনেও আসার সময় যাত্রীদের মুখে বিচিত্র সব গান শুনতে শুনতে এসেছে, আনমনে ভেবেছে এই যে সব অন্ধকার স্টেশনে গাড়িটা মাঝে মাঝে থামছে, এখানে যারা থাকে ওদের সঙ্গে কি তার কোনো সম্পর্ক আছে? ওরা কি তারই মতো বঞ্চিত?

প্রিটোরিয়া স্টেশনে ট্রেনটা যখন থামলো, সে কি চিৎকার-চেঁচামেচি! ইঞ্জিনের গর্জন, যাত্রীদের ঠেলাঠেলি, কুলিদের হৈ-হল্লা যেন তাকে বোবা করে দিলো—একসঙ্গে কত দেখবে, কত শুনবে সে! চোখে পড়লো এক জায়গায় লেখা রয়েছে: কৃষ্ণাঙ্গদের জন্যে। সেখানে বসে পুঁটলিটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সে অবাক চোখে দেখতে লাগলো বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা। তার স্বজাতি বহু লোককেই সে দেখলো, কিন্তু আশ্চর্য, কেউই মাতৃভাষা 'জুলু'তে কথা বলছে না। সবারই মুখে

ইংরিজি এবং সে ইংরিজি শ্বেতাঙ্গদের চাইতেও দুর্বোধ্য। অথচ এদেরই পূর্ব-পুরুষরা যে একদিন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো, এদের দেখে সে কথা বোঝা দুঃসাধ্য। রোগা, ল্যাকপেকে চেহারার গোলামগুলো নুয়ে পড়ে সেলাম করতেই ব্যস্ত !

এদের কারো কাছ থেকে জেনে নিতে হবে অ্যাকাশিয়া হোটেলটা কোন্ দিকে। তার বড় ভাই সেখানকার খাস খানসামা। কথা আছে তাকে রান্নাঘরের কোনো একটা কাজে ঢুকিয়ে দেবে। সেই জন্যেই এখানে আসা। রবার্ট ধীরে ধীরে বাইরে বেরুনোর ফটকটার দিকে এগিয়ে গেলো, সাহস করে গাঁট্টা-গোট্টা দাড়িওয়ালা এক-জন কালো আদমীর সঙ্গে কথাও বললো। লোকটা অমিত বিক্রমে একটা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলেছে। দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই গাড়ি থামিয়ে অন্তরঙ্গের মতো রবার্টের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে সে আলাপ জুড়ে দিলো। গ্রামের হৃদ্য পারিপার্শ্বিকতা পেয়ে রবার্টও খুলে দিলো তার মনের দরজা। একথা জানাতেও সে কসুর করলো না—যে মেয়েটা বিয়ে করতে চায় তাকে পেতে গেলে পণ হিসেবে গোটা দশেক গরুর দাম যোগাড় করতেই হবে। আর সেই জন্যেই রোজগারের ধান্দায় সে এখানে এসেছে।

লোকটা তাকে তেমন ভরসা দিতে পারলো না। 'এখানে কাজ জোটানো খুব শক্ত। ট্রান্সভাল থেকে আসা কত বেকারই না শহরে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি হচ্ছি এখানকার কুলির সর্দার, আমার মতো শক্তি আর কারো নেই। সাদারা সেটা হাড়ে হাড়ে টের পায় বলেই আমার সঙ্গে কুকুরের মতো ব্যবহার করতে সাহস পায় না।'

রবার্ট বললো, 'আমার দাদা অ্যাকাশিয়া হোটেলের খাস খানসামা', খুব কম হলেও মাসে ন পাউণ্ড আয় করে। সেখানে গেলে একটা না একটা কাজ জুটবেই।'

রেল-ইয়ার্ডের পেছনে একটা হোটেল আছে, ছ পেন্স দিলে কৃষ্ণাঙ্গদের সেখানে রাতটুকু থাকতে দেয়। সেখানে তল্পিতল্পা রেখে রবার্টকে অ্যাকাশিয়া হোটেলটা খুঁজে বার করতে হবে। মূল্যবান এই তথ্যের জন্যে কুলির সর্দারকে ধন্যবাদ জানিয়ে রবার্ট পা বাড়ালো কালোদের সেই হোটেলটার খোঁজে। শক্ত তক্তার ওপর শুতে হবে, টাকাটা অগ্রিম। হোটেলের দফতরে পোটলাপুঁটলি জমা রেখে সে বেরিয়ে পড়লো অ্যাকাশিয়া হোটেলের উদ্দেশ্যে।

কি বিচিত্র সব রাস্তা আর কত কিছুই না দেখার জিনিস—গাড়ি-ঘোড়া দোকান-পাট, এত কিছুর মধ্যে থেকে পথ খুঁজে পাওয়া কি চাড্ডিখানিক কথা ! তবু শেষ পর্যন্ত হোটেলের বাইরে গাছতলায় দাদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। কুশল বিনিময়ের

পত্র সাংসারিক খবর দিলো—বুড়ো বাপের শরীর খুব খারাপ, হয়তো সামনের শীতেই টেঁসে যাবে। বাপকে নিয়ে দু ভাইয়ের মধ্যে খানিকটা হাসি-মস্করা চললো। গত বছরেও বুড়ো একটা বিয়ে করেছে, এই নিয়ে ছটা হলো। নতুন বউটারও বাচ্চা হবে, তাদের নতুন ভাগীদার। বুড়ো বহুবার চেষ্টা করেছে তার অগণন সন্তানসন্ততির সংখ্যা নিরূপণ করতে, কিন্তু ও যে কখনও গুনতেই শেখেনি। ফলে কত যে বড় হয়েছে, কত মরেছে আর বড় হবার পর কাজ করতে যাওয়ার নামে কত ছেলে যে পালিয়েছে তার সঠিক হিসেব বুড়ো কিছুই জানে না।

তাই রবার্ট যখন কাজ খুঁজতে যাচ্ছে বলে বাপের কাছ থেকে বিদায় নেয়, বুড়ো তখন বাধা দেয়নি। বরং প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে যে তার রোজগারের দুই-তৃতীয়াংশ টাকা সে বাড়ি পাঠাবে আর বউ আনতে গরু কেনার জন্যে বুড়ো সেই টাকা রবার্টের নামে জমাবে।

বড় ভাই রবার্টকে জিগেস করলো, 'খেয়েছিস কিছু?'

'হ্যাঁ।'

'আবার আটটার পর আসিস, তখন সাহেবদের খাওয়া হয়ে যাবে।'

রবার্টের ভাই পেছনের দরজা দিয়ে হোটেলে ঢুকে গেলো, সেও নেমে এলো রাস্তায়। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়ালো খানিকক্ষণ। সন্ধ্যে নাগাদ আবার ফিরে এসে দাঁড়ালো হোটেলের বাইরে, কাঁচের দেওয়ালের এপার থেকে দেখতে লাগলো ভেতরে আলো-ঝলমলে খাবার ঘরের সমারোহ। কি রাজকীয় কাণ্ডই না চলছে সেখানে! যারা খাচ্ছে, বাইরে থেকে কেবল তাদের মাথাগুলোই দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তার ভাইকেও সাদা উর্দি পরে নানা রকম খাদ্য আর পানীয় নিয়ে ছোটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছে। পেছনে কখন যে সবুজ রঙের একটা গাড়ি এসে থেমেছে, সন্দেহজনক একটা কিছুর আশঙ্কায় দুজন আরক্ষী যে লাফিয়ে নেমে তার দিকে এগিয়ে এসেছে, রবার্ট সেসব কিছু খেয়ালই করেনি।

'অ্যাই, পাস আছে?' সার্জেন্ট সরাসরি তাকে জিগেস করলো।

ঠিক বুঝতে না পেরে থতমতো খেয়ে রবার্ট শুধু একটু হাসলো।

'পাস আছে?' সার্জেন্টের গলা আরও চড়ে উঠলো। রবার্ট তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে একতাড়া কাগজ সার্জেন্টের হাতে দিলো, সার্জেন্ট প্রতিটা কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। 'বাড়ির পাস আছে, শহরের পাস রয়েছে, কিন্তু তোমার ছাড়পত্র কোথায়? আসছো কোত্থেকে?'

বুঝতে না পেরে রবার্ট আবার চুপ করে রইলো।

'নাটাল থেকে আসছো?' ঝাঁঝালো গলায় সার্জেন্ট ফের প্রশ্ন করলো।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, নাটাল থেকে।'

'এখানে কাজ করো ?'

'না।'

আর কিছু বলার প্রয়োজন হলো না, সার্জেন্ট সেপাইটির দিকে তাকালো।

'একে নিয়ে চলো।'

চোখের নিমেষে পিঠমোড়া করে বেঁধে পেটে লাঠির গুঁতো দিতে দিতে তাকে তুলে ফেলা হলো কয়েদ-গাড়িতে, তারপর গলাধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঠেসে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। আলো-বাতাসবিহীন গাড়ির ভেতরে বেশ খানিকক্ষণ থাকার পর যখন তার সম্বিৎ ফিরে এলো, গাড়িটা তখন হু হু করে ছুটে চলেছে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে।

তিনদিন ধরে বিচারের প্রহসনের পর তার শাস্তি হলো পনেরোদিনের সশ্রম কারাদণ্ড। কারাবাসের এই পর্যায়ে অন্যান্য কয়েদিদের সঙ্গে ফলের বাগানে কোদাল চালাতে তার মন্দ লাগছে না। এর জন্যে সে মজুরী পাবে না। ছাড়পত্র না থাকলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে এইভাবে বিনা মজুরিতে কৃষ্ণাঙ্গদের খাটিয়ে নেওয়াটা শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের এক অভিনব ফন্দি।

রবার্টের পাশের কয়েদি হঠাৎ কোদাল থামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, হাতের তেলো দিয়ে মুছে নিলো কপালের ঘাম। তারপর রক্ষীর দিকে নজর পড়তেই অস্ফুট বিস্ময়ে বলে উঠলো, 'আরে, লোমশ ভূতটা ঘুমিয়ে পড়েছে দেখছি !'

রবার্টেরও কোদাল থামলো। পাশের সঙ্গীটি নতুন উৎসাহে জুড়ে দিলো আর একটা গান। রক্ষীর মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে, টুপিতে মুখখানা প্রায় ঢেকে গেছে। অন্যমনস্কভাবে রবার্ট আবার কোদাল চালাতে লাগলো। হঠাৎ কোদালের মুখে পাথরের একটা ছোট নুড়ি বেজে ঠং করে উঠলো। পিঠটা টান টান করে সে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো। আর ঠিক তখনই নজর পড়লো পীচের নিচু ডালে পায়রা না ঘুঘু কি যেন একটা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

চকিতে একবার রক্ষীর দিকে তাকিয়ে, মাটি থেকে সেই নুড়িটা তুলে নিয়ে ধাঁ করে ছুঁড়ে মারলো পাখিটার দিকে, অব্যর্থ লক্ষ্যে সেটা ঘুরতে ঘুরতে পড়ে গেলো মাটিতে। নিজের কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে রবার্ট ভুলে গেলো সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা। কোদাল ফেলে সে তখুনি ছুটলো পাখিটাকে কুড়িয়ে আনতে।

রক্ষীর সতর্ক চিৎকার তার কানে গেলো না। পাখিটাকে ধরতেই হবে, কে জানে হয়তো ঠিকমতো লাগেনি। নিচু ডালপালার মধ্যে দিয়ে কুঁজো হয়ে ছুটতে ছুটতে সে পাখিটাকে ধরে ফেললো—একটা ডানা ভাঙা অবস্থায়।

রক্ষী ভাবলো কয়েদিটা বুঝি পালাচ্ছে তার চোখে ধুলো দিয়ে। মুহূর্তে গর্জে উঠলো তার রাইফেল, অদৃশ্য কোন্ শক্তির ধাক্কায় কুঁজো হয়ে ছোটা মূর্তিটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে। অন্য কয়েদিদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে রক্ষী ছুটলো ঝোপটার দিকে। না, দ্বিতীয়বার গুলি করার আর দরকার হয়নি, একটা গুলিতেই শেষ! রবার্টের মাথার খুলিটা চৌচির হয়ে গেছে, তবু একটা হাতের মুঠোয় সে তখনও ধরে রয়েছে সেই শ্বেত পারাবতটি।

রবার্টের হাতের পায়রাটা এক ঝলক দেখে নিয়ে রক্ষী মন্তব্য করলো, 'আরে এ যে দেখছি নতুন কয়েদিটা!' নিজের রাইফেলের নিশানার চমৎকারিত্বে তার বুকটা ফুলে উঠলো। 'ঠিক হয়েছে ব্যাটা বেলে হারামজাদা!'

অনুবাদ / অসিত সরকার

তুই যদি ঘোড়া হতিস

ঘাসান কানাফানি

প্যালেস্তাইনের আশ্চর্য জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক, প্রখ্যাত শিল্পী এবং বিশিষ্ট একজন মুক্তিযোদ্ধা ঘাসান কানাফানির জন্ম ১৯৩৬ সালে, আক্রায়। কিন্তু অন্য বহু উদ্বাস্তু পরিবারের মতো নানান জায়গা ঘুরে শেষে ১৯৪৮ সালে আস্তানা গাড়েন দামাস্কাসে। পড়াশোনা শেষ করে প্রথমে সিরিয়া, পরে কুয়েতে শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতায় নিযুক্ত থাকেন। ১৯৬৯ সালে চলে আসেন বেরুটে এবং বহু সংবাদপত্র ও মুক্তিআন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত থাকেন। ১৯৭২ সালে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়েসে প্রচণ্ড এক বোমা বিস্ফোরণে বিপ্লবী এই কথাশিল্পীর মৃত্যু ঘটে। অত্যন্ত স্বল্পায়ু জীবনেও তিনি পাঁচটি উপন্যাস, পাঁচটি গল্পসংকলন, দুটি নাটক এবং শিল্প, সাহিত্য ও রাজনীতির ওপর অজস্র প্রবন্ধ রেখে যাবার অবকাশ পান।

'তুই যদি ঘোড়া হতিস, আমি সোজা তোর মাথায় গুলি করে মারতুম।'

ঘোড়া কেন? কুকুর বেড়াল ইঁদুর কিংবা অন্য কোনো জীব নয় কেন? অন্য কোনো জীব হলেও তো যে কেউ তার মাথায় গুলি করে মারতে পারে?

যখন থেকে সে শব্দগুলোর মানে বুঝতে শিখেছে, অবশ্য ঠিক কবে থেকে সেটা তার স্পষ্ট মনে নেই, তখন থেকেই সে বাবার মুখে এই কথাগুলো শুনে আসছে। ব্যাপারটা সত্যিই ভারি অদ্ভুত, নিজের ছেলেকে ঘোড়া হিসেবে ধরে নেওয়ার এই যে ইচ্ছে, এ পৃথিবীতে একমাত্র তার বাবাকেই সে কেবল প্রকাশ করতে শুনেছে। স্রেফ ঘোড়া, আর অন্য কিচ্ছু নয়! এর চাইতে যেটা আরও অদ্ভুত ব্যাপার, বাবা কিন্তু কখনই চাইতেন না অন্য আর কেউ ঘোড়া হোক, তা তিনি তার ওপর যত ক্রুদ্ধ হোন বা তাকে তিনি যতই অপছন্দ করুন না কেন।

প্রথম প্রথম সে ভাবতো বাবা বুঝি অন্য কিছুর চাইতে ঘোড়াদেরই বেশি অপছন্দ করতেন, তাই কারুর ওপর প্রচণ্ড রেগে গেলে তিনি বলতেন, 'তুই যদি ঘোড়া হতিস, আমি তোকে গুলি করে মারতুম।' মনে মনে সে আরও ভাবতো, বাবা বুঝি নিজের ছেলের চাইতে এ পৃথিবীতে আর কাউকে এত ঘৃণা করতেন না, এবং সেই জন্যে তিনি অন্য কাউকে কখনই বলতেন না, 'তুই যদি ঘোড়া হতিস, আমি সোজা তোর মাথায় গুলি করে মারতুম।'

সময় বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে তার সেই ছেলেমানুষি ধারণাটাও সম্পূর্ণ বদলে যায়। কেননা সে আবিষ্কার করতে পারে এক সময়ে বাবা ঘোড়া অসম্ভব ভালোবাসতেন

এবং ঘোড়া সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিলো অপরিসীম। কেবল গ্রাম ছেড়ে আসার পর থেকেই ঘোড়া সম্পর্কে তাঁর আর কোনো উৎসাহ ছিলো না।

একবার, স্বভাবের তুলনায় বাবা যখন বেশ হাসিখুশি আর সরিফ মেজাজে ছিলেন, সুযোগ বুঝে সে জিগেস করেছিলো :

'আচ্ছা, আমাকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখার জন্যে তুমি সব সময় কেন চাও বল তো যে আমি একটা ঘোড়া হই?'

চকিতে ভ্রূ কুঁচকে বাবা গম্ভীর গলায় বলেছিলেন :

'এ সব তুই বুঝবি না। কখনও কখনও এমন একটা সময় আসে যখন কোনো ঘোড়াকে গুলি করে মারাটা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে।'

'কিন্তু বাবা, আমি তো ঘোড়া নই!'

'জানি। আমি খুব ভালো করেই জানি। আর সেই জন্যেই তো মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছে করে—ঈশ্বর তোকে একটা ঘোড়া বানালেই ভালো করতেন।'

এই বলে তার বাবা চওড়া কাঁধ ফিরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিলেন। ছেলে কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বাবার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে ছিলো। থমকে বাবা মর্মভেদী দৃষ্টিতে ছেলের আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়েছিলেন। ছেলেও বৃথাই চেষ্টা করেছিলো বাবার মনের ঠিকানা খুঁজে পাবার।

'তুমি আমাকে এত ঘেন্না করো?'

'আমি তোকে একটুও ঘেন্না করি না।'

'তাহলে?'

'আমি তোকে ভয় পাই।'

মুহূর্তের জন্যে নিশ্চুপ থাকার পর সে বাবার পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছিলো। চওড়া সিঁড়িটায় উনি যখন বাঁক নিচ্ছিলেন, তখনই সে বুঝতে পেরেছিলো জীবনের প্রায় সবটাই নির্জনতায় নিঃসঙ্গ কাটিয়ে দেওয়া এই হতভাগ্য বৃদ্ধ মানুষটা তাকে কি ভীষণই না ভালোবাসেন। তাঁর সারাটা যৌবনই কেটেছে ঘোড়ার নেশায়, তারপর হঠাৎই সবকিছু ছেড়ে দেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সদ্যজাত শিশুপুত্রটিকে নিয়ে তিনি চলে আসেন শহরে। সামরা, বেদা, বার্ক, সাবা প্রভৃতি তাঁর প্রিয় সব ঘোড়াগুলো, এমন কি ঘোড়া-বিচরণের দুর্লভ সুন্দর মাঠগুলোকেও তিনি বিক্রি করে দেন। কেন তিনি এ কাজ করলেন, তরুণ যুবকটির কখনও সুযোগ হয়ে ওঠেনি বাবাকে এ প্রশ্ন করার। আর করলেও সে নিশ্চয়ই কোনো জবাব পেতো না।

বাবাকে সে খুব ভালো করেই চেনে, সে জানে বাবার অতীত যেন হাজারটা চাবি দেওয়া কাঠের ভারি একটা সিন্দুক, যেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে অতল সমুদ্রে।

কাহিনীটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই সে মনে মনে স্থির করেছিলো, সুযোগ পেলেই সে এই রহস্যের যবনিকা উন্মোচন করবে। যেহেতু গ্রামে তখনও বাবার কিছু বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়-স্বজন রয়ে গিয়েছিলো, তাই একবার তিনি যখন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন, ছেলে তখন চুপিচুপি বাবার ঘরে ঢুকেছিলো, যেখানে সে আগে প্রায় ঢোকেনি বললেই চলে। এই প্রথম সে আবিষ্কার করলো আশ্চর্য সুন্দর সুন্দর সব ঘোড়ার ছবি টাঙানো রয়েছে সারা দেওয়াল জুড়ে। টেবিলের টানার ফাঁকে ছুরির ফলা চালিয়ে সে ড্রয়ারটা খুললো, খুঁজে পেলো কালো চামড়ায় বাঁধানো ছোট একটা খাতা। আরামকুর্সিতে আয়েশ করে বসে সে খাতাটা পড়তে লাগলো।

হতাশ হতেও তার খুব একটা বেশি সময় লাগলো না। কেবল সংখ্যা, দাম এবং বংশতালিকা ছাড়া খাতাটাতে প্রায় আর কিছুই ছিলো না। দাম বলতে যে দামে ঘোড়াগুলোকে কেনা-বেচা করা হয়েছিলো আর বংশতালিকাগুলো ছিলো বিগত কয়েকশো বছর ধরে বিস্তৃত। খাতার একপাশে রয়েছে অত্যন্ত অমনোযোগের সঙ্গে, যেন স্বপ্নের ঘোরে লেখা কিছু অসমাপ্ত মন্তব্য।

"২০. ৪. ১৯২৯ : ওরা আমাকে বললো ওটাকে বিক্রি করে দিতে কিংবা মেরে ফেলতে।"

গভীর আগ্রহে সে পাতা উলটে চললো। উত্তেজনায় স্নায়ুপুঞ্জ এমন টান টান হয়ে উঠেছে যেন একটা দড়ির শেষ প্রান্তে এসে পৌঁচেছে, যেকোনো মুহূর্তে হাতটা ফসকে যেতে পারে।

"১. ১২. ১৯২৯ : ওটা আমার সব চাইতে মূল্যবান সম্পদ, কোনোমতেই আমি ওটাকে হাতছাড়া করতে পারি না! তবু ওরা আমাকে এখনও উপদেশ দিচ্ছে হয় ওটাকে বিক্রি করে দিতে নয়তো মেরে ফেলতে।"

"২০. ৩. ১৯৩০ : এগুলো সত্যিই বিরক্তিকর কুসংস্কার। বার্ক আমার জীবনে দেখা সব চাইতে দুর্লভ অশ্ব এবং খুবই শান্ত। আমি ওকে কিছুতেই মেরে ফেলতে পারবো না।"

রহস্যময় দিনলিপিটার শেষ পৃষ্ঠায় কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা রয়েছে চরম পংক্তি কটি :

"২৭. ৭. ১৯৩০ : প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনিতে বার্ক ওকে ফেলে দিলো নদীর পাড়ে, খুরের চাঁটে মাথার খুলিটা একেবারে গুঁড়িয়ে দিলো, তারপর সামনের পায়ের ধাক্কায় ওকে ছিটকে ফেলে দিলো নদীর জলে। শেষ পর্যন্ত আবু মহম্মদই বার্কের মাথায় গুলি করে মারলো।"

আবু মহম্মদ বললো :

'জন্মের সময়, ঠিক যে মুহূর্তে ওটা শুকনো ঘাসের ওপর পড়েছিলো, তখনই ঘোড়াটাকে গুলি করে মারা উচিত ছিলো। তারপরে কোনো ঘোড়াকে মারা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যদি কোনো ঘোড়া তোমার সঙ্গে এক বছর, দু বছর কিংবা তিন বছর থাকে, তাহলে সে তোমার ভাইয়ের মতো, এমন কি তার চাইতেও বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কোনো মানুষ কি তার ভাইকে খুন করতে পারে? তোমার বাবা, আল্লা ওঁকে ক্ষমা করুন, কিছুতেই রাজি হননি, খালি বলতেন অমন সুন্দর ঘোড়া নাকি আর কখনও ছাখেননি। আমরা ওঁকে বলতুম : "ওই ধরনের ঘোড়া দেখতে খুবই সুন্দর হয়, কিন্তু ওটাকে কোনোমতেই বাঁচতে দেওয়া উচিত নয়।" উনি বলতেন : "কিন্তু ওটার বংশের তো কোথাও কোনো ত্রুটি নেই।" তবু আমরা ওঁকে সতর্ক করে দিতুম : "ওটার প্রকৃত যা মূল্য আপনাকে কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশি মূল্য দিতে হবে হুজুর।" আল্লা ওঁকে কৃপা করুন, তোমার বাবা ভীষণ জেদী মানুষ। ঘোড়াটাকে উনি মেরে ফ্যালেননি, বিক্রি করেননি, এমন কি ঘোড়াটাকে ছেড়েও ছাননি। আমরা ওঁকে প্রায়ই সাবধান করে দিতুম : "হুজুর, আর যাই করুন অন্তত ঘোড়াটার পিঠে কখনও চড়বেন না।" কিন্তু, আল্লা ওঁকে ক্ষমা করুন, আমাদের কথা উনি কানেই নিতেন না।

'মাকে তোমার নিশ্চয়ই মনে নেই। মনে থাকার কথাও নয়। উনি ছিলেন ভারি চমৎকার মহিলা, সবাই ওঁকে খুব পেয়ার করতো। তোমার বাবা, আল্লা ওঁকে সুখী করুন, তোমার মাকে পাগলের মতো ভালোবাসতেন। তোমার বাবার মতো এত মহব্বত কেউ তাঁর স্ত্রীকে কখনও করেছে বলে অন্তত আমরা শুনিনি। তোমার মা ছিলেন যেমন খুবসুরত, তেমনি বুদ্ধিমতী। আমার যতটুকু মনে পড়ছে, শাদির পর বছরখানেক ওঁরা দুজনে একসঙ্গে থাকতে পেরেছিলেন, তারপর তোমার জন্মের কিছুদিন পরেই ঘোড়াটা ওঁকে নদীর পাড়ে আছড়ে ফেলে দেয়।

'তুমি জানতে চাইছো কেন আমরা ঘোড়াটাকে মারতে চেয়েছিলুম? বেটা, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুবই কঠিন। এ প্রশ্নের জবাব কেবল তাঁরাই দিতে পারেন যাঁরা অভিজ্ঞ আর জ্ঞানী, এবং অভিজ্ঞ আর জ্ঞানী মানুষ ছাড়া সেই জবাবের মানে বোঝাও খুব মুশকিল। আমি বুড়ো-হাবড়া মানুষ। তুমি বরং অন্য কাউকে জিগেস করলে না কেন?

'তবে আমি খুব ভালো করেই জানি, তোমার বাবা তোমাকে ঘেন্না করেন না, উনি তোমাকে ভয় পান। তুমি যখন খুব ছোট ছিলে, যখন একটা ছোট্ট নুড়িও তুলতে পারতে না, সেই তখন থেকেই উনি তোমাকে ভয় পেয়ে আসছেন। আমি

হলে নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে তাঁকে কখনও কোনো প্রশ্ন করতুম না।'

কিন্তু কেন, কেন তার বাবা, শুধু মাত্র তার বাবাই তাকে ভয় পান? হাসপাতালের প্রতিটা সহকর্মী আর বন্ধুরাই তো তাকে একজন শান্তিপ্রিয় আর নিরহঙ্কারী মানুষ হিসেবে জানে। জীবনে সে কখনও ছোট্ট একটা পতঙ্গের ও জীবন নষ্ট করেনি। তাহলে অন্য কেউ না হয়ে তার বাবাই বা কেন তাকে ভয় পেতে যাবেন? তাঁর শল্যচিকিৎসার ধারালো ছুরির ফলাকে রোগীরা পরম নির্ভরতার সঙ্গেই গ্রহণ করে। কই, ওরা তো কখনও তাকে ভয় পায় না! তাহলে বাবাই বা কেন তাকে ভয় পেতে যাবেন? তার মুখে কি এমন কোনো ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে, যার জন্যে শুধু মাত্র তার বাবাই তাকে ভয় পান?

একদিন রাত্রের ঘটনায় এর কিছুটা আভাস পাওয়া গেলো।

নিজের ঘরেই সে শুয়েছিলো, হঠাৎ বাবার ঘর থেকে ভেসে এলো একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। পড়ি কি মরি করে সিঁড়ি ভেঙে সে ওপরে এলো, দমকা বাতাসের মতো ঢুকে পড়লো ঘরের ভেতরে, দেখলো বিছনায় দুমড়ে-মুচড়ে বাবা ছটফট করছেন। বৃদ্ধ মানুষটা যে উপাঙ্গ বৃদ্ধির অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন এবং ওটা যেকোনো মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে, সেটা আবিষ্কার করতে তার খুব একটা বেশি সময় লাগলো না।

আর্দালীরা যখন চাকাওয়ালা নিচু গাড়িতে করে ঠেলতে ঠেলতে তাঁকে অস্ত্রোপচারের ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, বাবা তখন জানতে চাইলেন, 'অস্ত্রোপচারটা কে করবে?'

আর্দালীদেরই একজন জবাব দিলো, 'কেন, আপনার ছেলে, শহরের যিনি সেরা সার্জেন।'

বৃদ্ধ চকিতে উঠে বসলেন, চেষ্টা করলেন চেপে ধরা বলিষ্ঠ হাতগুলো থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার। সে প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো, উনি তখন তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করলেন :

'না না, কিছুতেই তা হবে না! আমার ছেলে ছাড়া আর যে কেউ অস্ত্রোপচার করতে পারে···এমন কি কোনো কসাই হলেও চলবে, কিন্তু আমার ছেলে নয়!'

'সে কি, উনি তো যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গেই হাজার হাজার অস্ত্রোপচার করেছেন!'

বৃদ্ধ কিন্তু অদম্য। যন্ত্রণায় আতঙ্কে প্রাণ প্রায় বেরিয়ে যাবার যোগাড়, তবু উনি চেঁচাচ্ছেন। অবচেতন করার আসন্ন প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

'ও আমাকে মেরে ফেলবে! ও আমাকে মেরে ফেলবে!'

'কি আজেবাজে বকছেন?'

'আজেবাজে হোক বা না-ই হোক। আমি চাই না আমার ছেলে এ ঘরে ঢুকুক। এমন কি ও দেখুক সেটাও আমার পছন্দ নয়।'

এর পরেও তর্ক করাটা অর্থহীন। ছেলে অন্য কারুর চাইতে বাবাকে খুব ভালো করেই জানে, তাই হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে সে প্রতীক্ষা করার ঘরটাতে ফিরে এলো।

যে শল্যচিকিৎসক অস্ত্রোপচার করেছিলেন, তিনি বললেন:

'বিশ্বাস করো, তোমার বাবাকে অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে এমন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন আমাকে কখনও হতে হয়নি। অবেদনিক প্রয়োগ করার পরে অনুভূতি লোপ পাওয়া তো দূরের, অস্ত্রোপচার চলাকালীন সারাটা সময়ই উনি সমানে বক-বক করে গেলেন। আর ওঁর অদ্ভুত অদ্ভুত সেই সব কথার অর্থ স্বয়ং শয়তানও বুঝতে পারবে কিনা সন্দেহ। ওঁর ধারণা, আবু মহম্মদ···ভদ্রলোক কে আমি ঠিক জানি না···অত্যন্ত দুর্বোধ্য আর নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। সেই জন্যেই একটা ঘোড়াকে উনি অমন নির্মমভাবে মারতে পেরেছিলেন, অথচ ঘোড়ার যিনি মালিক হাজার চেষ্টা করেও তিনি তা পারেননি।

'তোমার বাবা তাঁর যৌবনের দিনগুলোর কথা এমন সুন্দরভাবে বলছিলেন, আমার মনে হয় শুনলে তোমার নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগবে। উনি বার বারই তোমার মার, বিশেষ তাঁর রূপের কথা বলছিলেন, বলছিলেন তাঁর মৃত্যুর জন্যে নাকি বার্কই দায়ী। আচ্ছা, এই বার্কটা কে?

'তাছাড়া, তোমার বাবা ত্রিশ বছর আগেকার একটা ঘোড়ার কথাও বলছিলেন। নিখুঁত বংশের একটা ঘুড়ীর সঙ্গে গভীর মরুভূমি থেকে আনা বেদুইন একটা ঘোড়ার মিশখাওয়ানো সেই ঘোড়াটা জন্মেছিলো একটা ঝড়ের রাতে। তোমার বাবার চোখে ওটা ছিলো পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর ঘোড়া। কোথায় অন্য কোনো রঙের চিহ্নবিহীন সম্পূর্ণ ধূসর বর্ণের। অশ্বশাবকটাকে দেখা মাত্র তোমার বাবা খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন এবং নিচু একটা পাঁচিলের ওপর লাফিয়ে উঠে শাবকটাকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন। শাবকটা যখন তার পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারলো, সবাই দেখলো—গলার পাশ থেকে সারাটা ডানদিক জুড়ে অসমান্তরাল একটা লালচে দাগ রয়েছে। তোমার বাবা বলছিলেন প্রথমে দাগটা ওঁর ভালোই লেগেছিলো, কিন্তু পাঁচিলের ওপার থেকে আবু মহম্মদ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিলো, "শাবকটা এক্ষুনি মেরে ফেলুন, হুজুর।" তোমার বাবা রেগে গিয়ে জিগেস করেছিলেন, "কেন?" আবু মহম্মদ বলেছিলো, "আপনি কি ওই লালচে দাগটা দেখতে পাচ্ছেন না? ওটার

মানে শাবকটা একদিন আপনার কোনো প্রিয়জনের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। জন্ম থেকেই ও নিহতের সেই রক্ত তার শরীরে বহন করছে। তাই বড় হয়ে ওঠার আগেই শাবকটাকে মেরে ফেলতে হবে।"

'ওই ধরনের কুসংস্কারকে তোমার বাবা আদৌ আমল দিতে চাননি, তাই ঘোড়াটাকে মারেননি। উনি বলেছিলেন ওটার পিঠে চড়া যে খুব সহজ ছিলো শুধু তাই নয়, ঘোড়াটা ছিলো যেমন বাধ্য, তেমনি বুদ্ধিমান। এবং সামান্য একটা মাছিকেও বিরক্ত না করে বেশ কয়েক বছর নিজের চারণভূমিতেই কাটিয়ে দিয়েছে।

'এই পর্যন্ত বলে তোমার বাবা চুপ করে গিয়েছিলেন। সত্যি বলতে কি, এতে আমি খুশিই হয়েছিলাম। উনি যতক্ষণ কথা বলছিলেন, আমি কিছুতেই মনঃসংযোগ করতে পারছিলাম না।

'আচ্ছা, এই ধরনের অদ্ভুত কাহিনী তুমি কখনও শুনেছো—একটা ঘোড়া জন্মের মুহূর্ত থেকে নিহতের রক্ত তার দেহে বহন করে চলেছে? অথচ তোমার বাবা এমন রহস্যময় ভঙ্গিতে কথাগুলো বলছিলেন, আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, এই ধরনের আজগুবি গল্প প্রসঙ্গে তুমি কখনও বাবার সঙ্গে তর্ক করোনি?'

বাড়ির দিকে সে যখন ফিরে চলেছে তখন প্রায় নিশান্তিকা। সহকর্মীর কথাগুলো তখনও তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

তাহলে ব্যাখ্যাটা এই। এই বৈরী মনোভাবই বাবা ত্রিশ বছর ধরে তাঁর মনের মধ্যে পোষণ করে আসছেন! এই জন্যেই তিনি তাকে ভয় পান এবং একই কারণে তিনি চাইতেন তাঁর ছেলে যদি ঘোড়া হতো তাহলে . [illegible]জা তার মাথায় গুলি করে মারতেন!

কৈফিয়তটা তাহলে এই-ই!

তার দেহ আর পিঠের ডানদিক বরাবর আঁকাবাঁকা গাঢ় একটা বাদামী রঙের রেখা, ঠিক যে ধরনের চিহ্ন বার্কের দেহে দেখা গিয়েছিলো, নিহতের সেই রক্তরেখাই তাহলে এই উপ-কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত? যে চিহ্নটাকে ছুঁয়ে তার বান্ধবী একদিন বলেছিলো: "এত বড় জড়ুল আমি কখনও দেখিনি। কিন্তু এটাকে এমন লাল, ঠিক জমাট-বাঁধা রক্তের মতো দেখতে কেন?" এটা কি তাহলে সেই চিহ্ন! বার্ক যেমন তার মাকে দেখার আগে, মার মাথার খুলিটা গুঁড়িয়ে তাকে নদীতে ফেলে দেবার অনেক বছর আগে থেকেই মার রক্ত নিজের দেহে ধারণ করেছিলো, সেও ঠিক তেমনি ভাবে জন্মমুহূর্ত থেকে নিহতের রক্তচিহ্ন নিজের দেহে ধারণ করছে বলেই হতভাগ্য বাবা তাকে ভয় পান! এই মর্মান্তিক যন্ত্রণাই উনি আজ ত্রিশ বছর ধরে

ভোগ করে আসছেন আর সেই জন্যেই উনি চান ওঁর ছেলে যদি ঘোড়া হতো তাহলে সোজা তার মাথায় গুলি করতেন।

অর্থহীন, নির্বোধ কোনো কাহিনীও মানুষের জীবনকে নষ্ট করে দিতে পারে, ঠিক যে নির্বুদ্ধিতার মধ্যে তার বাবা জীবনের ত্রিশটা বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। বাবা আর ছেলের মাঝখানে গড়ে উঠেছে আতঙ্কের অদৃশ্য একটা প্রাচীর। কিন্তু কেন? যেহেতু আবু মহম্মদ ওই গাঢ় বাদামী দাগটার পেছনে যে জটিল রহস্য তার নিতান্ত সরল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা জানতো না। যেহেতু তার বাবা…

সহসা রাস্তার মাঝখানেই থমকে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগলো:

'পৌরাণিক এই ধারণাটাকে বাবা নস্যাৎই করে দিয়েছিলেন, উনি চেয়েছিলেন এই কুসংস্কারের বিরোধিতাই করতে। কিন্তু তাতে কি লাভ হলো? আবু মহম্মদই তো জয়ী হলো, উনি গেলেন হেরে, আর তার জন্যে তাঁকে চরম মূল্যও দিতে হলো।

'লালচে-বাদামী একটা দাগ। এর কারণটা কি আমরা জানি, কিন্তু আমরা জানি না এটা ঠিক একই জায়গাতে কেন, কেন আর অন্য কোনো জায়গায় নয়। এটা তো অন্য কোনো ধরনের চিহ্নও হতে পারে? আবু মহম্মদ বলেছে আরোহী হিসেবে আমার মা ছিলেন যেমন চমৎকার, তেমনি ঘোড়াদের সম্পর্কে ওঁর অভিজ্ঞতাও ছিলো অপরিসীম। তাহলে বার্ক কেন ওঁকে খুন করতে গেলো? কেন মাথার খুলিটা গুঁড়িয়ে ওঁকে নদীতে ফেলে দিতে গেলো? ওঁকে খুন করতে গিয়ে বার্কের এই ধরনের প্রবণতাই বা কাজ করলো কেন?

'এই যুদ্ধে আবু মহম্মদই জয়ী হলো, হেরে গেলেন আমার হতভাগ্য বাবা। সেই সঙ্গে হারিয়ে গেলো ওঁর যৌবন। এখন এই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধকে চালিয়ে যেতে হচ্ছে অন্য আর এক যুদ্ধ—এবার আমার সঙ্গে। আমাদের দুজনের মধ্যে কে জয়ী হবে?'

সামান্য একটু এগিয়ে গিয়ে সে আবার থমকে গেলো। দুর্বিসহ একটা ভাবনা তার মাথার মধ্যে কেবলই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে।

'নিতান্তই স্বেচ্ছায় আমি কৌতূহলী, প্রগল্‌ভ বন্ধুটিকে অস্ত্রোপচারের অনুমতি দিয়েছিলাম, যেহেতু মুমূর্ষু রোগীটির অসমীচীন উক্তিতে আমি সত্যিই মর্মাহত হয়েছিলাম। কিন্তু কর্তব্যের প্রতি অবহেলার ফলে ও তো বৃদ্ধকে মেরেও ফেলতে পারতো, কেননা ওর মন তখন পড়েছিলো কাহিনীটার দিকে। যদি তাই হয়, তাহলে ওঁর মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। ক্রোধে উনি যতই উন্মাদ হয়ে উঠুন না কেন, আমি অনায়াসেই ওঁর অস্ত্রোপচারের কাজ সুসম্পন্ন করতে পারতাম। নির্বোধ, এ তুই কি করলি!'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপরেই ছুটতে শুরু

করলো হাসপাতালের দিকে। পুব আকাশে সূর্য তখন সবে উঁকি দিচ্ছে আর শিশির-ভেজা পাথরে তার ত্রস্ত পায়ের শব্দ মনে হচ্ছে ঠিক যেন ধাবন্ত কোনো ঘোড়ার খুরের প্রতিধ্বনি।

অনুবাদ / অসিত সরকার

শ্যামাপাখি

জেমস নগুগি

কেনিয়া তো বটেই, সমগ্র আধুনিক আফ্রিকান সাহিত্যেরও অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক জেমস নগুগি। প্রকৃত নাম নগুগি ওয়া থিওনগো। জন্ম ১৯৩৮ সালে কেনিয়ায়। ১৯৬২ সালে ম্যাকরেরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেন। কিছুদিন 'পেন-পয়েণ্ট' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'উইপ নট, চাইল্ড'। তাঁর অন্য একটি উপন্যাস 'দি রিভার বিটুইন' এবং নাটক 'দি ব্ল্যাক হারমিট'। বিষয়বৈচিত্র্য এবং অনন্য আঙ্গিকের জন্যে তাঁর 'সিক্রিট লিভারস' গল্পগ্রন্থটি নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। বর্তমানে লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপক।

কেউ তাকে ভালো করে জানতো না। এমন কি ওয়ামাইথা, যে নিজেকে তার সব চাইতে প্রিয়জন বলে দাবী করতে পারতো, ও-ও তাকে কোনোদিন বুঝতে পারেনি। সে প্রায় একাই থাকতো। ফলে, কে তাকে সাহায্য করতে যাবে?

তাকে আমার স্পষ্ট মনে আছে। বেশ লম্বা আর বলিষ্ঠ চেহারা। দেখলে মনে হবে, ইচ্ছে করলে সে যেকোনো লোককে অনায়াসেই গুঁড়িয়ে দিতে পারে। বড় বড়, উজ্জ্বল, কালো চোখ। মর্মভেদী সেই চোখের দৃষ্টিতে কখনও কখনও ফুটে উঠতো শিশুর মতো অসহায়, করুণ একটা আর্তি। তখন তার জন্যে হয় তোমার খারাপ লাগতে পারতো, নয়তো ভয় করতো। কখনও কখনও সে যখন দেওয়ালের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকতো, তখন মনে হতো যেন সবকিছু শুষে নিচ্ছে। অলীক কোনো কিছুর অস্তিত্বে সে বিশ্বাস করতো কি না আমি ঠিক জানি না, তবে প্রায়ই স্বপ্নিল একটা ভাবাবেশ থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠে সে চমকে এমন ভাবে চারদিকে তাকাতো মনে হতো এতক্ষণ বুঝি অদ্ভুত একটা দুঃস্বপ্নেরই মধ্যে ছিলো।

তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা স্কুলে। লিমুরুতে মাঙ্গুও ছিলো তখনকার দিনে একমাত্র স্কুল। ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছেলেরা আসতো। সে আসতো স্কুল থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে গাথিগি-ইনি'-র পাহাড়ি অঞ্চল থেকে। বাড়ি পৌছতে গেলে তাকে কয়েকটা পাহাড়, উপত্যকা আর সমতল পেরুতে হতো। স্কুলে আমরা তাকে কুরুমা, অর্থাৎ "কামড়" বলে ডাকতাম। অথচ আশ্চর্য, কেন আমরা তাকে ওই নামে ডাকতাম আজ আর মনে নেই। তার আসল নাম মাঙ্গারা। শুধু লম্বা বা খেলোয়াড়সুলভ চেহারা নয়, তাকে সুপুরুষই বলা যায়। মেয়েরা তাকে পছন্দ

করতো, কিন্তু সে এড়িয়ে যেতো ওদের সঙ্গ, যেমন এড়িয়ে যেতো আর সবাইকে। সব ধরনের খেলাতেই সে ছিলো ওস্তাদ, বিশেষ করে কুস্তিতে। এমন কি উঁচু ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গেও সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতো। কখনও পরাস্ত হলে আবার চেষ্টা করতো, কুড়িবার পরাস্ত হলেও কখনও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতো না। ফুটবলে তার কোনো জুড়ি ছিলো না এবং এ ব্যাপারে সে ছিলো প্রায় সবার গুরু।

প্রথম প্রথম আমি তার প্রতি তেমন আকৃষ্ট ছিলাম না। হয়তো হিংসে করতাম। খেলাধুলো, অন্য কোনো বিষয়ে, এমন কি পড়াশোনাতেও ভালো ছিলাম না। সুতরাং যে ছেলেটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, শিক্ষক ও মেয়েমহলের বিশেষ প্রিয়পাত্র, তার প্রতি কোনো হতভাগ্যের হিংসে হওয়াটা ছিলো খুবই স্বাভাবিক। আমি হয়তো তাকে ঘৃণাই করতাম, ঘৃণা করতাম তার নিস্পৃহতা, বন্ধুত্বকে এড়িয়ে যাবার তার সেই গর্বিত অথচ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিটাকে।

তারপর হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করলাম তার নিঃসঙ্গতা।

কিসে প্রথম আবিষ্কার করেছিলাম আজ আর ঠিক মনে নেই। হয়তো তার চোখ দুটোতেই। একবার স্কুল-সমাবেশে হঠাৎ পেছন ফিরতেই দেখলাম সে এমন ভাবে তাকিয়ে রয়েছে যেন চারপাশে যা কিছু ঘটছে সে-সম্পর্কে সে কত না আগ্রহী। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলাম সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক। অবশ্য সে শুধু মুহূর্তের জন্যে। চোখে চোখ পড়তেই সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো।

আর একদিন স্কুলে আমি বেশ তাড়াতাড়িই পৌঁছেছিলাম। নিজের মনে কবরখানাটার দিকে ঘোরাফেরা করছি, হঠাৎ দেখলাম মাঙ্গারা আগে থেকেই সেখানে চুপচাপ, একা বসে রয়েছে। আমি কোনো কথা বলিনি

তার সঙ্গে আমার সত্যিকারের মুখোমুখি হওয়ার ঘটনাটা তখনও বাকি।

আমাদের স্কুলের নিচের ঘন জঙ্গলটাতে কেউ যায় না। ছেলেদের ধারণা জঙ্গলটা ভূতুড়ে। শোনা কথা, অনেকদিন আগে একটা বউ স্বামীর হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো এবং ওই জঙ্গলটায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই মরে গিয়েছিলো।

একবার কি ভেবে, হয়তো নিঃসঙ্গতারই জন্যে, ওই জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকেছিলাম। মধ্যাহ্নভোজের ছুটিতে ছেলেরা যে যার ঘরে ফিরে গেছে, আমি ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লাম জঙ্গলের ঠিক মাঝখানে বেশ বড় একটা ফাঁকা জায়গায়। দেখলাম মাঙ্গারা সেখানে চুপচাপ বসে রয়েছে। প্রথমে সে চমকে উঠলো, তারপর আমার এই অনধিকার প্রবেশে বিরক্ত হলো। জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে সে তাকালো আমার দিকে। আমিও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম

তার দিকে। দুজনেই সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। আমিই প্রথম নীরবতা ভেঙে জিগেস করলাম:

'এখানে কি করছো?'

সেই মুহূর্তে সে কোনো জবাব দিলো না। ভ্রূ কুঁচকে এমন ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো যেন মনে মনে প্রশ্নটার গুরুত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে। উত্ত্যক্ত হয়ে আমি সবে যখন আবার প্রশ্ন করতে যাবো, দেখলাম সে মুখ খুলছে।

'আমি শ্যামাপাখি খুঁজছি।'

'শ্যামাপাখি?'

'হ্যাঁ।' ফিসফিসিয়ে কথাটা বললেও সে তখনও সোজা তাকিয়ে রয়েছে সামনের দিকে। ঘাড় ঘুরিয়ে আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করলাম। কিছুই দেখতে পেলাম না। রীতিমতো অবাক হলাম। তার আচরণ আমার কাছে খুবই অদ্ভুত মনে হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেলো মাসখানেক আগে সেই সকালটার কথা, যেদিন তার সঙ্গে আমার কবরখানায় দেখা হয়েছিলো।

'সেদিন কবরখানাতেও তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে সেদিনও শ্যামাপাখির জন্যেই হবে।'

আমাকে হাসতে দেখে সেও হাসলো, পরক্ষণেই আবার গম্ভীর হয়ে গেলো। আমার ধারণা এসবই এক ধরনের ছাত্রসুলভ চপলতা।

'পাখিটাকে কি খুঁজে পেয়েছো?'

'না।'

ওটার সম্পর্কে আমি আর কিছু ভাবিইনি। কিন্তু সেদিনের সেই হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো।

স্কুলে আমরা একই সঙ্গে পড়াশোনা করতাম। সে কিন্তু আর কখনও শ্যামা-পাখিটার কথা উল্লেখ করেনি। মাঙ্গারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সে যে অসম্ভব খেটে পড়াশোনা করতো তা কিন্তু নয়, অথচ চূড়ান্ত পরীক্ষায় খুবই ভালো ফল করেছিলো এবং যে অল্প কয়েকজন কলেজে ভর্তি হয়েছিলো সে ছিলো তাদেরই একজন। আমরা দুজন দুদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। লিমুরুর টি অ্যাণ্ড এইচ ট্রেডিং কম্পানীতে আমি একটা চাকরি পেলাম।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের ছাত্র হিসেবেও মাঙ্গারা খুব ভালো ফল করছে। সবাই, এমন কি অধ্যাপকরাও তার সম্পর্কে আশাবাদী।

'কিন্তু তার কি হয়েছে বলো তো?' নাইরোবির একটা কাফেতে বসে চা খেতে

থেকে তারই এক সহপাঠী আমাকে প্রশ্ন করলো।

'কেন?'

'সব সময়েই সে কি যেন একটা ভাবে। সারাক্ষণ এমন অদ্ভুতভাবে নিজেকে গুটিয়ে রাখে…কোনো কিছুর দিকে এমন ভাবে তাকায়, দেখলে মনে হবে…'

কলেজ-জীবনে জিকোরোরো গ্রামের এক স্কুল-শিক্ষিকা, ওয়ামাইথার সঙ্গে তার আলাপ হয়। মেয়েটির প্রতি সে আকৃষ্টও হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে ক্বচিৎ কখনও দেখা হলে সে আমাকে মেয়েটির কথা বলতো। ওকে বিয়ে করার ইচ্ছেও প্রকাশ করতো। ওই কটা বছর নিঃসঙ্গতা যেন তাকে একেবারে রিক্ত করে দিয়েছিলো এবং সাধারণ অর্থে যাকে সুখ বলে তারই একটু কাছাকাছি পৌঁছতে চাইতো। মেয়েটিকে ঘিরে তার সেই সুখের শিশুসুলভ প্রত্যাশার মধ্যে কেমন যেন অদ্ভুত, প্রায় মর্মান্তিক ধরনের একটা রহস্যময়তা লুকিয়ে ছিলো। দু-একবার ওদের দুজনকে আমি একসঙ্গে দেখেছি। বেশ লম্বা, ছিপছিপে চেহারা, নিপুণ হাতে বাঁধা উজ্জ্বল কালো চুলের কবরী। অন্তত ওকে দেখে আমার কেন জানি না একজন আচারনিষ্ঠ মহিলা বলে মনে হয়েছে, এমন কি ওর হাঁটার ছন্দেও ফুটে উঠতো একটা স্নিগ্ধ পবিত্রতা। ভদ্রমহিলা নিঃসন্দেহে রূপসী। তবে ওর সেই রূপ যতটা না বাহ্যিক, তার চাইতে অনেক বেশি যেন সত্তার গহন থেকে উঠে এসে উদ্ভাসিত করে দিতো ওর সর্বাঙ্গ।

চূড়ান্ত পরীক্ষার আগে কলেজ বন্ধের ছুটিতে মাঙ্গারা অপ্রত্যাশিতভাবেই আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হলো। অবিশ্বাসী চোখে আমি তাকালাম তার দিকে। দেখলাম আগের সেই ভূতুড়ে দৃষ্টিটা আবার ফিরে এসেছে। তাকে কেমন যেন বুড়োটে আর অসম্ভব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সুখের চিহ্নটুকুও উধাও। আমার মনে হলো ওয়ামাইথা বুঝি তাকে ছেড়ে গেছে। কিন্তু মনে মনে স্থির করলাম এ সম্পর্কে কিছু জিগেস না করাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

আমাদের বাড়ির ছোট বৈঠকখানাটা আমার খুবই প্রিয়। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা সাধারণত ওখানেই বসে পড়াশোনা গল্প-গুজব করি। সেদিনও রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা দুজনে ছোট টেবিলটা ঘিরে বসে রয়েছি। লণ্ঠনটার মাথায় নির্ঘাত ভূত চেপেছে, নইলে এমন উদ্দীপ্তভাবে জ্বলতে যাবে কেন! আমি একটা বই পড়ছি, কিন্তু আদৌ মনোনিবেশ করতে পারছি না। মাঙ্গারাকে আগের চাইতে আরও বেশি মনমরা লাগছে।

'তুমি, শ্যামাপাখির কোনো ডাক শোনোনি?' তার প্রশ্ন শুনে আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম, মনে পড়ে গেলো স্কুলের দিনগুলোর কথা। স্পষ্ট হয়ে উঠলো

'ভূতুড়ে' জঙ্গলে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের স্মৃতিটা।

'মানে স্কুলে যে পাখিটাকে তুমি খুঁজতে?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যি করে বলো তো, তুমি ঠাট্টা করছো না তো?'

'এর চাইতে আন্তরিকভাবে আমি জীবনে কখনও বলিনি!' কথাটা বলে সে একটু থামলো। আমার ইচ্ছে হলো হো হো করে হেসে উঠি, কিন্তু তার বলার ভঙ্গিতে আমি আর কিছুতেই তা পারলাম না। তারপর, যেন বহুকাল ধরে জমিয়ে রাখা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললো, 'আঃ, সারাটা জীবনই ওটা একটা ভূতুড়ে ছায়ার মতো আমাকে অনুসরণ করেছে!'

আবার একটু থেমে, আমার চোখে চোখ রেখে সে ধীরে ধীরে বলে চললো, 'আমি জানি তুমি নিশ্চয়ই কুসংস্কারে বিশ্বাস করো না। এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের একজন ছাত্র হয়ে আমি যে কুসংস্কারে বিশ্বাস করবো, এমনটা তোমারও আশা করা উচিত নয়। কিন্তু আমি তোমাকে বলতে চাই এটা কুসংস্কার নয়, এটা·· এটা···আচ্ছা, তুমি কখনও অতীত সম্পর্কে ভাবো?'

'উঁহু, তেমন কিছু ভাবি বলে তো মনে হয় না।'

'ধরে নিচ্ছি, ভাবো না। কিন্তু তোমার কি মনে হয়—অতীত তোমার পেছু ধাওয়া করতে পারে, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তোমার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে?'

রীতিমতো বিস্মিত, হয়তো বা আতঙ্কিত হয়েই আমি প্রশ্ন করলাম, 'কেমন করে?'

'ধরো যদি বলি, বহুকাল আগে, তোমার বাবা বা ঠাকুদ্দার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তারই ফল ভোগ করতে হচ্ছে তোমাকে, তুমি কি বিশ্বাস করবে?'

'কিন্তু কি ভাবে?'

'সব ভাবেই।'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছো – পূর্বপুরুষদের পাপ তিন-চার প্রজন্ম ধরে ভোগ করতে হবে তাদের উত্তর-পুরুষদের?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'কক্ষোনো না! এ শুধু অযৌক্তিক নয়, অবাস্তব!'

বুক খালি করে মাঙ্গারা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর অনেকটা স্বগতোক্তির ভঙ্গিতেই বললো, 'আঃ, আমি তোমাকে দোষ দিতে পারি না। এবং এও জানি, ওয়ামাইথাকে বললে ও-ও বিশ্বাস করতো না।'

আমি চমকে উঠলাম। বিষাদমাখা এমন করুণ কণ্ঠস্বর এর আগে কখনও শুনিনি।

'অনেকদিন আগে, আমি তখন বেশ ছোট,' আগের সেই স্বগতোক্তির ভঙ্গিতেই সে বলে চললো, 'সেদিনটা ছিলো রোববার, আমার স্পষ্ট মনে আছে, দূরের এক আত্মীয়, আমরা যাকে 'ঠানদি' বলতাম, তার বাড়ি থেকে ফিরে আসছি নিজের ঘরে। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় পাহাড়ি পথে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ানোর ফলে ঘরে ফিরতে আমার বেশ রাত হয়ে গেলো। দেখলাম মা বসে রয়েছেন, ছোট ভাই দুটি তাপচুল্লির সামনে বিছনায় খেলা করছে। সবাই বেশ হাসি-খুশি। দেখলাম বাবাই শুধু অনুপস্থিত। এমনটা সচরাচর ঘটে না। কেননা বেশি রাত অব্দি উনি কখনই বাইরে থাকেন না। এমন কি মাঝে মাঝে ধর্মীয় সমাবেশে উনি যখন প্রার্থনা পরিচালনা করেন, তখনও ঘরে ফিরতে খুব বেশি রাত করেন না। সুতরাং, আরও খানিকক্ষণ সময় অতিবাহিত হবার পর আমরা সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগলাম।

'আমার খাওয়া সবে শেষ হয়েছে, হঠাৎ দরজা ধাক্কানোর প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলাম। পরক্ষণেই দেখলাম দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ভূতুড়ে ছায়া। ছায়াটা আমার বাবার। চুলগুলো এলোমেলো, চোখ দুটো লাল। কোনো কিছু না বলে উনি একটুখানির জন্যে দরজার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন ঘরের ভেতরের দৃশ্যটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপরেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন ধুলোয় ভরা মেঝেতে।

'আতঙ্কে আমরা সবাই চিৎকার করে উঠলাম, কেননা ভেবেছিলাম উনি বুঝি মারা গ্যাছেন।

'আসলে উনি মারা যাননি। মাথায় ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেবার পর উনি ধীরে ধীরে চোখ মেললেন এবং আমাদের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুবই অবাক হলেন। কিন্তু ওঁকে দেখে মনে হলো কি যেন একটা অজানা আতঙ্কে তখনও থরথর করে কাঁপছেন এবং বিড়বিড় করে কি সব যেন বলছেন, যার মধ্যে থেকে আমি কেবল একটাই মাত্র শব্দ উদ্ধার করতে পেরেছিলাম—"শ্যামাপাখি"। ব্যাস, আর কিচ্ছু নয়! তারপর ধীরে ধীরে উনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

'জীবনে সেই প্রথম আমি শ্যামাপাখি শব্দটা শুনলাম।

'ওই ঘটনার পর বাবা আর খুব অল্প কয়েকদিন বেঁচেছিলেন। তাঁর সেই আকস্মিক মৃত্যু সম্পর্কে নানান কথাই শোনা গিয়েছিলো, কেননা কর্মজীবনে উনি শুধু লব্ধপ্রতিষ্ঠিতই নয়, সততা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্যে অসম্ভব জনপ্রিয়ও ছিলেন।

'সমাধিস্থ করার সময় আমার যে দু ভাই শবানুগমন করেছিলো, তারাও হঠাৎ

একদিন নিউমোনিয়ায় মারা গেলো। রইলাম শুধু আমি আর আমার মা। কিন্তু তাও খুব অল্প কয়েকদিনের জন্যে। জমি-জমা যা ছিলো বিক্রিবাটা করে কিয়াম্বু থেকে আমরা পালিয়ে এলাম গাথিগি-ইনিতে। ওখানে বাস করার সময়েই মা আমাকে প্রথম শ্যামাপাখি প্রসঙ্গে বললেন, অন্তত উনি যতটুকু জানতেন।'

এই পর্যন্ত বলে মাঙ্গারা দম নেবার জন্যে একটু থামলো।

'এই কাহিনীর মূল সূত্র খুঁজে পেতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে মুরাঙ্গায়। ওটাই আমাদের প্রকৃত আবাসভূমি। ওখানে আমাদের অঢেল জমি ছিলো। শ্বেতাঙ্গদের আনা খৃষ্টধর্মে যে কজন তরুণ প্রথম বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছিলেন, আমার ঠাকুদ্দা ছিলেন তাঁদেরই একজন। নতুন ধর্মান্তরিতদের উদ্দীপনা অসীম। ওঁরা বিশ্বাস করতেন প্রতিবেশীদের যাকিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান সবই পাপাচার, ওদের যা কিছু বিশ্বাস সবই কুসংস্কার, সবই অশুভ শয়তানের কারসাজি। আমার ঠাকুদ্দা আর ওঁর সঙ্গীসাথীরা নিজেদের ভাবতেন ঈশ্বরপ্রেরিত সৈনিক, চিরনরক-যন্ত্রণার হাত থেকে হারিয়ে যাওয়া কোনো উপজাতিকে উদ্ধার করাটাকেই যাঁরা প্রধান কাজ বলে মনে করতেন। যেহেতু স্বয়ং যিশু ওঁদের পাশে রয়েছেন, তাই ওঁদের কোনো ক্ষতি হতে পারে না। সুতরাং পাহাড়ি চূড়ায় পবিত্র স্থানগুলোতে ওঁরা নির্দ্বিধায় ঘুরে বেড়াতেন, মুগুমো পাহাড়ের নিচে নগাইকে উৎসর্গ করা মদ, মাংস আর প্রসাদ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। এমনি ভাবে খৃষ্টের সৈনিকরা শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছিলেন।

'কিন্তু সেই সময় মুন্দু মুগো নামে এক বৃদ্ধ আশপাশের গ্রামগুলোতে খুব জনপ্রিয় ছিলেন, যিনি নানা ধরনের জটিল ব্যাধি সারাতে পারতেন। এমন কি শোনা যায় নাকি ভবিষ্যৎও দেখতে পেতেন। ওঁর জাদুবিদ্যা খুবই শক্তিশালী ছিলো, যার সাহায্যে উনি সাধারণ মানুষের প্রভূত উপকার করতেন, বিশেষ করে খরা আর যুদ্ধের সময়ে। একবার আমার ঠাকুদ্দা সেই প্রাজ্ঞ মানুষটির মুখোমুখি হলেন। অসীম উৎসাহে তিনি মুন্দু মুগোর যাকিছু জিনিসপত্র ছিলো সব পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন। তারপর ওঁকে ধর্মান্তরিত করার কাজ শুরু করলেন। বৃদ্ধ প্রথমটায় ঠিক বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু নিজে চোখে সবকিছু দেখার পর ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে ঠাকুদ্দাকে বললেন, এর সমুচিত শাস্তির জন্যে উনি চিরটাকাল বেঁচে থাকবেন। এই বলে বৃদ্ধ সেখান থেকে উধাও হয়ে গেলেন।

'কয়েক বছর বাদে সেই বৃদ্ধ মুন্দু মুগো আবার ফিরে এলেন—একটা শ্যামাপাখি হয়ে। প্রথমে আমার ঠাকুদ্দা মারা গেলেন। তারপর একের পর এক তাঁর সবকটা ছেলে আর স্ত্রীও মারা গেলেন। বেঁচে রইলেন শুধু আমার বাবা। কিন্তু প্রত্যেকেই মারা যাবার আগে বলেছেন যে একটা শ্যামাপাখি ওঁদের সারাক্ষণ অনুসরণ করেছে।

আমার বাবা মুরাঙ্গা থেকে পালিয়ে এলেন কিয়াম্বুতে। কিন্তু শ্যামাপাখিটা সেখানেও তাঁকে অনুসরণ করেছে। বাবা কিভাবে মারা গ্যাছেন, সেকথা তোমাকে আগেই বলেছি।'

এই পর্যন্ত বলে মাঙ্গারা যখন আবার থামলো, আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে কিন্তু আগেরই মতো বিষণ্ন স্বরে বলে চললো, 'গাথিনি-ইনিতে বাস করতে আসার কয়েকদিন পরে মাও মারা গেলেন। উনিও শ্যামাপাখি-টাকে দেখতে পেয়েছিলেন। মার মৃত্যুতে আমি সত্যিই ভীষণ মুষড়ে পড়েছিলাম। একটা কথা আমার কেবলই মনে হতো—আমার বাবা-মা যে অপরাধ কখনও করেননি, তার জন্যে কেন ওঁদের মৃত্যু হলো? কেন? কেন? তখন থেকেই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—যেভাবে হোক, পাখিটাকে খুঁজে বার করবোই। দিন রাত কেবল প্রার্থনা করতাম পাখিটাকে যেন একবার নাগালের মধ্যে পাই। কিন্তু বৃথাই সময় নষ্ট হয়েছে, পাখিটার কোনো চিহ্নও চোখে পড়েনি। তুমি হয়তো ভাবছো এসব সত্যি নয়, কিন্তু বিশ্বাস করো—আমার স্কুল-জীবনের প্রায় সারাটা সময়ই কেটেছে পাখিটার খোঁজে।

'তারপর একদিন কলেজে চলে এলাম। ওখানেই ওয়ামাইথার সঙ্গে আমার আলাপ হলো। পাখিটার কথা একদম ভুলেই গেলাম। তখন আমার মাথায় কেবল একটাই চিন্তা—কেমন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবো, ওকে বিয়ে করবো। আমি এমনই বোকা, নিজেকে ভাবতাম বুঝি কৃতী। আসলে, হয়তো এই ভাবনাটাই আমার বিক্ষুব্ধ মনকে কিছুটা স্বস্তি দিতে পারতো···তাই পাখিটার কথা একদম মনে পড়তো না, আর পড়লেও, গভীর পড়াশোনার মধ্যে নিজেকে এমনভাবে ডুবিয়ে রাখতাম যে ওটাকে আমলই দিতাম না।'

একটু থেমে, হাত দুটোকে মাথার পেছনে রেখে সে চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে বসলো। আমাকেও অতিক্রম করে তাকিয়ে রইলো দূরের দিকে। তারপর হঠাৎই এক সময়ে বললো :

'এখন আমি পাখিটার দেখা পেয়েছি।'

চকিতে লাফিয়ে উঠে আমি আতঙ্কভরা চোখে ঘরের চারদিকে তাকালাম। দেওয়ালে কেঁপে ওঠা অশুভ ছায়াগুলো যেন সজীব হয়ে উঠেছে। লজ্জা পেয়ে আমি আবার তাড়াতাড়ি বসে পড়লাম।

'গত সপ্তাতেই প্রথম আমি ওটাকে দেখতে পেলাম। এখানে আসার আগে, রোববারের এক বিকেলে আমি আর ওয়ামাইথা দুজনে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। সে-দিনের চাইতে সুখী জীবনে আর কখনও মনে হয়নি। ওয়ামাইথা আর আমি যেন

নতুন একটা পৃথিবীর নতুন বাসিন্দা। দুজনে হাসি-ঠাট্টা করছি, পাহাড়ে পাহাড়ে বাচ্চাদের মতো ছুটোছুটি করছি। একটা চূড়ায় দুজনে যখন বসলাম তখন গোধূলি-বেলা। অল্পক্ষণের জন্যে ওয়ামাইথা আমাকে ছেড়ে গেলো। আমি একপাশে কাত হয়ে শুয়ে অলসভাবে তাকিয়ে রয়েছি, হঠাৎ দেখলাম, পাখিটা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে!

'আকস্মিক আবির্ভাবের সেই মুহূর্তটা তোমাকে কিছুতেই বর্ণনা করে বোঝাতে পারবো না। আমি কিছু অনুভব করছিলাম না, এমন কি চেঁচাতেও পারছিলাম না, শুধু অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। এতদিন মনে মনে যাকে পাগলের মতো খুঁজেছি, সেই পাখিটারই দিকে আমি সরাসরি তাকিয়ে রয়েছি, অথচ কিছুই করতে পারছি না। পাখিটা কালো, কুচকুচে কালো…হয়তো সায়াহ্নের জন্যেই ও রকম মনে হচ্ছিলো। কিন্তু…কিন্তু ওর চোখ দুটো বড় বড়, ঠিক মানুষের মতো…আর টকটকে লাল। একটু পরেই ওটা উড়ে গেলো, অথচ আমি নড়তে পারলাম না।'

আতঙ্কিত সেই স্মৃতির আবেগে মাঙ্গারা থরথর করে কেঁপে উঠলো। আমিও আর কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। পাগলের মতো ছুটে গিয়ে দরজায় খিল তুলে দিলাম, অশুভ অন্ধকার থেকে নিজেদের আড়াল রাখার জন্যে জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়ে পরদা টেনে দিলাম। তারপর আবার ফিরে এলাম নিজের আসনে।

'তুমি কি এ সম্পর্কে ওয়ামাইথাকে কিছু বলেছিলে?'

'না। আমি শুধু ওকে বলেছিলাম শরীরটা ভালো লাগছে না। আমার অবস্থা দেখে ও ভেবেছিলো বুঝি ঠাণ্ডা লেগেছে। ওকে আর মিছিমিছি এ সবের মধ্যে টেনে এনে কি লাভ? তাছাড়া, আমার কথা ও বিশ্বাসও করতো না। তুমিই যখন…'

আমি দ্রুত প্রতিবাদ করলাম। কিন্তু আমার আচরণে হঠাৎ প্রকাশ পাওয়া দুর্বলতার বিরুদ্ধে নিজের মনের সঙ্গে তখনও আমাকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছিলো, কেননা ইউরোপীয় ধর্ম ও ভাবধারার আদর্শে বিশ্বাসী বিজ্ঞানের কোনো প্রতিভাবান ছাত্র যে এই সব আজেবাজে জিনিসে বিশ্বাস করবে, এটা ভাবাটাই আমার পক্ষে লজ্জাকর।

'আমি জানি তুমি আমার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছো না। অন্য কেউ আমাকে বললে আমিও হয়তো বিশ্বাস করতে পারতাম না…'

পরে, রাত্তিরে শুতে যাবার সময় সে বললো: 'তুমি হয়তো ঠিক জানো না, আমার ঠাকুর্দা, এমন কি মাও মারা যাবার আগে পবিত্র গাছের নিচেটা পরিষ্কার করা বা ওই ধরনের কি যেন একটা বলেছিলেন।'

সে-রাত্তিরে আমি আর কিছুতেই ঘুমোতে পারিনি।

চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্যে মাঙ্গারা আবার কলেজে ফিরে গেছে। অনেক দিন তার কোনো খবর পাইনি। ইতিমধ্যে পদোন্নতি ঘটায় কম্পানী তার গুদামের সমস্ত দায়িত্বভার আমাকে দিয়ে টাঙ্গানিয়াকায় পাঠিয়ে দিলো। এই প্রতিষ্ঠানে আমিই প্রথম আফ্রিকান যাকে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হলো। এর জন্যে নিজের মনে আমার প্রচ্ছন্ন একটা অহংকারও ছিলো।

সামান্য কয়েকদিনের ছুটিতে দেশে ফিরে আসার আগে আমি মাস ছয়েক টাঙ্গানিয়াকায় ছিলাম। ফিরে এসে দেখলাম লিমুরুতে কোথাও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। শুধু নতুন বিপণী-কেন্দ্রের জন্যে বিশাল একটা বাড়ি তৈরির তোড়জোড় চলছে, কিন্তু পুরনো ভারতীয় বাজারটা ঠিক তেমনিই রয়েছে। বাড়ি পৌঁছনোর জন্যে বাজারের সরু একটা গলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি, হঠাৎ ওয়ামাইথার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। ও অনেক বদলে গেছে। শীর্ণ চেহারা, চোখে-মুখে কেমন যেন একটা উদভ্রান্ত ভাব। যে পোশাকটা পরে রয়েছে পরিষ্কার করা হয়নি এক সপ্তাহেরও বেশি। আশ্চর্য, কোথায় গেলো ওর সেই নিষ্পাপ উজ্জ্বলতা? মাঙ্গারাই বা কোথায়?

ওর পলকা হাতে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে জিগেস করলাম, 'কেমন আছো?'

'ভালো।'

'মাঙ্গারা কেমন আছে?'

ওয়ামাইথা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো। আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। মনে হলো আমার প্রশ্নে ও আঘাত পেয়েছে।

'কেন, আপনি কিছু শোনেননি?'

'কি?'

'ও তো মারা গ্যাছে।'

'মা-রা গ্যাছে!'

'পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি। অনেকে বলে সেই জন্যেই নাকি আত্মহত্যা করেছে...কিন্তু, কিন্তু ও আমাকে বিশ্বাস করতে পারলো না কেন? আমি তো তার পরেও ওকে ভালোবাসতে পারতাম...'

হাউ হাউ করে ও কেঁদে উঠলো, যেন মন থেকে মৃত্যুর স্মৃতিটাকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছে না। কি বলে সান্ত্বনা দেবো কিছুই বুঝতে পারছি না। মাঙ্গারার পক্ষে কি ভাবে ফেল করা সম্ভব সেটাও একটা রহস্য।

সপ্তাখানেক পরে, সম্ভবত আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্যে প্রচণ্ড কাশি আর বুকে একটা যন্ত্রণা হওয়ায় ডাক্তার দেখাতে গেলাম। ডাক্তার ওই কলেজেরই একজন

স্নাতক। স্বাভাবিক ভাবেই গল্প করতে করতে মাঙ্গারার মৃত্যু প্রসঙ্গ উঠলো।

'অনেকেই বলছে পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি বলে ও নাকি আত্মহত্যা করেছে। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না। ছাত্র হিসেবে ও ছিলো যেমন অসম্ভব মেধাবী, তেমনি স্বভাবের দিক থেকে ছিলো ভারি অদ্ভুত। পরীক্ষার শেষ বছরটা ও কিন্তু সম্পূর্ণই অবহেলা করেছিলো। দিনের পর দিন কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছিলো, সন্ধ্যার পর গির্জার চারপাশে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতো, যেন দেহে প্রাণ নেই। কিন্তু পরীক্ষার সময় চোখ দুটো এমন আশ্চর্য উজ্জ্বল দেখাতো যেন স্বর্গীয় সুষমা উপলব্ধি করছে। পরীক্ষার ফল বেরুনোর সময় আমি ওর সঙ্গেই ছিলুম। কৃতকার্য হতে পারেনি জেনে ও কিন্তু একটুও আঘাত পায়নি। যেন এমনটা যে ঘটবে ও আগেই জানতো। এর সপ্তাহখানেক বাদে ওকে পবিত্র একটা গাছের নিচে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলো। ওর চোখে-মুখে ছিলো একটা অদ্ভুত প্রশান্তি, যেন কঠিন কোনো কাজ ও সুসম্পন্ন করতে পেরেছে। কখনও কখনও পুনরভ্যুদয়ের সমর্থকদেরই চোখে যেমনটা দেখা যায় ঠিক সেই ধরনের এক পরম তৃপ্তি।'

ঘরে ফিরে আমি সোজা বিছনায় শুতে গেলাম। কিন্তু বহুক্ষণ ধরে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলাম দূরের দিকে, আলোটা নিভিয়ে দেবো, না দেবো না কিছুতেই স্থির করতে পারলাম না।

অনুবাদ / অসিত সরকার

মাধুর্যের মুহূর্তগুলো

ই. আর. ব্রেথওয়েট

জ্যাঁ কেরু এবং ডাথোর্নের পর বৃটিশ গায়নার সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ই. আর. ব্রেথওয়েট। জন্ম ১৯৪০ সালে। এখনও পর্যন্ত নিজস্ব কোনো সংকলন প্রকাশিত হয়েছে কিনা ঠিক জানি না, তবে ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর অজস্র গল্প কবিতা নাটক বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রথম শ্রেণীর কয়েকটি সম্পাদিত সংকলনে তাঁর গল্প স্থান পায়। "নিউ নভেলিস্ট' আন্দোলনের তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় কর্মী।

আমি ওকে কফি-বারের ভেতরে প্রবেশ করতে দেখলাম। চামড়ার সঙ্গে সেঁটে বসা কালো জিনস্, পাতলা জুতো, জমাট-পশমের ভারি কোট। সেই সঙ্গে কাঁধের চারপাশে এলোমেলো ছড়িয়ে থাকা ঘন চুলের গুচ্ছ তেমন আহা মরি মরি গোছের কোনো ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারলো না। ভেতরে ঢুকে ও মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো, দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলো চারদিকে, তারপর সোজা এগিয়ে এলো আমার দিকে। আমি বসেছি যেখানে প্রাণচঞ্চল, তর্কে বিভোর একদল ছাত্র, যারা সফেন এক পেয়ালা মদিরা নিয়ে দু-তিন ঘণ্টা অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়ার রহস্য আবিষ্কার করতে পেরেছে, তাদের থেকে বেশ খানিকটা তফাতে। ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আরও অনেক আসনই খালি রয়েছে এবং আমার ধারণা ছিলো মেয়েটি আমার থেকে যতটা সম্ভব দূরেই বসবে, কিন্তু নির্দ্বিধায় ও সোজা এগিয়ে এলো আমার টেবিলের দিকে, বসলো ঠিক মুখোমুখি আসনটাতে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জমাট-পশমী কোটের বোতাম খুলতে শুরু করলো। লম্বাটে ধরনের ম্লান মুখের তুলনায় ওর দীর্ঘ পল্লব ঘেরা ধূসর চোখ দুটো বেশ বড় বড়ই।

'আপনি কি আমাকে এক পেয়ালা কফি কিনে দিতে পারেন?' কিছুটা চাপা স্বরে, অথচ ও এমন স্পষ্টভাবে প্রতিটা শব্দ উচ্চারণ করলো যেন আগে থেকেই মনে মনে মহড়া দেওয়া ছিলো। এমন সরাসরি অনুরোধে আমি কিছুটা অবাক হয়েই মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম, তারপর ইশারায় পরিবেশিকাকে ডেকে দু পেয়ালা কফি দিতে বললাম।

'আমি একটা সিগারেট পেতে পারি?'

আমার জবাব বা সংকেতের অপেক্ষা না রেখেই ও টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিলো এবং প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বেছে দু ঠোঁটের মাঝে

রাখলো। আমি তাড়াতাড়ি দেশলাই জেলে কাঠিটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম।

'আমি আপনাকে খুব অস্বস্তির মধ্যে ফেললাম তো?'

'না না, অস্বস্তি নয়; আসলে আমি এ সবে ঠিক অভ্যস্ত নই।'

'আমার জন্যে কফি কিনতে হলো বলে কিছু মনে করেছেন?'

'না না, বরং খুশিই হয়েছি।' আমরা কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কিনা দেখার জন্যে আমি চারপাশে তাকালাম। মেয়েদের আমার ভালোই লাগে, অন্তত যাদের সান্নিধ্যে নিজেকে একটু ছিমছাম দেখায়।

'আমার ধারণা নিশ্চয়ই আপনাকে বিব্রত করছি।' মেয়েটি চকিতে হাসলো, তীক্ষ্ণ অথচ কাটা-কাটা; কিন্তু চোখ বা মুখের অভিব্যক্তিতে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটলো না। 'শুধু একটুখানির জন্যে। আমার মনে হয় খুব অল্পক্ষণের জন্যে এটুকু কষ্ট আপনি হয়তো সহ্য করতে পারবেন।'

দু ঠোঁটের বৃত্ত দিয়ে খুব ধীরে ধীরে ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঠেলে দিয়ে পরক্ষণেই আবার তা গভীরভাবে টেনে নেওয়ার মধ্যে ওর একটা বিশেষত্ব আছে। মাঝে মাঝেই চিবুকটা একটু উঁচু করে ধোঁয়ার হালকা বর্শাটাকে ছুঁড়ে দিচ্ছে আমার মাথার ওপর দিয়ে। আমাদের কফি এলো। মেয়েটি চার চামচে বাদামী চিনি ঢেলে নিলো নিজের পেয়ালায়। আমি লক্ষ্য করলাম ওর হাত আর হাতের দীর্ঘ আঙুলগুলো। দেখলাম তর্জনী ও মধ্যমার মাঝে তামাকের গাঢ় ছোপ।

'আপনার নাম কি?' সরাসরিই ও প্রশ্ন করলো।

আমি মুখ তুললাম। ওর চোখ দুটো স্থির হয়ে রয়েছে আমার দিকে। গভীর অতল পর্যন্ত ও দুটো যেন ঝকঝক করছে। এতক্ষণ পর্যন্ত আর যে ধারণাই হোক না কেন, আমার এই অগোছালো ভাবটা ওর চোখে পড়েনি।

'থয়েট। রিচার্ড থয়েট।'

খুবই সংক্ষেপে ও আমার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলো।

'ব্যাপারটা সত্যিই ভারি মজার, অন্তত আমি যতজনকে জানি, সব নিগ্রোদেরই নাম প্রায় এক—হয় স্মিথ, নয়তো রজার্স। অথচ আমার কক্ষসঙ্গী, একজন ইংরেজ শ্বেতাঙ্গিনী, ওর নাম কি জানেন? জুংসি!'

'আর আপনার নাম?'

আমার প্রশ্নের জবাব দেবার আগে ও কি যেন ভাবলো। 'কিচ্ছু না।' কেমন যেন ম্লান হয়ে উঠলো ওর চোখের দৃষ্টি। 'আপনি কি করেন?'

'লিখি।'

'মানে?'

'বই, প্রবন্ধ, চিত্রনাট্য, এইসব আর কি।'

'না, আমি জিগেস করছিলাম, আপনার পেশাটা কি?'

আমি অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকালাম।

'এই যে বললাম, লিখি। আমি একজন লেখক এবং নিগ্রো।'

'এটা কি বিশেষ অর্থবহ কিছু?' আমার থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই ও সিগারেটের টুকরোটা নিভিয়ে দিলো, তারপর অন্য আর একটার জন্যে প্যাকেটের দিকে হাত বাড়ালো। আমি ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দিলাম। 'আপনি যে নিগ্রো সেটা আগেই দেখেছি। গায়ের রঙে আমার কিছুই এসে যায় না।'

সম্ভবত কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের জন্যেই আমি মনে মনে মেয়েটির ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। তবু মনের ভাব গোপন রেখেই জিগেস করলাম, 'আপনি কি করেন?'

আগের মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলী নিয়ে খেলতে খেলতে ও জবাব দিলো, 'গান গাই আর শিল্পীদের মডেল হিসেবে কাজ করি।'

'কি ধরনের গান?' আমি আর মডেলিং-এর কথা কিছু জিগেস করলাম না। কেননা কয়েক শিলিং-এর বিনিময়ে উদীয়মান তরুণ শিল্পীদের জন্যে ওর বিভিন্ন ধরনের ভঙ্গি কল্পনা করে নিতে আমার কোনো অসুবিধে হলো না।

'ব্লুস্!' অস্ফুটে উচ্চারণ করা শব্দটা যেন আমাদের দুজনের মাঝখানে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে রইলো, তারপর ও আবার ধীরে ধীরে বলতে লাগলো, 'নিগ্রো লোকসংগীতই আমার একমাত্র সাধনা, যাকে আমি সব সময় বুকের মধ্যে অনুভব করি। আপনি গাইতে পারেন?'

আমি বললাম, 'না, তবে নিগ্রো লোকসংগীত আমার খুব ভালো লাগে।'

মেয়েটি জোরে জোরে সিগারেটে কয়েকবার টান দিলো, ধোঁয়ার কোমল আবর্তের মধ্যে দিয়ে তির্যক দৃষ্টি হানলো আমার দিকে, তারপর অন্য হাতে কফির শূন্য পেয়ালাটা তুলে ধরে তলানির দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

'আর একটু কফি নেবেন?'

মেয়েটি সম্মতি জানালো। আমি আরও দু পেয়ালা কফির ফরমাস দিলাম।

'কতদিন ধরে আপনি লিখছেন?' ও প্রশ্ন করলো।

'প্রায় দু বছর। তার আগে অবশ্য শিক্ষকতা করতাম।'

'ওঁরা, মানে আমার বাবা-মা চাইতেন আমি ভদ্রগোছের একটা কিছু করি। প্রথমে ছবি আঁকার স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, কিন্তু গান-বাজনার রেকর্ডের পেছনেই আমার প্রায় সবটা সময় কেটে যেতো। তারপর একদিন ওঁদের সঙ্গে ঝগড়া করে

বাড়ি থেকে চলে এলাম।'

আমাদের দুজনের মাঝে যে নৈঃশব্দ্য, তাকে ও ধোঁয়ায় ধোঁয়ার ভরিয়ে তুললো আর সেই ধোঁয়ার মধ্যে আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম ওর চোখে জল, যা স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই চিবুক বেয়ে টুপটাপ ঝরে পড়ছে জমাট-পশমী কোটটায়, অথচ কান্নার কোথাও কোনো শব্দ নেই। তারপর টেবিলের ওপর মাথা রেখে কান দুটোকে ও এমনভাবে চেপে ধরলো যেন এ পৃথিবী থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে।

'আমি কি কোনো সাহায্য করতে পারি?'

'না।' ওর কণ্ঠস্বরে দূরত্বের একটা আভাস থাকলেও, কোথাও কোনো জড়তা ছিলো না। 'অনুগ্রহ করে আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি ওঁদের সাহায্য করতে পারিনি বটে, কিন্তু ওঁরাও আর নতুন করে কোনো আঘাত পাননি।'

কোটের বুকপকেট থেকে রুমালটা বার করে আমি ওকে দিলাম। স্বাভাবিক-ভাবেই ও যখন মুখ মুছছে, আমি কফি-বারের চারদিকে একবার চোখ বোলালাম। সবাই আমাদের লক্ষ্য করছে দেখে খুবই অস্বস্তি বোধ করলাম, আপ্রাণ চেষ্টা করলাম ওদের সেই উৎসুক দৃষ্টিকে এড়িয়ে যাবার।

'আপনার সংগীত-চর্চা কেমন চলছে, বেশ ভালো?'

'না।' মেয়েটি মাথা নাড়তেই ছড়িয়ে পড়া চুলে ওর মুখের অর্ধেকটা ঢেকে গেলো। 'ওটা আমার ভেতরেই রয়ে গ্যাছে, বাইরে বেরিয়ে আসার ঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না। গানের স্কুলে ভর্তিও হয়েছিলাম। খরচ চালাবার জন্যে আমাকে সন্ধ্যে-বেলায় কফি-বারে আর দিনের বেলায় মডেলিং-এর কাজ করতে হতো। কিন্তু ওরা আমার কাছে ভঙ্গির চাইতে আরও বেশি কিছু চাইতো, তাই আমি আবার ঘরে ফিরে গেলাম।' মেয়েটি নাক ঝাড়লো, রুমালটাকে দলে-মুচড়ে রেখে দিলো কোটের পকেটে, তারপর প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বার করলো। কিন্তু সেটাকে ঠোঁটে না রেখে, নখ দিয়ে সন্তর্পণে ছিঁড়তে লাগলো, কাগজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তামাকের গুঁড়োগুলো ঝরে পড়তে লাগলো ধীরে ধীরে। কোটের মধ্যে ওর কাঁধ দুটো এমনভাবে অবনমিত হয়ে রয়েছে, যেন অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠছে।

'ওঁরা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। মা চাননি, কিন্তু বাপির সঙ্গে একমত না হওয়া ছাড়া ওঁর অন্য কোনো উপায় ছিলো না। মা আমাকে কুড়ি পাউণ্ড দিয়েছিলেন, আমার ধারণা ওঁর যাকিছু জমানো ছিলো সব। বাপি বলেছিলেন আমি ফিরে না এলে উনি খুশি হবেন। তখন বাধ্য হয়েই আমাকে একটা ঘর নিতে হলো। তাছাড়া গান শেখার জন্যেও টাকার প্রয়োজন। তাই মডেল হিসেবে কাজ

করার জন্যে বিজ্ঞাপন দিলাম।'

ঝকঝকে স্বচ্ছ চোখ মেলে ও তাকালো, অশ্রুধারায় কোথাও এতটুকু ম্লান হয়নি ওর সৌন্দর্য।

'আপনি কিছু মনে করছেন ?'

'উঁহু, একটুও না।' সত্যি বলতে কি, আমি বিরক্তি বা বিস্ময়, কিংবা কিছুই বোধ করছিলাম না। শুধু মনে হচ্ছিলো মেয়েটি আমাকে একটুও ভালো করে লক্ষ্য করেনি, কিংবা আমাকে গুরুত্ব দেবার আদৌ কোনো চেষ্টা করেনি। আমার ভূমিকা কেবল শ্রোতার। এবং ক্ষণিকের জন্যে হলেও, এতে যদি ওর কোনো উপকার হয় আমি তাতেই খুশি।

'স্বাভাবিক ভাবেই আমাকে তখন অন্য নাম ব্যবহার করতে হলো এবং লোক-জনও আসতে লাগলো...নানা ধরনের লোক, নানান প্রয়োজনে, তবে ওঁদের অধিকাংশই বয়স্ক। মাঝে মাঝে আমি নিজের মনেই ভাবতাম, 'হা ভগবান, এ যে দেখছি আমার বাবার বয়েসী!' কাজ শেষ হবার পর টাকা মিটিয়ে ওঁরা চলে যেতেন, কিন্তু কেউ কখনও আমাকে ছোঁননি; অন্তত আমি কখনও কাউকে ছোঁয়ার সুযোগ দিইনি। এমনিভাবে গান শেখার খরচটা কোনো রকমে চালিয়ে নিচ্ছিলাম। আমি জানি, এর মধ্যে থেকেই যা হতে চাই একদিন তা আমি হবোই।' বলা থামিয়ে ও চারদিকে একবার তাকালো। ওর সমস্ত অবয়বে ফুটে উঠেছে একটা ক্লান্ত অভিব্যক্তি, যেন নিজেকে সুস্থির রাখার জন্যে ওকে রীতিমতো সংগ্রাম করতে হচ্ছে। আমি যখন সবে মনে মনে ভাবার চেষ্টা করছি কিভাবে সুন্দর একটা কিছু বলে আমাদের এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের গুমোট পরিবেশটাকে হালকা করে দেওয়া যায়, তখনই ও হঠাৎ আমার দিকে ফিরে আবার বলতে শুরু করলো :

'একদিন দূরভাষে কেউ একজন আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে চাইলো। অস্পষ্টভাবেই কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো, কিন্তু আমার কাছে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিলো না। বেশি কিছু কথা হয়নি, শুধু জানতে চাইলো নটার সময় আমি ফাঁকা থাকবো কিনা। যখন বললাম 'হ্যাঁ', অমনি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় ঠিক নটা, দরজার ঘণ্টিটা বেজে উঠলো। দরজা খুলতেই দেখলাম যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন উনি আমার বাবা...'

সিগারেটের টুকরোটা ও সন্তর্পণে গুঁজে দিলো ছাইদানীর মধ্যে। টেবিলের ওপর হাত দুটো পড়ে রয়েছে নিঃসাড়ে। ওর নত চোখের পাতায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শিরা-উপশিরায় সূক্ষ্ম কারুকার্য। মুখের ওপর এসে পড়া দীঘল আঁখি-পল্লবের ঘন ছায়া ওর বিষণ্ণতাকে যেন আরও গাঢ় করে তুলেছে।

'...শুধু এক পলকের জন্যে দুজনের চোখাচুখি হলো, তারপরেই উনি ফিরে গেলেন। আমি শুনতে পেলাম সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে উনি পড়ে গেলেন।'

কান্নায় অবরুদ্ধ হয়ে এলো ওর কণ্ঠস্বর। সান্ত্বনা দেবার জন্যে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা হাত দুটো আমি নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিলাম। চকিতে অস্ফুট আর্তনাদ করে ও হাত ছাড়িয়ে নিলো। দীর্ঘায়ত চোখ দুটোয় ফুটে উঠলো প্রায় আতঙ্কেরই একটা ছায়া।

'না না, দোহাই আপনার, ছোঁবেন না!'

ত্রস্ত হাতটা ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে কফির একটা পেয়ালা হঠাৎ উলটে ঝনঝন শব্দে আছড়ে পড়লো টেবিলের ওপর।

'সত্যিই আমি দুঃখিত...বিশ্বাস করুন, কোনো কিছু ভেবে...' ঘটনার আকস্মিকতায় কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে আমি বললাম।

'আমি জানি, আপনার কোনো দোষ নেই...আসলে কেউ আমাকে ছুঁক এটা আমি ঠিক সহ্য করতে পারি না।'

ও যখন সবে পেয়ালাটা সোজা করে রাখছে, পরিচারিকা দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো ভিজে কম্বল নিয়ে, কফির সরঞ্জাম সব তুলে নিয়ে নিপুণ হাতে টেবিলটা পরিষ্কার করে ফেললো। পরিচারিকা এমন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার সঙ্গিনীর দিকে তাকালো, যেন ওর কাছে কোনো কৈফিয়ত তলব করছে, কিন্তু প্রত্যুত্তরে ও কেবল ম্লান একটু হাসলো। পরিচারিকাটি তখন ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে এমনভাবে আমার দিকে তাকালো, মনে হলো ও বুঝি ধরেই নিয়েছে কোনো ব্যাপারে আমাদের দুজনের মধ্যে মনান্তর ঘটেছে। আমি দেখলাম ফিরে যাবার সময় পরিচারিকাটি ছাত্রদের টেবিলের সামনে নিচু হয়ে কি যেন বলছে, আর ছাত্ররা সবাই আমাদের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে।

আমি যখন আবার আমার সঙ্গিনীর ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলাম, দেখলাম জমাট-পশমী কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এমন অনিমেষে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেন কফির পেয়ালাটাই যে আমাদের দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কটাকে ছিন্ন করে দিয়েছে সে সম্পর্কে ও সচেতন।

আমি জিগেস করলাম, 'তারপর কি হলো?'

অদ্ভুত ভঙ্গিতে ও হাসলো। 'তার পর থেকে আমি আর কাজ করতে পারিনি। কিচ্ছু করতে পারিনি, শুধু ঘরের মধ্যে চুপচাপ বন্দী থেকেছি! দূরভাষের শব্দে সাড়া দিইনি, ঘন্টির শব্দে দরজা খুলিনি। এর পর থেকেই শুরু হলো দুঃস্বপ্ন আর প্রতিটা স্বপ্নেই হানা দিতে লাগলেন উনি।'

'তার মানে ঘটনাটা আপনাকে খুবই মর্মাহত করেছে।'

'হ্যা, তবে এখন ঠিক হয়ে গ্যাছে।'

ধীরে ধীরে ও জমাট-পশমী কোটের বোতাম আঁটতে শুরু করলো।

'এভাবে আমার কথা মন দিয়ে শোনার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।' মৃদুভাষে ও বললো। 'সত্যিই আপনি যে আমার কি ভীষণ উপকার করেছেন ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না। এখন, অন্তত এই মুহূর্তে আমার সত্যিই খুব ভালো লাগছে; অথচ একটু আগেও আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম না···আসলে মাধুর্যের এই মুহূর্তগুলোর আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিলো।'

আচম্বিতে ও উঠে দাঁড়ালো, কুর্সিটাকে আবার সন্তর্পণে রেখে দিলো যথাস্থানে, তারপর কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেলো। ওর মুখে দেখলাম একটা আত্মসমর্পণের ভাব, ঠিক যেমনটা দেখা যায় আকাশে ওড়ার মুহূর্তে বিমানচালকদের মুখে। দরজার মধ্যে দিয়ে, পাশপথের দিকে কাঁচের দেওয়াল-ঘেরা কফি-বার অতিক্রম করে আমি ওকে চলে যেতে দেখলাম।

হঠাৎই আমার নিজেকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হলো, মনে হলো অজস্র উৎসুক চোখ সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমি যেন ওদের চোখে-মুখে পড়তে পারছি কৌতূহলী মনের ভাবনা। ওদের উদগ্রীব দৃষ্টিকে এড়াবার জন্যেই পকেট থেকে একটা পুরনো খাম বার করে তার উলটো পিঠে হিজিবিজি কাটতে লাগলাম। শহরে একটা সংবাদপত্রের সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আগে আধ ঘণ্টা সময় কাটানোর জন্যেই আমি এই কফিখানায় এসেছিলাম। ট্রেন ধরার এখনও মিনিট পনেরো সময় বাকি থাকায় ভাবলাম আর একটুখানি অপেক্ষা করে যাই। তাছাড়া খানিকটা পথ এগিয়ে যাওয়ার জন্যে মেয়েটাকে যথেষ্ট সময় দেওয়া উচিত, যাতে রাস্তায় ওর সঙ্গে আমার দেখা না হয়ে যায়। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন অপ্রত্যাশিত ঘটে গেলো। আমি জানি মেয়েটাকে আমার সাহায্য করা উচিত ছিলো। ও এখন কি করবে কে জানে! আমার মনে হয় নিশ্চয়ই কফি-বারের কাজে ফিরে যাবে। দু-এক পাউণ্ড আমি ওকে দিতে পারতাম, কিন্তু আমার মনে হয় না ও নিতো। কি আর করা যাবে, সবারই নিজের নিজের সমস্যা আছে। আশা করি, ও নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ভাবে নিজেকে সামলে নিতে পারবে।

ইশারায় আমি পরিচারিকাকে ডাকলাম। ইচ্ছে ছিলো আর এক পেয়ালা কফির ফরমাস দেবো, কিন্তু ও বিল নিয়ে এলো। দেখলাম ওর সেই বৈরী ভাবটা এখনও যায়নি। আমার বা আমাদের সম্পর্কে ও মনে মনে কি ধারণা করে নিয়েছে কে জানে! ও হয়তো ভেবেছে মেয়েটি কোনো না কোনো অসুবিধের মধ্যে পড়েছে

এবং তার জন্যে আমিই দায়ী। বিলটা নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় টাকা মিটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

স্টেশনে যাবার সংক্ষিপ্ত পথটায় আমার পূর্ব-পরিচিতার কোনো চিহ্নও চোখে পড়লো না। একদিক থেকে ভালোই হলো, ওর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাক এটা আমার ইচ্ছে নয়।

স্টেশনে ঢোকার মুখে দেখলাম কিছু লোক উত্তেজিতভাবে জটলা করছে। অস্থায়ী লোহার থাম আর শিকলি দিয়ে ঢোকার মুখটাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। একটা থামের গায়ে কালো বোর্ড ঝুলিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে যাত্রীরা যেন বাসেই যাওয়া-আসা করেন, কেননা ট্রেন চলাচল সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

পড়ি কি মরি করে আমি ছুটলাম সবচেয়ে কাছের বাস থামার জায়গায়টার দিকে। এখন বরং খুব কম সময় হাতে থাকার জন্যে দুঃখই হচ্ছে, কেননা হতাশ যাত্রীদের সুদীর্ঘ একটা লাইন পড়েছে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত একটা খালি ট্যাক্সিকে এগিয়ে আসতে দেখে দাঁড় করালাম। দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার সময় সারির মধ্যে থেকেই একজনকে মন্তব্য করতে শুনলাম :

'ওরা তো বললো বেশ সুন্দর দেখতে অল্পবয়সী একটা মেয়ে···গায়ে জমাট-পশমী কোট···সোজা চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে···সত্যিই খুব মর্মান্তিক!'

অনুবাদ / অসিত সরকার

মধ্যাহ্নভোজ

লুই বার্নাদো হনওয়ানা

শুধু মোজাম্বিক নয়, সমগ্র আফ্রিকারও অত্যন্ত শক্তিশালী এবং রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন একজন তরুণ কথাশিল্পী এবং সাংবাদিক লুই বার্নাদো হনওয়ানা। জন্ম ১৯৪৩ সালে, তৎকালীন পর্তুগীজ উপনিবেশ মোজাম্বিকের রাজধানী লরেঙ্কো মার্কুইস, বর্তমানের মাপুটো শহরে। শৈশব কাটে মোয়াম্বায়, যেখানে বাবা ছিলেন সরকারী দফতরের একজন দোভাষী। অর্থনৈতিক দৈন্যতার জন্যেই স্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে বেশিদূর পড়াশোনা করা সম্ভব হয়নি। সাহিত্য এবং সাংবাদিকতাকেই পরবর্তীকালে পেশা হিসেবে বেছে নেন, এবং খুব অল্প বয়েস থেকেই বহু ছোট গল্প ও প্রবন্ধ নানান পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্যে কারা বরণও করেন। 'উই কিল্ড ম্যাঙ্গি ডগ অ্যাণ্ড আদার মোজাম্বিক স্টোরিস' তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন।

কোমর থেকে নোয়ানো শরীর, হাত দুটো মাটির দিকে ঝোলানো অবস্থাতেই বৃদ্ধ মাদালা দুপুর বারোটা বাজার শেষ ঘন্টাধ্বনিটা শুনলো। মাথাটা একটু তুলতেই সে পা দশেক দূরে মঞ্জরিত ফসলের মাঝে সবুজ-সাদা পাজামা পরা ওভারশিয়ার-বাবুটিকে দেখতে পেলো। আর বেশি সোজা হতে সে সাহস পেলো না, কেননা সে ভালো করেই জানে চিৎকার করে হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত কাজ থামানো চলবে না। তাই হাঁটুর ওপর কনুইয়ের ভর রেখে সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো।

রোদের তাপে খালি পিঠটা পুড়ে যাচ্ছে, তবু আর একটুখানি সহ্য করে থাকাটাই ভালো। পায়ের কাছে ঝকমকে পাথরটার ওপর নাকের ডগা থেকে টুপটাপ ঝরে পড়া ঘামের ফোঁটা গুনতে গুনতে তার মনে হলো ওভারশিয়ার সাহেব আজ নির্ঘাত বেজায় চটে আছে। অদূরে পা দুটোর দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখলো ও-দুটো ঠিক একই জায়গায় রয়েছে। তারও ওপারে, মঞ্জরিত ফসলের মাথা ছাপিয়ে, ফিলিমোনের কালো শরীরটা দেখা গেলো। সেও কর্মবিরতির আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে।

পিঠের যন্ত্রণাটা অসহ্য মনে হচ্ছে, বিশেষ করে মধ্যাহ্নভোজের ঘণ্টা পড়ে যাওয়ায় তা আরও খারাপ লাগছে। নিচু অবস্থায় মাথাটাকে বার বার তুলতে হচ্ছে বলে ঘাড়ের পেশীতে টান পড়ছে, তবু আগাছাগুলো ওপড়ানোর জন্যে তাকে হাত বাড়াতে হচ্ছে। আগাছার পাতাগুলো বেশ নরম আর চিকন হলেও গোড়াগুলো রীতি-

মতো শক্ত। যান্ত্রিক অভ্যেসে আঙুল দিয়ে শীর্ণ গোড়াটাকে যুত করে ধরে শরীরটাকে শক্ত করে নেয় সে। যদিও অতটুকু আগাছার শেকড় এত গভীর নয় যে ওপড়াতে কষ্ট হবে, তবু হাঁটুর জোড়েনগুলো যন্ত্রণায় টাটিয়ে ওঠে। ওপড়ানো গাছটাকে নাকের কাছে তুলে ধরতেই সাদা শেকড়ে জড়িয়ে থাকা কালো মাটির উগ্র গন্ধ যেন তাকে সম্পূর্ণ আপ্লুত করে দেয়।

গাছের শেকড়টা ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে লোভীর মতো শ্বাস নিতে নিতেই সে মাটিতে সৃষ্টি হওয়া গর্তটার দিকে তাকায়। দিনটা সত্যিই ভীষণ উত্তপ্ত, নইলে গর্তটা থেকে অন্তত একটু ভাপ বেরুতো।

সকালে, বিশেষ করে ভোরের দিকে, রাতের শিশিরে মাঠ যখন ভিজে থাকে, মাটির ছোট ছোট ঢেলাগুলো থেকে তখন ভাপ বেরোয়, তখন কাজ করাটা তেমন ক্লান্তিকর নয়। কিন্তু সূর্য যখন মাথার ওপরে ওঠে, তখন কেবল শেকড় ওপড়ানো গর্তগুলোর মধ্যে থেকেই যা সামান্য একটু ভাপ বেরোয়। তারপর আর সেটুকুরও কোনো চিহ্ন থাকে না।

আগাছাটা ফেলে দিয়ে সে কান পাতলো, কিন্তু ফসলের দীর্ঘ পল্লবের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের মৃদু মর্মর ছাড়া সে আর কিছুই শুনতে পেলো না।

মাদালা আবার দেহটাকে শক্ত করে পেছন দিকে একটু হেলে গোড়া থেকে আলগা হয়ে আগাছাটা উঠে না আসা পর্যন্ত টান দিলো। এমনিভাবে কষ্ট করে আগাছা-ওপড়াতে তার ঘাড়ের পেশীতে যতটা টান লাগে, হাতের পেশীতে ঠিক ততটা নয়। কেননা মাঝেমধ্যে শেকড়ের সঙ্গে যখন মাটি লেগে থাকে, কেবল তখনই সেটাকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে তাকে হাতের পেশীগুলোকে বাঁকাতে হয়।

মধ্যাহ্নভোজের শেষ ঘণ্টাধ্বনি শোনার পরেও যখন সাতটা আগাছা ওপড়ানো হয়ে গেছে, মাদালা তখন ফসলের শীষগুলোর মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে ভাবলো সে বোধহয় ওভারশিয়ারবাবুর হাঁক শুনতে পায়নি। তাই কান খাড়া করে সে খুব মন দিয়ে শুনলো, কিন্তু ঢেউয়ের চাপা মর্মর ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলো না।

নিচু হয়ে নতুন একটা আগাছার গোড়া শক্ত করে আঁকড়ে ধরতেই ব্যথাটা আবার তীব্র হয়ে উঠলো, তবু সেটাকে সে না উপড়ে ছাড়লো না। শেকড়ের ফাঁক দিয়ে একটা কাঁকড়াবিছে বেরিয়ে এলো, কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়ানোটা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। হাতের কাছে একটা নিড়ানিও নেই যে মারবে, ফলে ওটাকে সে পালাতে দিলো। কামড়ে দিলে তিনদিন অসহ্য যন্ত্রণা হতো, চতুর্থদিনে হয়তো মরেই যেতো—কথাটা ভাবতেই মাদালা কেমন যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। সত্যি, তিনদিন ধরে অমন প্রকাণ্ড আকারের বিছের বিষের যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি

এখন আর তার নেই।

ভোরের প্রথম দিকে আগাছার লতাপাতায় যাও বা দু-একটা গঙ্গাফড়িং এর চঞ্চলতা চোখে পড়ে, কিন্তু দুপুরের এই সময়টাতে বিছে, গিরগিটি, এমনকি সাপেরও দেখা মেলে। এই ক্ষেতেই কাজ করতে করতে সেদিন পিটারোসি সাপের কামড় খেয়ে মরে গেলো। পিটারোসিকে অনেকেই চিনতো না, কিন্তু তার বউকে সবাই চিনে ফেললো। বিধবা হবার পর থেকে ও মদের খরচের বিনিময়ে যে কোনো পুরুষের সঙ্গেই শুতে শুরু করেছিলো। প্রথম প্রথম বলতো পাঁচ শিলিং-এর কমে কারুর সঙ্গে শোবে না, কিন্তু এখন কেবল মদের দামেই খুশি। ঠিকে মজুরদের পাল্লায় পড়ে ও এত নেশা করে যে তখন যে কেউ, এমন কি খেত-মজুররা পর্যন্ত ওকে নিয়ে গুদামঘরের পেছনে লম্বা লম্বা ঘাসগুলোর আড়ালে চলে যায়। তবে সবাই জানে ও রকম অবস্থায় ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুম ভাঙে পুরুষটা ওকে ছেড়ে চলে যাবার পর।

একমাত্র মাদালাই যে কখনও ওর সঙ্গে শোয়নি। শুধু যে তার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে তাই নয়, হাজার হলেও পিটারোসিকে সে চিনতো।

আরও গোটা দুয়েক আগাছা উপড়ে মাদালা হাঁটুর ওপর কনুই রেখে অপেক্ষা করতে লাগলো। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে সূর্য যেন আরও নিচে নেমে আসছে। কিন্তু ওভারশিয়ারবাবুর এখন তো আর মধ্যাহ্নভোজের বিরতি ঘোষণা করতে দেরি করা উচিত নয়।

হঠাৎ পেটের নাড়িভুঁড়িতে প্রচণ্ড টান পড়লো। এটাই প্রথমবার। এতক্ষণ সাহেবের হুকুমের প্রতি সতর্ক থাকার ফলে মাদালা ব্যথাটা অনুভব করতে পারেনি, কিন্তু এখন পাকস্থলীর ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠার সঙ্গেসঙ্গে শরীরটাকে শক্ত করে সে চেষ্টা করলো ব্যথাটাকে হালকা করে দিতে। এতে সুতোর গুটির মতো কি যেন একটা গলার মধ্যে দিয়ে নেমে বুকের মাঝামাঝি জায়গায় এসে স্থির হয়ে রইলো, তারপর সেটা আবার দ্রুত পাকস্থলীর মধ্যে সেঁধিয়ে গেলো। কয়েক মুহূর্তের অসহ্য যন্ত্রণায় মনে হলো ঘাড়ের শিরাগুলো বুঝি এখুনি ফেটে পড়বে, শরীরটা কাঁপতে লাগলো থরথর করে। মুঠোর মধ্যে থেঁতলে যাওয়া আগাছার পাতা থেকে উগ্র গন্ধ ছাড়লো। দ্বিতীয়বার মোচড়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো বুক দুটি বুঝি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে, তবু তার চাপা দু ঠোঁটে অস্ফুট কোনো শব্দও শোনা গেলো না।

'ব্যাটা এখনও আমাদের থামতে বলছে না কেন', অন্য একটা আগাছা হাতড়াতে হাতড়াতে মাদালা নিজের মনেই বিড়বিড় করলো, 'মধ্যাহ্নভোজের ঘণ্টা পড়ার পরেও তো ছায়া প্রায় দু বেঘত লম্বা হলো!'

ঝাড়টা তুলতে গিয়ে মাদালা আর কিছুতেই হাঁটুতে জোর পেলো না, এদিকে ঝাড়টাকে ছাড়তেও পারছে না, ফলে সে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো।

ওইভাবে খানিকক্ষণ পড়ে থাকার পর মাদালা নিজেকে একটু সামলে নিলো। ঝুরঝুরে নরম মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে সে ধীরে ধীরে আগাছাটা ওপড়াতে লাগলো।

'তোমাদের তো আবার হাঁটু গেড়ে কাজ করা বারণ!' নিজের মনেই সে আবার বিড়বিড় করলো, ওপড়ানো আগাছাটাকে ছুঁড়ে দিলো স্তূপটার দিকে। ছোট একটা ঝোপ আঁকড়ে ধরেও সেটাকে না উপড়িয়ে, মাটির ওপর জমা করা স্তূপ থেকে সে ওপড়ানো আগাছাগুলো গুনতে লাগলো, 'এক…দুই…তিন…চার…পাঁচ…'

গোনা শেষ করে হাতের কাছের আগাছাকে টেনে তুলে গাদার সঙ্গে রেখে দিলো 'ছয়…'

'তোমার তো হাঁটু মুড়ে বসে কাজ করারই অধিকার নেই!' নিজের মনেই সে ফিসফিসিয়ে বললো, ছ নম্বর গাছের পাতাগুলো পিসতে লাগলো আঙুলের মধ্যে।

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডান কাঁধের ওপর দিয়ে সে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে, চিবুকটাকে চেপে ধরলো দু হাঁটুর মাঝে। কেমন যেন একটা পরিতৃপ্তিতে মনে হলো তার দেহের মধ্যে আর কোনো যন্ত্রণা নেই। তখন সে ছ নম্বর গাছের অবশিষ্ট কয়েকটা পাতা মুখের মধ্যে ফেলে চোখ বুজিয়ে চিবুতে লাগলো।

'ঠিক আছে, এবার সবাই খেতে চলো।'

'সাত! আট! নয়! দশ!'…তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মাদালা ঝটপট চারটে আগাছা উপড়ে ফেললো। কপাল থেকে গড়িয়ে আসা ঘামের ফোঁটায় চোখ জ্বালা করছিলো, তাই আঙুল বুলিয়ে সেগুলো মুছে নিলো।

হুকুম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মাদালা সোজা হয়ে দাঁড়ায়নি, দাঁড়ালে ওভারশিয়ার ব্যাটা ভাবতো কাজ থামাবার জন্যেই সে এতক্ষণ মুখিয়ে ছিলো। ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই তার মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করতে লাগলো। নগুয়েনা আর মুথাকটি ইতিমধ্যেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, ওদের দেখে ওভারশিয়ার খেঁকিয়ে উঠলো, 'ওরে কেলে বেজন্মার দল, কাজ শুরু করার সময় তো দেখি পিঠটুলকুনি ভাব, আর কাজ ছাড়ার সময় তড়িঘড়ি?' এমনিভাবে চললে তোদের ছালচামড়া আমি গুটিয়ে দেবো!'

ফিলিমোন সবে মাথাটা উঁচু করতে যাচ্ছিলো, ওভারশিয়ারবাবুর তর্জন-গর্জন শুনে চকিতে মাথা নিচু করে নিলো, কিন্তু মাদালাকে দেখে তার সাহস আবার ফিরে এলো এবং এক রকম প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভঙ্গিতেই মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো।

ওভারশিয়ারের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখেই একে একে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে এলো

ট্যাগুান, জিমো আর মুথাম্বি। জিমোর শরীরটা ঘামে জবজব করছে, তবু পলিমাটি রঙের চামড়ার নিচে তার পেশীগুলোর অশান্ত নাচন মাদালার চোখে পড়লো।

'নে, সবাই খেতে চল্।' হাতের বইটা সশব্দে মুড়ে ওভারশিয়ার হাঁক পাড়লো। মলাটে ছবিটার দিকে তাকিয়ে সে নিজের মনেই বললো, 'এই বেশ্যা-মাগীগুলোকে ছাড়া কি আর বই লেখা যায় না? যত্ত সব!' সবাই ওভারশিয়ারবাবুকে নীরবে অনুসরণ করলো।

চারদিকে তাকিয়ে, ফসলের চিকন পাতায় রোদের ঝিলিক দেখতে দেখতে মাদালার কেমন যেন বেশ ভালোই লাগলো, তার মনে হলো, 'এই ফসলের ক্ষেত-গুলো ঠিক যেন সমুদ্রের মতো।'

অন্যেরা তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে, মাঠের ঘন সবুজে ঢেকে গেছে ওদের দেহের অর্ধেকটা, দেখে মনে হচ্ছে ওরা যেন স্রোত ঠেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। মাদালা নিশ্চল হয়ে রইলো। মাঠের ঢেউ-খেলানো উপরিতল অনুসরণ করে সে মৃদুভাবে বললো, 'শ্বেতাঙ্গদের এই ফসলের ক্ষেতগুলো ঠিক সমুদ্রের মতো।' ঢেউ অনুসরণ করতে করতে মাদালার দৃষ্টি চলে গেলো অনেক দূরে, যেখানে ঝিকমিক করছে অজস্র রূপালি স্ফুলিঙ্গ, বাতাসে নাড়া খেয়ে ছোট ছোট সূর্যকণাকে মনে হচ্ছে যেন ধূমকেতু। চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় মাদালা আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো।

শস্যক্ষেতের সঙ্গে সমুদ্রের এই তুলনা যে তার সব সময় ভালো লাগে তা নয়, মধ্যাহ্নভোজের ঘণ্টা যখন বাজে কেবল তখনই তার এ রকম মনে হয়। নিজের মনেই আবার ভ্রূকুটি করে সে বললো, 'না না, সমুদ্র কখনও এ রকম নয়, সমুদ্র সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে আগাছা ওপড়াতে হয় না। সেখানকার মাছগুলো যেন হাওয়ার পাখি। একটু থেমে আত্মপ্রত্যয়ের সুরে সে বললো, 'না, সমুদ্রের জাতটাই সম্পূর্ণ অন্য রকম।'

মাদালা তাবুতে ফিরে দেখলো অন্যান্য দলগুলোও ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে। কারো কারো খাওয়াও হয়ে গেছে। আগাছা কুড়োনির দল সব সময় সবার আগে পৌঁছয়, এখন ওরা ছায়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। অধিকাংশ লোকই ঘুমিয়ে দিনের ক্লান্তি পুষিয়ে নিচ্ছে। খামারী দলটার পৌঁছতে নিশ্চয়ই দেরি হবে, কেননা ওদের রাঁধুনী জোসে তখন সবে তার তিনপেয়ে লোহার চুল্লীটায় আগুন ধরাচ্ছে।

মাদালা পুরনো একটা গোলাবাড়ির ছায়ায়, খোঁয়াড়ী দলটার মধ্যে গিয়ে বসলো। তাকে আসতে দেখে ওরা নারীপ্রসঙ্গ পালটে অপেক্ষাকৃত ভদ্রধরনের আলোচনা শুরু করে।

'মাদালা, তোমার দলের কাজকর্ম কেমন চলছে ?' কার যেন নরম গলা শোনা গেলো। মাদালা সেই মুহূর্তে কোনো জবাব দিতে পারলো না, কেননা আগে নিজের মনকে প্রশ্ন করে ভেতর থেকে জবাব পেলে তবেই না অন্যের প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব। মাদালাকে নিশ্চুপ দেখে ছেলেটা অপরাধীর ভঙ্গিতে আবার বললো, 'মাঠের রোদটা আজ বড্ড চড়া।'

কিছু ভেবে না পেয়েই মাদালা বললো, 'হ্যাঁ, বড্ড চড়া।'

যেন কৃতার্থ হয়েই ছেলেটা আলোচনা চালিয়ে যেতে চাইলো, 'তার ওপর ওভারশিয়ার ব্যাটা সারাক্ষণই তোমাদের ঘাড়ে চেপে রয়েছে।'

মাদালা এবার প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকালো, তার তরুণ মুখটার দিকে তাকিয়ে ভাবলো একবার বলে মাঠের কাজে এত উৎসাহ দেখানোটা ভালো নয়। কিন্তু এবারও জবাব খুঁজে পাবার জন্যে তাকে বুকের মধ্যে হাতড়ে বেড়াতে হলো।

'ওভারশিয়ারটা রাম বজ্জাত,' তরুণটি বলে চললো, 'আমি যখন মাঠে কাজ করতুম, লক্ষ্য করেছি, ব্যাটা ইচ্ছে করেই ছুটি দিতে দেরি করে। একটু সোজা হয়ে পিঠটাকে যে টান করবে তাও ব্যাটা দেবে না…' ছেলেটি হঠাৎ দলের অন্যদের দিকে ফিরে সউৎসাহে বলতে লাগলো, 'ভাবো একবার, মাঠে অমন কাঠফাটা রোদ, সবাই একনাগাড়ে কাজ করছে…আর ওভারশিয়ারটা ঠায় সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে…মাইরি বলছি, আমি নিজে চোখে দেখেছি…নইলে কি আর সাধে বলছি ওটা একটা পাজির পা-ঝাড়া!' মাদালাকে ছেড়ে ছেলেটি তখন তার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গেই গল্পে মশগুল।

মাদালা দেখলো অদূরে ছায়ায় একটা বাক্সের ওপর বসে ওভারশিয়ার দুপুরের খাবার খাচ্ছে। টেবিল হিসেবে অন্য একটা বাক্সের ওপর সাজানো রয়েছে থালা-বাসন। পরম তৃপ্তিতে গোগ্রাসে গিলছে আর মাঝে মাঝে গলায় মদ ঢালছে।

মাসের শেষের দিকে মাদালাকে সব সময় সঙ্গীদের সঙ্গে মদ ভাগাভাগি করে খেতে হয়, কিন্তু ওভারশিয়ারবাবুকে কখনও কারুর সঙ্গে মদ ভাগ করে খেতে হয় না। এমনকি দুপুরের খাবারের সঙ্গে স্ত্রীর পাঠানো মদের বোতলটাও সে অধিকাংশ দিন শেষ করতে পারে না।

মদের রঙটা লালচে হলুদ। বোতলের গায়ে গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম। মদটা গলায় ঢালার সময় ওভারশিয়ার চোখের পাতা দুটোকে বুজিয়ে রাখে।

'মাদালা, শুনছো,' জিমোর গলা শোনা গেলো, 'চলো খেতে যাই।'

নানা দলের লোক, চালার ছায়ায় বসে খাচ্ছে, যাদের অনেককেই মাদালা চেনে

না, কিন্তু ওকে সবাই চেনে এবং পাশ দিয়ে যাবার সময় কুশল বিনিময় করছে।

'শোনো মাদালা, ওভারশিয়ারটা ছিলো বলে তখন বলিনি—তোমার মেয়ে মারিয়া এসেছে। ও তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

মারিয়া ততক্ষণে তাদের দিকে এগিয়ে এসেছে। 'এই যে, বাবা!'

'আরে, মারিয়া!'

জিমো মারিয়ার আরো কাছে সরে এলো। 'মারিয়া, তুমি দেখা করতে এসেছো বলে তোমার বাবাকে ডাকতে গিয়েছিলুম। কিন্তু ওভারশিয়ারবাবু খুব কাছেই বসে থাচ্ছিলো, তাই কিছু বলতে পারিনি, এই সবে বললুম।'

'বাড়ির খবর কি, মারিয়া?'

'মাদালা, তোমরা ওই চালার নিচে গিয়ে কথা বলো। যাও মারিয়া, ওখানে রোদ নেই…তোমরা বরং ছায়ায় বসে গল্প করো।'

জিমো মারিয়াকে খুবই পছন্দ করে, কিন্তু মাদালা জানে যেহেতু মেয়েটা অনেকের সঙ্গে শুয়েছে তাই কেউ ওকে বিয়ে করতে চাইবে না।

'বাড়ির সবাই কেমন আছে রে মারিয়া?'

'ভালো, বাবা। আমি শুধু দেখতে এসেছি তুমি কেমন আছো।'

'আমি ভালোই আছি।'

তাঁবুর সবার দৃষ্টি এখন মারিয়ার দিকে। সুতীর ছাপা পোশাকের নিচে ওর লুব্ধ শরীরটাকে সবাই খুঁজছে।

'শুভ মধ্যাহ্ন, মারিয়া!' একটুখানি চাউনির আশায় সবাই ওকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, কিন্তু কারো দিকে না ফিরে নত চোখেই ও সবার শুভেচ্ছা ফিরিয়ে দিচ্ছে।

'শোনো মাদালা, তুমি বরং খেয়ে নাও,' জিমো আবার বললো। 'সত্যিই সময় হয়ে গ্যাছে…নগুয়েনা আর মুথাকাটি আমাদের জন্যে খাবার নিয়ে বসে রয়েছে। তাছাড়া তুমি তোমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলছো এটা ওভারশিয়ারের চোখে না পড়াই ভালো! সময় থাকতে থাকতে খেয়ে নিয়ে…'

'আমি বরং মেয়ের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই, জিমো।'

গোলাবাড়ি পেরিয়ে সিগারেট হাতে ওভারশিয়ারবাবু সোজা ওদের দিকেই এগিয়ে এলো। 'আরে, মারিয়া যে! এখানে কি করছিস? মাদালাকে বঁড়শিতে গাঁথার চেষ্টা করছিস? ওটা তো একটা বুড়ো ভাম। নিশ্চয়ই জিমোকে লটকাবার চেষ্টা করছিস, কি রে তাই না?'

'না, জিমোকে আমি লটকাবার চেষ্টা করছি না,' পর্তুগীজ ভাষায় মারিয়া জবাব

দেবার চেষ্টা করলো।

মজা পাওয়ার ভঙ্গিতে সিগারেটটা ঠোঁটের কাছে না তুলেই ওভারশিয়ার বললো, 'কেন রে, ওর সঙ্গে শোয়াটা পছন্দ নয় বুঝি?'

কোনো জবাব না দিয়ে মারিয়া নত চোখে তাকিয়ে রইলো।

'চলো মাদালা, খেতে যাই। এত খাটাখাটনির পর ঠিক সময়ে না খেলে চলবে কেন?'

সেই মুহূর্তে মাদালা কিছু বলতে পারলো না। সে তখন মেয়ের মুখে ওভারশিয়ারের কথার প্রতিক্রিয়া খোঁজার কাজেই ব্যস্ত ছিলো। মারিয়া কিন্তু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

'আমার মনে হয় তোমার খেতে যাওয়াই উচিত, বাবা,' বুড়ো আঙুল দিয়ে বালি খুঁড়তে খুঁড়তে মারিয়া বললো। কিন্তু মাদালা ওর অপ্রস্তুত ভাবটা টের পেয়ে গেছে দেখে মারিয়া তাড়াতাড়ি পা থামিয়ে হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

মাদালা কাছে এসে দীর্ঘ পল্লবের ছায়ায় ঢাকা মেয়ের চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলো। 'কেন, এ কথাটা তোর মনে হলো কেন?'

'না, মানে, এমনি মনে হলো তাই…'একটু নিশ্চুপ থাকার পর আরও উদ্দীপ্ত স্বরে ও বললো, 'কেন মনে হলো ঠিক জানি না, তবু আমার মনে হয় এখন তোমার খেতে যাওয়াই উচিত।'

মাদালা স্থির চোখে তাকায়। 'সত্যিই তোর তাই মনে হয়?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'আমার খিদে নেই।'

মারিয়া কিছু বললো না।

'আর তুই খাবি না?'

'এখানে আসার আগে আমি ক্যানটিনে খেয়ে নিয়েছি। পাশ দিয়ে যাবার সময় আমাকে দেখতে পেয়ে এক বন্ধু ডাকলো। সে-ই আমার জন্যে খাবার কিনে বললো, 'খেয়ে নে,' আমি খেয়ে নিলুম।'

'ওটুকুতে কারো পেট ভরে নাকি?' এবার মাদালার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো একটা উদ্বিগ্নতা। 'চল্, আমাদের দলের সঙ্গে কিছু খেয়ে নিবি।'

'না বাবা, সত্যিই আর পেটে জায়গা নেই। তুমি বরং খেয়ে এসো, আমি এখানেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'চলো মাদালা, মারিয়া ঠিকই বলেছে।' প্রায় ধমকের সুরে জিমো বললো।

মাদালা এবার রাজি হলো। 'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। তুই বরং ততক্ষণ এখানেই অপেক্ষা কর্।'

মাদালা চলে যাবার পর মারিয়া পরিপূর্ণ চোখ মেলে তাকালো।

বাদাম দিয়ে রাঁধা মাংসের ঝোলে এক টুকরো পরিজ ডুবিয়ে মাদালা মুখে তুললো। সবাই নীরবে খেয়ে চলেছে। চর্বি থাকায় ঝোলের স্বাদটা মন্দ হয়নি। গুদামঘরের আড়ালে কিছু ঢাকা পড়লেও, মাদালা যেখানে খেতে বসেছে সেখান থেকে মেয়েকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। মাটি থেকে চোখ তুলেই ও ওভারশিয়ারের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। ওরা দুজনে কি কথা কইছে শুনতে পাচ্ছে না বলে মাদালার খারাপ লাগছে। পরক্ষণেই আবার নিজের মনকে প্রশ্ন করছে—একটা পুরুষ যখন কোনো মেয়েকে নিয়ে শুতে চায়, তখন তার আর কিইবা বলার থাকতে পারে! প্রশ্ন করলেও তার বুকের ভেতরটা নিঃসাড় হয়ে রয়েছে।

দেখে মনে হচ্ছে ওভারশিয়ার মারিয়ার ওপর বেশ চটে রয়েছে। তবু মাঝে মধ্যে মিষ্টি কথায় ওকে পটাতে চাইছে। এক সময় পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা ধরালো, কাঠিটা নিভিয়ে দিয়ে গলগল করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো। ফেলে না দিয়ে কাঠি সমেত হাতটা নাড়তে নাড়তেই সে কথা বলছে।

সিগারেটটা শেষ করে মারিয়ার দিকে পেছন ফিরে সে গোলাবাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেলো। একটু পরে মারিয়াও ওদিকে গেলো। তখন আর সামান্য কিছু খাবার অবশিষ্ট রয়েছে, কিন্তু মাদালা সুনিশ্চিত যে কারুরই তেমন ভালো করে পেট ভরেনি। পরিজের কয়েকটা টুকরো এবং একটুখানি ঝোল শুধু পড়ে রয়েছে, নগুয়েনা আর দলের রাঁধুনী মুথাকাটির জন্যে।

আঙুল থেকে খাবারের শেষ চিহ্নটুকুও চেটে পুটে নিয়ে মাদালা হাতে হাত ঘষলো, তারপর হাত দুটো মুছে নিলো মাথার চুলে। অন্যরাও তাই করলো।

ক্ষেতের কাজে আবার নিজেদের বিলীন করে দেওয়ার তখনও কিছুটা সময় বাকি রয়েছে, তাই মাদালা এদিক ওদিক তাকিয়ে বিশ্রামের একটা জায়গা খুঁজলো।

আগে যেখানে বসেছিলো, সেই জায়গাটাতে ফিরে এসে মাদালা দেখলো খোঁয়াড়ী দলটা চলে গেছে, কিন্তু তরুণটি তখনও বসে রয়েছে। আশ্লেষ ভরে সে বললো, 'মাদালা, তোমার মেয়ে তো ওই পেছন দিকে গ্যাছে, ওভারশিয়ারবাবুর সঙ্গে কথা বলছে…'

খোঁয়াড়ী-দলের মোড়ল, এলিয়াসের এই ধরনের প্ররোচনা ঠিক পছন্দ হলো না, তাই সরাসরি না হলেও কিছুটা বিরক্তির স্বরেই সে বললো, 'যে যে-বিষয়টা ভালো বোঝে না, সে-সম্পর্কে তার কথা না বলাই ভালো।'

দুর্বিষহ হয়ে ওঠে নৈঃশব্দ্য। মাদালা হাত দিয়ে অনুভব করে বাঁ পায়ের কাছে চারা গাছটাকে, আঙুলে পাতাগুলোকে পাকায়, কোমল কাণ্ডটাকে কব্জির প্যাঁচে জড়িয়ে সুনিশ্চিত ভাবে টান দেয়, ভোঁতা একটা শব্দ করে সেটা মাটি থেকে উপড়ে আসে।

কাছে এসে জিমো বললো, 'মাদালা, কি করলে তোমার ভালো লাগবে আমাকে শুধু একবার বলো।' মাদালা কোনো জবাব দিলো না। জিমোর পাশ দিয়ে যে আলপথটা মাঠের দিকে চলে গেছে, সেই পথ ধরে ওভারশিয়ার এগিয়ে গেলো। তার ঠিক দশ পা পেছন পেছন মারিয়া ওকে অনুসরণ করলো।

মাদালা নীরব চোখে ওদের দিকে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর মাটিতে হাতড়ে হাতড়ে কাল্পনিক গাছটাকে মুঠো করে ধরার চেষ্টা করে।

সবুজ মাঠের মধ্যে দিয়ে মারিয়া এলোমেলো পায়ে হেঁটে যায়, যেন সামনের পুরুষটার সঙ্গে তাল মেলাবার চেষ্টা করে। সবুজ ফসলে ওর হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। স্রোতের বিপরীত মুখে হাঁটতে হচ্ছে বলে ওর গতি কিছুটা মন্থর।

এক সময়ে ওভারশিয়ার ফিরে তাকাতেই মারিয়া থমকে যায়।

'সত্যি, বলো না মাদালা, কি করলে তোমার ভালো লাগবে?'

মাদালা দেখলো মারিয়ার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে ওভারশিয়ার যেন কয়েক পা পেছিয়ে এলো, কিন্তু পরক্ষণেই আবার পালটে সামনের দিকে এগুতে লাগলো। দেখে মনে হচ্ছে ও যেন ঠিক নদী পেরুচ্ছে।

মাদালার মনে হলো জিমোকে কিছু বলা দরকার, কিন্তু নিজের বুকের অতল পর্যন্ত হাতড়েও সে বুঝতে পারলো না কি বলবে।

ওভারশিয়ার মারিয়াকে ইশারা করছে, মারিয়া যেন বুঝতে পারছে না।

মাদালা অন্য একটা চারা গাছ শক্ত করে আঁকড়ে ধরে, কিন্তু কিছুতেই ওপড়াতে পারে না। বরং হাতটাই কেঁপে ওঠে।

পুরুষটা মাঠের সবুজে ডুব দেয়। একটু পরে মারিয়া এমনভাবে হাত দুটো নাড়ে, যেন ফসলের ভঙ্গুর গাছগুলোকে ও আঁকড়ে ধরতে চাইছে। অবশেষে ও-ও হারিয়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্যে সেখানে কাঁপতে থাকে ফসলের শীষগুলো, কিন্তু একসময়ে সে ঢেউও থেমে যায়।

'মাদাল!' তীব্র উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে জিমোর কণ্ঠস্বর, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে আদেশের সুরে বলে, 'ওদিকে তাকিও না!'

মাদালার বুকের মধ্যে কি যেন একটা পাকিয়ে উঠলো, কিন্তু সেটা পুরনো যন্ত্রণা নয়।

মাঠের অপার সবুজে মারিয়া সেই মুহূর্তে ওভারশিয়ারকে দেখতে পায়নি। মাটিতে আছড়ে পড়ার পর ও যখন পা দুটোকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিলো, ঠিক তখুনি সবল একটা হাত জড়িয়ে ধরলো ওর কাঁধ দুটোকে।

পুরুষের তপ্ত নিঃশ্বাস স্পর্শ করলো ওর মুখ। সামান্য একটু ধ্বস্তাধ্বস্তিতে আলগা হয়ে গেলো মারিয়ার সুতির পোশাক। জলের মতো হিমেল একটা অনুভূতি আরও তীব্র হয়ে উঠলো ওর সর্বাঙ্গে, থরথর করে কয়েকবার কেঁপে উঠে আবার তা স্থির হয়ে গেলো। নগ্ন উরুতে মারিয়া অনুভব করলো পুরুষের রুক্ষ উষ্ণ হাতের সোহাগ।

মাদালা চারদিক তাকিয়ে দেখলো। সরাসরি কেউ তার দিকে তাকিয়ে নেই, কিন্তু তাঁবুর ছায়ায় সবাই এমন জায়গা বেছে নিয়েছে যেখান থেকে তাকে স্পষ্ট দেখা যায়। কেবল খোঁয়াড়ী দলের সেই তরুণটির মুখে ফুটে উঠেছে একটা উদ্ধত ভাব।

নিথর নিস্তব্ধতা। জোসের কাশির শব্দেও ভাঙলো না সেই নৈঃশব্দ্য।

সবুজ মাঠের মাঝে সূর্যের আলোয় ওভারশিয়ারের মুখের সাদা চামড়ায় সবুজ রঙের একটা আভা ফোটে। মারিয়ার দু চোখ ভরে দেয় তার কঠিন রিরংসু মুখ-চ্ছবি। তার আগ্নেয় নিঃশ্বাস ভেদ করে মারিয়ার অস্ফুট ঠোঁট। নেশাগ্রস্তের মতো সে ওকে জড়িয়ে ধরে আর ফেনিল সেই উন্মাদনায় মারিয়া নিজেকে আত্মসমর্পণ করে।

অস্পষ্ট একটা উত্তাপ মাটির নিচে থেকে উঠে ধীরে ধীরে মারিয়ার শরীরে প্রবেশ করছে। শোনা যাচ্ছে বুক-ফাটা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস।

হাতে ধরা কাল্পনিক গাছটার ছোট ছোট পাতাগুলোকে মাদালা একের পর এক নিষ্পেষিত করে চলেছে। সে যখন বুঝতে পারলো বুকের মধ্যে দলা পাকিয়ে ওঠা যন্ত্রণাটা তার শরীরের প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এমনভাবে বিবশ করে দিয়েছে যে আগের মতো মাঠ থেকে ছোট্ট একটা চারা গাছ ওপড়ানোরও শক্তি আর অবশিষ্ট নেই, তখন তার বুকের অতল থেকে উঠে এলো একটা চাপা আর্তনাদ।

'কেঁদো না, মাদালা···কেঁদো না···' জিমো সান্ত্বনা দেয়।

প্রথম এগিয়ে আসে কোদালী-দলের নগুয়েনা আর ফিলিমোন। ওদের পেছন পেছন আসে জোসে আর মালেইস, কেননা বর্তমানে কুড়ানী-দলে কাজ করলেও মূলত ওরা মাদালারই দলের লোক। অল্পক্ষণের মধ্যে কোদালী-দলের বাকি সবাই আর অন্যান্য দলের লোকজনেরাও ভিড় করে দাঁড়ায় মাদালাকে ঘিরে।

মাদালা কিন্তু কাল্পনিক সেই গাছের ডালপালাগুলোকে নিয়ে খেলেই যাচ্ছে।

'মারিয়া, তুই এখানে এসেছিলিস কেন?' শোনা গেলো ওভারশিয়ারের নিরস

কণ্ঠস্বর। মানুষটার দেহের ভারে মারিয়ার দম এমনিতেই বন্ধ হয়ে আসছিলো, মন্থর হয়ে উঠছিলো বুকের স্পন্দন। লোকটার কণ্ঠস্বর ওর কানে দূরাগত ঢেউয়ের অস্পষ্ট ধ্বনির মতো এসে পৌছলো।

কোনো রকমে ও জিগেস করলো, 'কেন আপনি এসব করলেন ?'

'উ ?'

'কেন, কেন ?' লোকটাকে ধরে মারিয়া এবার রূঢ়ভাবে ঝাঁকুনি দিলো।

'হুঁ !' অলস ভঙ্গিতে মারিয়ার বুকে হাত রেখে ওভারশিয়ার বললো। 'কেন রে, তোর ভালো লাগেনি বুঝি ?' এক পাশে একটু সরে সে পোশাকটা ঠিক করে নিলো, তারপর মারিয়ার দিকে ফিরে বললো, 'হয়ে গ্যাছে। নে, এবার উঠে পড।'

ফসলের ক্ষেতে আধো আলোছায়ায় মারিয়ার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে।

'এভাবে করাটা ঠিক হয়নি। রাতের বেলা তবু ভালো ছিলো।' হঠাৎ মারিয়ার কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে আতঙ্ক। 'মাদালা যে সব দেখে ফেললো! আপনি বলেছিলেন রাতের বেলায় আমার সম্পর্কে শুধু একটু কথাবার্তা বলতে চান…'

'ঠিক আছে, যা হবার হয়ে গ্যাছে। উঠে পড। আমি তোর পয়সা মিটিয়ে দিচ্ছি।'

মারিয়ার মনে হলো পিঠের নিচের মাটিটা ভীষণ রুক্ষ।

সবুজ সমুদ্রের ওপর ওভারশিয়ারের মাথাটাই প্রথম ভেসে উঠলো। দু হাতে চারা গাছের স্রোত ঠেলে সে তাঁবুতে ফেরার পথ ধরলো।

মারিয়া মাথা তুলতেই সমুদ্রের আবলোপী হাহাকার যেন চারদিক থেকে ওকে ঘিরে ধরলো। ছাপানো সুতীর পোশাক থেকে ধুলো-বালি ঝেড়ে ও-ও ফিরে চললো তাঁবুর দিকে। সামনের মানুষটার মতো ওকেও প্রতি মুহূর্তে দু হাতে ঢেউ ঠেলে এগুতে হচ্ছিলো।

খোঁয়াড়ী দলের লোকজনেরা সরে গিয়ে মারিয়াকে পথ করে দিলো।

ওর নাকে এলো সমুদ্রের ঘ্রাণ।

খোঁয়াড়ী দলের সেই তরুণটির মুখের ভাব চকিতে বদলে গেলো, বিদ্রূপের পরিবর্তে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো ঘৃণা। চতুর্থবারের চেষ্টায় কোনো রকমে সে বললো, 'মাদালা, তুমি যেখানে কাজ করো…রোদ তো ভীষণ চড়া…'

কিছু বলার আগে মাদালাকে ভেবে দেখতে হলো কথাগুলো বলা ঠিক হচ্ছে কিনা : 'সত্যিই, মাঠের রোদ অসম্ভব চড়া।'

তবু নীরবতা ভাঙে না। মারিয়া নত চোখে তাকিয়ে থাকে। তাঁবুর কর্মীরা সবাই স্থাণুর মতো নিশ্চল।

'মাদালা, মাদালা তুমি আমাদের বলো আমরা কি করবো !' শোনা গেলো সেই তরুণের ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর। 'তুমি শুধু একবার বলো, আমরা এই মুহূর্তে সব শেষ করে দিচ্ছি। মারে মারুক, মরণকে আমরা ভয় পাই না।'

শোনা গেলো সমবেত জনতার সম্মতিসূচক গুঞ্জন।

বিক্ষুব্ধ সহকর্মীদের দিকে মাদালা শুধু একবার চোখ তুলে তাকালো।

'মাদালা, আমরা সবাই দেখেছি তোমার চোখের সামনে লোকটা মারিয়াকে নিয়ে কি করলো। তুমি শুধু একটিবার বলো, মাদালা…' তরুণের অনুসন্ধিৎসু চোখ লোভীর মতো মাদালার চোখে বিদ্রোহের চিহ্ন খোঁজে।

মাদালার অন্তরাত্মায় এতটুকু সাড়া জাগে না।

পুরনো একটা গোলাঘরের দিক থেকে এসে ওভারশিয়ার মারিয়ার খোঁজ করে। দেখতে পেয়ে ওর কোলের ওপর ছুঁড়ে দেয় একটা রুপোর মুদ্রা।

'এই নে তোর পাওনা।' আত্মতৃপ্তির প্রচ্ছন্ন হাসিতে বাঁকানো তার দু ঠোঁটে জ্বলন্ত একটা সিগারেট।

কোথায় কে যেন কাশলো। তাড়াতাড়ি পোশাকের আড়াল থেকে হাত দুটো বার করে মারিয়া আড়াআড়ি ভাবে বুকের ওপর রাখলো।

'কি রে মারিয়া, কি হলো ?' ওভারশিয়ারের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়।

মাদালা বিষণ্ণ চোখে মেয়ের দিকে তাকালো।

দেওয়ালের গায়ে দেহের ভার ছেড়ে দিয়ে মারিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো, তারপর নিস্তেজ গলায় ফিসফিসিয়ে বললো, 'কেন আপনি এসব করলেন ?'

কোমরে হাত রেখে ওভারশিয়ার হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলো। 'তোর কি ব্যাপার বল তো শুনি ? পয়সা নিতে চাস না ? নাকি লজ্জা পাচ্ছিস ?' মারিয়ার উত্তরের অপেক্ষায় একটুখানি থেমে সে আবার বলতে শুরু করলো, 'নাকি ছোঁড়াগুলো জানতে পারবে তুই একটা বেশ্যা, সেই জন্যে ভয় পাচ্ছিস ?'

হাত দুটো বুকের ওপর আরও শক্ত করে চেপে মারিয়া অস্ফুটে বললো, 'মাদালা আমাদের দুজনকে দেখে ফেলেছে !'

'তাতে কি হয়েছে ?'

'মাদালা যে আমার বাবা !' ক্ষোভ ঝরা গলায় মারিয়া বললো।

তাঁবুর মানুষগুলো ওভারশিয়ারের মুখখানাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। নৈঃশব্দ্য যেন তার দেহটাকে ফালা ফালা করে দিচ্ছে।

'কি বলিস ?' সহসা রক্ত-চলকে-ওঠা মুখে ওভারশিয়ার কোনো রকমে উচ্চারণ করলো। 'আমি জানতুম না…সত্যিই আমি জানতুম না তুই মাদালার মেয়ে…তুই

বিশ্বাস কর মাদালা, আমি জানতুম না তোর একটা মেয়ে আছে…এমন সুন্দর… আমি, মানে…আমি ওর বন্ধু…'

সারা তাঁবুর নীরবতা বিস্ফোরক এক উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে।

'শোন মাদালা, চাস তো আজ বিকেলটা কাজ থেকে বাদ দে।' নরম গলায় ওভারশিয়ার বললো। 'বরং এখানে বসে মেয়ের সঙ্গে গল্প কর।'

কাল্পনিক গাছটাকে আরও শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে মাদালা বিসন্ন চোখে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

এই নীরবতা ওভারশিয়ারের কাছে দুর্বিষহ মনে হয়। আপসের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ভাঙা ভাঙা গলায় সে কোনো রকমে বলে, 'আচ্ছা তো সব! আমি কেমন করে জানবো, তোরাই বল?'

তাঁবুর মানুষগুলো অনমনীয়, নিশ্চল।

'যত্তসব অপোগণ্ডের দল!' ওভারশিয়ার এবার চাপা স্বরে গর্জে উঠলো। 'শোন মাদালা, তোকে পয়সা দিচ্ছি, মেয়েকে নিয়ে ক্যান্টিন থেকে কিছু খেয়ে আয়।'

মাদালার মাথাটা আর একটু নুয়ে পড়ে শুধু।

বিশ্রী একটা অঙ্গভঙ্গি করে ওভারশিয়ার গোলাঘরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এবার খোঁয়াড়ী-দলের সেই তরুণটির চড়া গলা শোনা গেলো। 'মাদালা, তোমার মেয়েকে নিয়ে পাজীটা কি করেছে আমরা সবাই দেখেছি!

তাঁবুর সবাই তাকে নীরবে সমর্থন জানায়। মারিয়া কান্নায় ভেঙে পড়ে। মাদালা দু হাতের ভাঁজে মুখ গোঁজে।

হাতে মদের একটা বোতল নিয়ে ওভারশিয়ার আবার ফিরে এলো। 'কি রে, তোরা এখনও বসে রয়েছিস!' তাঁবুর দিকে ফিরে সে রুঢ় স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো। 'যা, যা সব কাজে যা। সময় হয়ে গ্যাছে, দেড়টা প্রায় বাজে। কুড়ানী-দল—মালেইস, ইলিয়াস, আব্রেতো…তোরা আগে নদীর ধারের আগাছাগুলো সাফ করে ফ্যাল। খামারী-দল, তোরা বাঁধাকপির পোকা বাছগে যা। খোঁয়াড়ী-দল, তোরা গরু বাছুরগুলোকে জল খাইয়ে আন। কোদালী-দল তোরা সবাই আমার সঙ্গে চল!'

তাঁবুর কেউ কিন্তু এক পাও নড়লো না।

মাদালা যেন হঠাৎ জেগে উঠে সেই কাল্পনিক গাছটার ডালপালায় হাত বুলতে লাগলো।

'কি রে, শুনতে পাচ্ছিস না…ঘণ্টা বাজছে? দুপুরের খাওয়ার ছুটি শেষ!' ঝাঁঝালো গলায় ওভারশিয়ার চেঁচিয়ে উঠলো, তারপর হাতে ধরা বোতলটার দিকে

তাকিয়ে ডাকলো, 'মাদালা !'

মাদালা উঠে দাঁড়ালো।

'কানে শুনতে পাস না বুঝি ? তোদের না যেতে বললুম ! যা শুয়োরের বাচ্চা শীগগির কাজে যা।'

বাড়িয়ে দেওয়া বোতলটা মাদালা হাত পেতে নিলো।

'বেজন্মার দল, শালা শুয়োরের বাচ্চা, শীগগির কাজে যা !'

তাঁবুর সবাই মাদালার দিকে তাকায়। খোঁয়াড়ী-দলের সেই তরুণটি দু-এক পা সামনে এগিয়ে আসে। 'মাদালা !'

অসম্ভব কঠিন দৃষ্টিতে মাদালা তার চারপাশের উদগ্রীব মুখগুলোর দিকে তাকালো, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো বোতলের গায়ে গুঁড়ি গুঁড়ি ঘামে ভরা লালচে-হলুদ পানীয়ের ওপর। একবারে সবটুকু গলায় ঢালতে গিয়ে খানিকটা মদ উপচে পড়লো তার দাড়িতে, তারপর চিবুক বেয়ে নেমে এলো নিচের দিকে। খালি বোতলটা সে ফিরিয়ে দিলো ওভারশিয়ারের হাতে।

ওভারশিয়ার হাঁক ছাড়লো, 'কালা আদমি, ব্যাটা বেজন্মার দল, শীগগির কাজে যা বলছি !'

জনতা সামা- একটু নড়ে উঠলো মাত্র। পরাজিত হলো নৈঃশব্দ্য।

আতঙ্কভরা চোখে মারিয়া সবকিছু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো।

খালি বোতলের মুখটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বেপরোয়াভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে ওভারশিয়ার চাপা গলায় গর্জে উঠলো, 'শালা কেলে, বেজন্মার দল !'

খোঁয়াড়া-দলের সেই তরুণটি মাদালার পায়ে থুতু ছিটিয়ে বললো, 'কুত্তা কাঁহিকা !'

এই অপমান মাদালা গায়ে মাখলো না। পেছন ফিরে সে মাঠের দিকে হাঁটতে লাগলো। নগুয়েনা আর ফিলিমোন তাকে অনুসরণ করলো।

দলের অন্য মজুরদের দিকে ফিরে জিমো বললো, 'চলো যাই।'

'জলদি ! জলদি কর, শালা শুয়োরের বাচ্চা !' ওভারশিয়ার গর্জে উঠলো।

জিমোর পেছন পেছন তাঁবুর লোকেরা সব সার বেঁধে কাজে ফিরে যেতে লাগলো।

ওভারশিয়ার ফের তাড়া লাগালো। 'জলদি ! জলদি কর সব !'

একটা ঘায়েই বোতলটা ভেঙে গেলো, তবু খোঁয়াড়ী-দলের তরুণটা নড়লো না। দ্বিতীয় ঘায়ে মাথার খুলিটা ফেটে চৌচির হয়ে গেলো। হিংস্র ক্রোধে ওভারশিয়ারের বুট থেঁতলে দিলো ওর মুখ। 'শালা খানকির বাচ্চা !'

সামনের দিকে ঝুঁকে মাদালা একটা ঝোপ আঁকড়ে ধরলো। আলতো করে একটু টেনে দেখলো শেকড়টা কত গভীর। তারপর শরীরটাকে পেছন দিকে হেলিয়ে এক হেঁচকা টান দিলো, ঝাড়টা উপড়ে এলো গোড়া থেকে। আগের তোলা আগাছাগুলোর পাশে সেটাকে সযত্নে সাজিয়ে রাখলো। ফসলের গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে সে জিমো. ফিলিমোন, নগুয়েনা, মুথাকাটি, ট্যাগুান, মুথাম্বিকে দেখতে পেলো, এমন কি তাদের সে আলাদা আলাদা করে চিনতেও পারলো। রুক্ষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার কাজে মন দিলো।

অদ্ভুত মাছগুলোর মাথা ছাপিয়ে সবুজ সমুদ্রটা মৃদুল হাওয়ায় দুলছে। ছোট ছোট ঢেউগুলো উঠছে, ভাঙছে, একে অপরকে ধাওয়া করে ছুটে যাচ্ছে, আবার ভাঙছে, শোনা যাচ্ছে গোপন সমুদ্রশঙ্খের ধ্বনি।

অনুবাদ / অসিত সরকার

বজ্রের উত্তপ্ত বিন্দু

রুবেন অ্যালনসো অর্টিজ

কবি এবং সাহিত্যিক হিসেবে রুবেন অ্যালনসো অর্টিজ আর্জেন্টিনায় কতোটা প্রতিষ্ঠিত আমি ঠিক জানি না, কেননা বিচ্ছিন্ন কয়েকটি কবিতা এবং ছোটো গল্প ছাড়া ওঁর সম্পর্কে আর কোনো তথ্যই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে কথাশিল্পী হিসেবে রুবেন অ্যালনসো অর্টিজ যে অত্যন্ত শক্তিশালী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবচেতন মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং আঙ্গিকের অনন্যতায় তাঁর 'বজ্রের উত্তপ্ত বিন্দু' বা 'অগ্নিহুতি'র মতো ছোটো গল্পগুলি নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠতার দাবী রাখে। জন্ম ১৯৩৭ সালে, আর্জেন্টিনায়। এখনও পর্যন্ত নিজস্ব কোনো সংকলন প্রকাশিত না হলেও ইংরেজিতে অনূদিত কয়েকটি গল্প বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর সংকলনে স্থান পেয়েছে।

[মা]

আমার স্বামী আমার সাহচর্য বা এই বাড়ি—কোনোটাই পছন্দ করেন না। তবু পালা গাথিয়াকে নিয়ে উনি চিরদিনের মতো এখান থেকে চলে যাননি, তার কারণ উনি মনে করেন, আগামী দশ বছরে ওঁর বয়েস পঁয়ষট্টি পেরিয়ে যাবে এবং ততোদিনে ওঁর সেরা বাজিটাকে নিয়ে পালাও চিরদিনের মতো ওঁকে ছেড়ে চলে যাবে—ওঁর শেষ কপর্দকটাও সে নিয়ে যাবে এবং তখন আমরাই শুধু একা পড়ে থাকবো। আমি সুনিশ্চিত, তেমন মুহূর্ত একদিন আসবেই এবং তখন ওঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি নৈঃশব্দ্যের প্রয়াসকে আমি চুরমার করে ভেঙে ফেলবো। পালা যে বাড়িতে বাস করে, সেটা কেনার জন্যে উনি আমাদের খামার বাড়ির অর্ধেকটা বিক্রি করে দিয়েছেন। ওঁর পিতামহ মৃত্যুর সময় যে দশ হাজার গবাদি পশু রেখে গিয়েছিলেন, এখন তাদের মধ্যে বড়োজোর হাজার খানেক জীর্ণ শীর্ণ গরু কোনোক্রমে বেঁচেবর্তে আছে—কারণ তাদের ভালোমতো দেখাশুনো বা যত্নআত্তি করার মতো ক্ষমতা কারুর নেই। পুরনো এই বাড়িটা এখনও টিঁকে আছে, কিন্তু একটা বড়োসড়ো ঝড়ের প্রথম আঘাতেই এটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। ফরমোজা শৈলীতে গড়ে ওঠা এই আদ্যিকালের বাড়িটার এখন ফুটিফাটা অবস্থা, বিভিন্ন অংশ খসে খসে পড়ছে। স্বামীর কিছু কিছু ঋণ শোধ করতে করতে আমি এখন ক্লান্ত। এখন আমার মনে হচ্ছে, একজন পিয়ানো-শিক্ষিকা হিসেবে আমার রোজগারের সীমা কোনোদিনই এ সবকিছুর পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে না। তাই মেরামতির ব্যাপারটা এবারে আমি

পুরোপুরি ওঁর ওপরেই ছেড়ে দেবো—একা ওঁর ওপরে। যেদিন ওঁর প্রতি আমার প্রতিশোধ নেওয়া সম্পূর্ণ হবে, সেদিনের জন্যে এবার থেকে আমি আমার প্রতিটি কপর্দক সঞ্চয় করে যাবো।

ভিসেন্ট বলেছিলো, ফরমোজা হচ্ছে বজ্রের উত্তপ্ত কেন্দ্রবিন্দু—পৃথিবীর মধ্যে ওটাই হচ্ছে একমাত্র জায়গা যেখানে কখনও কখনও নদীর বুকে ভেসে চলা চাঁদটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে পারে। যে রাতে ভিসেন্টের দেহ থেকে প্রাণটা বেরিয়ে গেলো সেদিন আমার সবটুকু নিঃসঙ্গতা অভিশম্পাতে মুখর হয়ে উঠেছিলো। সেই মুহূর্তে আমি সূর্যের দিকে মুখ ফেরাবার সমস্ত বাসনা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আজ সকালে আমার স্বামী ভিসেন্টের সমাধিতে যেতে রাজি হলো না। আমার মেয়ে অন্তত একটা ওজর দেখালো, পড়াতে যেতে হবে বলে। ওর যা বয়েস, তাতে আলবার্তোই এখন ওর একমাত্র আশা—বিশেষ করে এই শহরে, যেখানে সুন্দরী মেয়ের সংখ্যা অনেক, কিন্তু অবিবাহিত ছেলে মাত্র কয়েকজন। ও এখন প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে গেছে, আলবার্তোকে বিয়ে না করলে সারাটা জীবন ও কুমারী হয়েই থাকবে। অবিশ্যি আমার কন্যাটির দুশ্চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই—আলবার্তো এখানকার অন্য কাউকে বিয়ে করবে না, তবে ওকেও করবে না। আজ সকালে সমাধিভূমিতে সে আমাকে বলেছে, ভাইয়ের আরোগ্যশালায় কাজ করার জন্যে সে বুয়েনর্স এয়ার্সে ফিরে যাচ্ছে। শুধু সে আর আমিই জানি, তিন বছর আগে ঠিক এমনি এক দিনে নিজের বাবার হাতে খুন হয়েছিলো ভিসেন্ট—এমনি এক দিনে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে এসেছিলো তার মুখ দিয়ে, রুদ্ধ করে দিয়েছিলো তার কণ্ঠস্বর।

নিজের সমস্ত রকম ব্যর্থতার জন্যে আমার মেয়ে ভিসেন্টের ওপরে দোষ চাপাতে ঝলসে ওঠে। ও জানে, যে রাতে আমার স্বামী ভিসেন্টের দেহটাকে গাড়িতে চাপা দিয়েছিলো, সেদিন আলবার্তোর সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া করেছিলো ভিসেন্ট। প্রতিবেশী এক মহিলা আমাকে বলেছেন, ওদের যতোটুকু চিৎকার-চেঁচামেচি তিনি শুনেছেন তাতে ঝগড়াটা রীতিমতো উত্তপ্ত ছিলো বলেই মনে হয়। চিরদিনই আমার ধারণা, আমার ছেলের মৃত্যুর ব্যাপারে আলবার্তোর অনেকটাই দায়িত্ব ছিলো—নয়তো সর্বদাই সে অমন মুষড়ে থাকবে কেন, কেনই বা সে প্রায় পাগলের মতো হয়ে উঠবে? কেন ওই ঘটনার পরে আর কোনোদিন সে বিয়ের কথা উল্লেখও করেনি? সেই রাতে ভিসেন্ট চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এসেছিলো, এমনভাবে ছুটছিলো যেন কেউ তাকে খুন করার জন্যে পেছনে তাড়া করেছে। আমি ভুলিনি, ডক্টর আলবার্তো ইবালা আমার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এক সপ্তাহের জন্যে ফরমোজায়

এসে আর বুয়েনর্স এয়ার্সে ফিরে যায়নি। আমার মেয়ে সর্বদা ভিসেণ্টের নামে মিথ্যে অপবাদ দেয়। তবু মাঝে-মধ্যে আমরা একসঙ্গে বসে আলোচনা করি. আমাদের মাঝখানকার বিভেদের পাঁচিলগুলোকে ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করি।

ভিসেণ্ট যে মোটামুটি নিয়মিতই পার্লা গার্থিয়ার কাছে যায়, তা আমার কাছে গোপন ছিলো না। আমি জানতাম, আমার ছেলে যখনই ইচ্ছে হয়েছে তখনই ওকে উপভোগ করেছে এবং মেয়েটাও তাকে ভালোবাসতো পাগলের মতো। তাই ভিসেণ্ট মারা যাবার পর আমি যতোটা কেঁদেছিলাম পার্লাও ঠিক ততোটাই কেঁদেছিলো, কিংবা হয়তো তার চাইতেও বেশি। তখনই ওকে আমার বাড়ি থেকে দূর করে দেওয়া উচিত ছিলো—কিন্তু আমার ছেলের দেহটার ওপরে ঝুঁকে ও যখন বার বার তাকে চুমু দিচ্ছিলো, তখন নিবিড় হতাশায় আমি ওকে খুব ভালোভাবে চিনতে পারিনি। সেটা ছিলো ওর অসংখ্য অশোভনতার মধ্যে একটা--যা কোনো দিনও ভোলা যায় না।

ওরা অনেক কিছুর জন্যেই আমাকে দোষ দেয়, কিন্তু একমাত্র আমিই সেগুলোকে পরিষ্কার করে দিতে পারি—কারণ আমার ছেলেকে যে চাপা দিয়েছিলো, সে আমার স্বামী। আমি মনে করি, সেই রাতে উনি ইচ্ছে করেই নিজেকে সামলে রাখেননি। কারণ ছেলেকে খুন করে উনি এমন একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিরদিনের মতো সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, যে বয়সে অনেক তরুণ এবং সুদর্শন। তখন ভিসেণ্টকে উনি বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু উনি তা করেননি—কারণ উনি জানতেন, পার্লা গার্থিয়া ওঁর ছেলের ভেতর থেকে কামনার নির্যাসটুকু শুষে নেয়···তার বাসনার রসে নিজের শরীরটাকে নিষিক্ত করে ও চরম তৃপ্তি পায়। তখন গাড়িতে আমি ওঁর পাশে বসেছিলাম এবং আমরা দুজনেই স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম, ভিসেণ্ট কি করছে। আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম, 'থামো!' কিন্তু আমার স্বামী ভিসেণ্টকে হত্যা করার পথটাই বেছে নিয়েছিলেন।

[বাবা]

অন্য যে কোনো লোকের চাইতে ভিসেণ্টকে আমি বেশি ভালোভাবে বুঝতাম। কিন্তু মাঝে মাঝে ওকে কেন যে অমন ভয়ঙ্কর ক্লান্ত, বিবর্ণ আর অবসন্ন দেখাতো, তা আমি কিছুতেই সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারতাম না। মনে হতো, ও যেন কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে যা থেকে থেকেই ওকে মৃত্যুর পরোয়ানা জানিয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ ব্যাপারটাকে ও পুরোপুরি গোপন রাখতে

চাইতো। কিন্তু ও কালো চশমা পরলেই আমি বুঝতে পারতাম, ওর চোখ দুটো রক্তের মতো লাল আর ছলছলে হয়ে রয়েছে—ঠিক মাতালের চোখের মতো। ও যখন ইসাবেল পেনার ভালোবাসা জয় করে নেবার চেষ্টা করছিলো, তখন ওর উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাদের প্রত্যেককেই বন্যার বেগে ভাসিয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু তারপর ও হিংস্রতা নিয়ে আঁকতে শুরু করলো, লিখতে লাগলো উন্মাদের মতো বাক্যরাশিঃ সেই বিধুর-বিষণ্ণতা মৃত পাখিদের মতো বিদ্ধ করে আমাদের···তারা আসে এক অসহনীয় চাপা-উত্তেজনার দেশ থেকে···স্পন্দনময় নিঃসঙ্গ এক অলৌকিক দানব তার হৃৎপিণ্ডটাকে চিবিয়ে খাবে, গিলে ফেলবে তার কঙ্কালটাকে।···আসলে ভিসেণ্টের নির্দোষ প্রেমটি টিকেছিলো তিন মাসেরও কম। তারপর এ বাড়িতে কেউ আর ইসাবেল পেনার নাম উল্লেখ করেনি। কেন যে ওরা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলো, তা কেউই জানে না।

ভিসেণ্ট অহঙ্কারী ছিলো। কিন্তু ওর মা ওর ওপরে কর্তৃত্ব করতো, ওকে নিজের ছায়ায় ঢেকে রাখতো, ওকে অন্ধ করে রেখে ওকে মুখ বুজে থাকতে বাধ্য করতো। শেষ অব্দি ভিসেণ্ট নরকযাত্রা বেছে নিয়েছিলো, কারণ সেটাই ছিলো ওর পক্ষে মায়ের কারাগার থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র পথ। সেদিন আমার গাড়িতে না হলে, ও তার পরের গাড়িতেই চাপা পড়তো। ও নরককে বেছে নিয়েছিলো—ও হতে চেয়েছিলো অন্ধ, মাস্তকবিহীন—ও চেয়েছিলো ওর মুখটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাক।

পালা গাথিয়া দেখতে অনেকটাই ওর মতো। পালাও ভীষণ অল্প-বয়সী, প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনাময় এবং একটু বেপরোয়া। আমি জানতাম, ভিসেণ্ট ওর কাছে যায় এবং এটা মায়ের আরোপিত কঠোর বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে ভিসেণ্টের এক ধরনের বিদ্রোহ। কিন্তু আমার ছেলে যে সর্বদাই ওর সঙ্গে সঠিক ব্যবহার করতো, সে বিষয়েও আমি সুনিশ্চিত ছিলাম। ওদের অভিযোগ, সেদিন রাত্রিশেষে আমি বেপরোয়া হয়ে গাড়ি চালিয়েছিলাম—তার কারণ ভিসেণ্টকে আমি হিংসে করতাম। কিন্তু আমরা এও জানি, এটা আমার স্ত্রীরই একটা বিরাট আবিষ্কার। ভিসেণ্টের আত্মার শান্তি কামনায় আজ গির্জায় ওরা যে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করেছে, তা একটি নিখুঁত সন্ন্যাসিনী হিসেবে ওর নিজেকে উপস্থাপন করার বাসনাকেই পরিতৃপ্ত করবে। গির্জার আশীর্বাদে আমার ছেলের আর কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ রক্ত বা নরকে তার ভয় ছিলো না। নিজের অমরত্বের বিন্যাস সে নিজেই বেছে নিয়েছে।

[বোন]

ভিসেণ্ট আমার হতাশাকেও শ্রদ্ধা করতো না। ওর করুণা, কোমলতা কিংবা উগ্রতা আমি কোনোদিনই সহ্য করতে পারতাম না। ও যে এখানে—এই বাড়িতেই—পালা গাথিয়ার সঙ্গে শুয়েছে, আমাদের শয্যাগুলোকে ব্যবহার করেছে, আমাদের ঘরগুলোকে ওদের শীৎকার আর সীমাহীন ফিসফিসানিতে ভরিয়ে তুলেছে—তা আমি বাবাকে বলে দেবো বলে ও কোনোদিনই ভয় পায়নি। আমাকে ও ভয় দেখাতে চেয়েছিলো ওর পাশবিক প্রাণশক্তি, ওর বুনো শুয়োরের মতো হিংস্রতা দিয়ে। আলবার্তো ভিসেণ্টের আওতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারেনি—এটা আমার জীবনের একটা মস্তোবড়ো অপমান। আমার ভাইটি আমাকে বারবার করে বোঝাতে চাইতো, আমার ভালোবাসার পাত্রটি পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে নোংরা এবং অযোগ্য পুরুষ। কিন্তু ও নিজে যে কি, তা ভিসেণ্টকে বলার মতো ক্ষমতা কারুর ছিলো না। ও ছিলো এক তাল বিষ্ঠা, একটা অধঃপতিত, একটা চরিত্রহীন কালাপাহাড়। স্রেফ বিশিষ্ট হয়ে ওঠার তাগিদে সেই রাতে ও যদি বাবার গাড়ির সামনে ঝাঁপিয়ে না পড়তো, তাহলে হয়তো তিন বছর আগেই আমি আলবার্তোকে বিয়ে করে ফেলতাম। এমন কি বিভিন্ন জনকে পাঠাবো বলে ছাপাখানায় আমরা দুশো আমন্ত্রণলিপির ফরমাশও দিয়েছিলাম। কিন্তু ভিসেণ্ট নিজেকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো এবং করেছিলোও ঠিক তাই। নিজের মাথার ওপর দিয়ে বাবাকে গাড়ি চালাতে বাধ্য করেছিলো ও। আমরা জানতাম, ভিসেণ্ট নিজেই নিজেকে খুন করেছে এবং ও যদি কথা বলতে পারতো—যদি সত্যি কথা বলতো—তাহলে মৃতের শান্তি কামনায় আজ আর আমাদের বিশপের প্রার্থনা সভায় যেতে হতো না। তার কারণ আত্মহত্যা মহাপাপ এবং ভিসেণ্টও তাই বিশপের প্রার্থনার উপযুক্ত নয়। কারুর প্রার্থনা পাবার যোগ্যতাই ওর নেই। কিন্তু 'দুর্ঘটনাটা' ঘটেছিলো তিন বছর আগে এবং আজ সুগম্ভীর ধর্মসম্মত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা তা পালন করতে চলেছি।

ভিসেণ্টকে ভীষণ ভালোবাসতো আলবার্তো। প্রায়ই আমার মনে হতো, ভিসেণ্টের সঙ্গে আরও ঘন ঘন দেখা করার জন্যেই আলবার্তো আমার সঙ্গে প্রেম করে। কিন্তু মাঝে মাঝে ভিসেণ্ট ওর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করতো এবং তাতেই আমি শান্ত হয়ে যেতাম—ফের স্বীকার করে নিতাম, আসলে আমাকেই ও বেশি পছন্দ করে। শেষ অব্দি আমি বুঝতে পেরেছিলাম আলবার্তোকে নিয়ে আমার ভাইটি যা করতে চেয়েছিলো, তাই করেছে এবং এখনও করে চলেছে। সেদিন রাতে আমিও ভিসেণ্টের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছি, আলবার্তোকে শান্তিতে

থাকতে দেবার জন্যে ওর কাছে মিনতি করেছি, চিৎকার করে বলেছি ওর দোষের জন্যেই আমরা বিয়ে করতে পারিনি। ভিসেণ্ট তখন ক্ষিপ্তের মতো বলেছিলো, একটা পুরুষত্বহীন মানুষ একটা যৌনপ্রবৃত্তিহীন মহিলাকে বিয়ে করতে পারে না। তারপর আমাকে ও ঝাঁকুনি দিতে দিতে ছিটকে ফেলে দিয়েছিলো। একমাত্র তখনই আমি প্রমাণ করতে পারতাম, ওর শরীরটা ছিলো তপ্ত লোহার মতো উষ্ণ, আর ওর হাত দুটো বাসনার তীব্র তাগিদে একটা কুত্তিকেও আঁকড়ে ধরতে পারে নিবিড় আশ্লেষে। ওই মুহূর্তগুলোতে আমি যা কিছু অনুভব করেছিলাম, তার জন্যে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। ও যখন আসল কাজটা শুরু করলো, তখন আমি একবারের জন্যেও ওর ঘন রঙের মুখটার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিইনি। ও শেষ বারের মতো আমাকে বিদ্ধ করার আগে আমি আমার হাত দুটোকে পাগলের মতো ওর শরীরের প্রতিটি আনচেকানাচে ছুটিয়ে মেরেছি। তারপর এলো সেই নিদারুণ আলোড়ন। এবং তারপরেই ও ছুটে বেরিয়ে গেলো বাবার গাড়ির মুখোমুখি হতে আর আমি মেঝেতে টানটান হয়ে পড়ে রইলাম ওর উগ্রতার আগুন কিংবা নিবিড় কোমলতায় চিহ্নিত হয়ে। যখন জানলাম ও মরে গেছে, আমার আশা ফের দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো এবং আমি ক্রমাগত ওর মৃত্যু কামনা করতে লাগলাম।

অনুবাদ / দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রমুখ

জাকেরিয়া তামির

আধুনিক সিরিয়ান সাহিত্যের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং তরুণ কথাশিল্পী জাকেরিয়া তামিরের জন্ম ১৯৫২ সালে দামাস্কাসে। শৈশব কাটে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। কৈশোরে কামারের কাজ করেন, পরবর্তীকালে অবশ্য সৌদী আরবীয় দূরদর্শনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। জেদ্দা থেকে দেশে ফিরে আসার পর সাহিত্য ও সাংবাদিকতাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। আঙ্গিকের অনন্যতায় ও মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তামির সত্যিই তুলনা-বিহীন, বিশেষ করে যে সমাজে মেয়েদের ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পূর্ণ পলকা সুতোয় বোনা আর যৌনতা লোহার সিন্দুকে ঠাসা, সেখানে তামির হয়তো কিছুটা দুঃসাহসিকও বটে। তিনটির মধ্যে বেরুট থেকে প্রকাশিত 'সাদা ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি'-ই তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন।

ক্লান্তিকর অথচ নিয়মিত ছন্দে কাঠুরের কুড়ুলটা আঘাত হেনে চলেছে বাড়ির উঠোনে লেবু গাছটার গায়ে। জানলার সামনে বসে সামিয়া গলিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেখান থেকে প্রায় সারাক্ষণই শোনা যাচ্ছে একজন পাগলের আর্তচিৎকার। তার সেই আর্তনাদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে কুড়ুলের ভোঁতা শব্দ। ঘরের ভেতরে ভেসে আসা লেবু গাছের গন্ধে সমস্ত আবহাওয়াটাই কেমন যেন দরজায় দরজায় কাতর মিনতি করে ফেরা কোনো অন্ধভিখারিণীর মতো থমথমে আর দুর্বিষহ হয়ে উঠছে।

গলি থেকে আসা পাগলের চিৎকারটা রূঢ় আর অসংলগ্নভাবে সামিয়ার কানে প্রবেশ করছে, যেন ওর শিরা-উপশিরায় সুপ্ত থাকা রহস্যময় প্রাণীটাকে ডাক দিয়ে ফিরছে ক্রুদ্ধ একটা বন্য পশু। ও দেখতে পাচ্ছে গলির মধ্যে পাগলটা লাফাচ্ছে আর এক দঙ্গল ছোট ছেলে তাকে ঘিরে চেঁচাচ্ছে, তার দিকে কমলার খোসা ছুঁড়ছে। সামিয়ার মনে হলো তার চোখ দুটো ঠিক যেন ঘন জঙ্গলের গভীর ঘাসে অসুস্থ কোনো বাঘের তন্দ্রাচ্ছন্ন দুটো চোখের মতন।

সামিয়ার বাবা খুবই বৃদ্ধ এবং শয্যাশায়ী। লেবু গাছের উগ্র গন্ধে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে উনি স্থির করেছেন ওটাকে কেটে ফেলবেন। সামিয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধ অগ্রাহ্য করেই উনি কাঠুরেকে ডেকে পাঠিয়েছেন। অথচ এই গাছটাই ছিলো সামিয়ার ছেলেবেলার সাথী। শীতের শুরুতে এর লাবণ্য যেন ফেটে পড়তো, কচি পাতা থেকে ঝরে পড়তো মুক্তোর মতো ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। তারপর সবুজে সবুজ হয়ে যেন উজ্জ্বল দীপ্তিতে ফেটে পড়তো।

আবার শোনা গেলো পাগলের আর্তচিৎকার, যেন ওটা পতনোন্মুখ লেবু গাছটারই বোবা কান্না। অজানা একটা আতঙ্ক দানা বাঁধতে থাকে সামিয়ার সর্বাঙ্গে। ওর মনে হয় আকাশ ভরা মিটিমিটি তারাগুলো বুঝি ওর মৃত স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়, কেননা বয়ঃসন্ধিক্ষণে ও ছিলো নিতান্তই সাধারণ একটি কিশোরী, যার স্বামী মাত্র কয়েক মাস আগে ওকে ত্যাগ করেছে। অথচ রান্নাবান্না, ধোয়ামোছা, ঘরকন্নার নানান কাজে ও সুগৃহিণী হয়ে উঠতে পারতো। এমন কি আনন্দে, উচ্ছ্বসিত আবেগে আর কবোষ্ণতায় ও স্বামীর নিবিড় আলিঙ্গনে নিজেকে সঁপেও দিতে পারতো। ওর বয়েস যখন দশ, বাবা একবার ঠাস করে ওর গালে একটা চড় মেরেছিলেন, কেননা উরুর ওপর থেকে ওর পোশাকটা সরে গিয়েছিলো। তারপর ওর বিয়ের আগের দিন রাত্রে বিবাহিত আত্মীয়ারা ওকে শিখিয়ে দিয়েছিলো দেহমিলনের সময় কেমন করে অঙ্গ সঞ্চালন করতে হয়, কেমন করে পুরুষের প্রতি পরিপূর্ণ কামনায় সম্মিলিত ভাবে সাড়া দিতে হয়। অথচ প্রথম রাতে, পুরুষের হাত পাশে শুয়ে থাকা দেহটাকে যখনই স্পর্শ করছে, ভয়ে সিঁটিয়ে উঠছে দেখে ওর স্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলো। পরে একটু একটু করে ও অবশ্য সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো, পুরুষের দেহভারের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলো। তবু লোকটা ওর সঙ্গে ঘর করতে চায়নি, কেননা সে চাইতো পুরুষের সান্নিধ্যে-আসা কোনো নারীর রোমাঞ্চিত শরীর আর চরম পুলকের মুহূর্তগুলোতে সেই নারীর অস্ফুট শীৎকার।

সুতরাং সামিয়াকে ফিরে আসতে হলো বাপের বাড়িতে। প্রায় নিঃসঙ্গই থাকে। ঘরের কাজে মাকে খানিকটা সাহায্য করে আর বাকিটা সময় অলসভাবে জানলার ধারে বসে গলিতে লোকজনের যাওয়া-আসা ছাখে। ফলে প্রায়ই ওর চোখে পড়ে ছেলেদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে পাগলটা হয় চেঁচাচ্ছে, নয়তো লাফাচ্ছে।

কুড়ুলের ধারালো ফলাটা তখনও লেবু গাছটাকে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে, প্রবেশ করছে কাণ্ডের গভীর থেকে আরও গভীরে। কুড়ুলের সেই শব্দে সামিয়ার মনে হচ্ছে একটু একটু করে হারিয়ে ফেলছে ওর শৈশব। অতীতে ও যখন ছোট ছিলো, অকারণে হাসতো আর চাঁদটাকে ভীষণ ভয় পেতো। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত ওটা যে একটা নিটোল বস্তু এই সত্যটা ও কিছুতেই মেনে নিতে পারতো না।

হঠাৎ সুতীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শোনা গেলো। সামিয়া সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো ওটা পাগলের আর্তনাদ। কিন্তু আর্তনাদটা কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের। জানলা দিয়ে ও তাকিয়ে দেখলো পাগলটা ধুলোর মধ্যে বসে দু হাত দিয়ে মাথাটা

চেপে রয়েছে আর আঙুলের ফাঁক দিয়ে দরদর করে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। যে ছেলেরা তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে তারা তখন পালিয়ে গ্যাছে নিরাপদ দূরত্বে।

রহস্যময় একটা আতঙ্ক ওকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেললো। চকিতে জানলার কাছ থেকে সরে এসে সামিয়া বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে রইলো। পাগলের চিৎকারের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে কুড়ুলের শব্দ আর লেবু গাছের গন্ধ। অসহ্য যন্ত্রণায় থর থর করে কেঁপে উঠছে সারা শরীর। ওর মনে হচ্ছে দু হাতে কে যেন গলাটা টিপে ধরেছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে, সাহায্যের জন্যে চিৎকার করতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। দুঃসহ যন্ত্রণায় বিবশ হয়ে ওঠা দেহটা ধীরে ধীরে একসময়ে শান্ত হয়ে এলো। এখন ও আবার সহজ ভাবে নিশ্বাস নিতে পারছে। কিন্তু ঠিক তখুনি সেই রহস্যময় মানুষটাকে ও দেখতে পেলো, রাত্রে যে ওর স্বপ্নের মধ্যে হানা দিতো। মানুষটা বেশ লম্বা, সম্পূর্ণ নগ্ন আর সারা দেহ ঘন কালো লোমে ঢাকা। সামিয়া সব সময়েই লোকটাকে ছুঁতে চাইতো, কিন্তু কিছুতেই নড়তে পারতো না।

লেবু গাছের গায়ে কুড়ুলটা নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হেনে চলেছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেই রহস্যময় লোকটা মুচকি মুচকি হাসছে, ঝিকমিক করছে তার চোখ দুটো। রুঢ় স্বরে সামিয়া বললো, 'চলে যাও, চলে যাও বলছি!'

অবাধ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তার সারা মুখ। তার দাঁতগুলো ঝকঝকে সাদা আর ঠোঁট দুটো জমাটবাঁধা গাঢ় রক্তের মতো। লোকটা যদি এখন কিছু বলে! মরিয়া হয়ে ও শুনতে চাইছিলো লোকটার কণ্ঠস্বর—কিছু বললে নিঃসন্দেহে সেটা হতো দূর পাহাড়ি তটে আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের গর্জনের মতো।

লোকটা যত কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো, সামিয়া ততই পালাবার চেষ্টা করলো, কোনো রকমে আবার বললো, 'চলে যাও, চলে যাও বলছি!'

এতটুকু ভ্রূক্ষেপ না করে লোকটা ক্রমশই ওর দিকে এগিয়ে আসছে, ওর ধাবন্ত বেণীটাকে শক্ত করে ধরেছে মুঠোর মধ্যে। তার ঠোঁট দুটো নড়ছে, কিন্তু কোনো শব্দ হচ্ছে না। অথচ সামিয়ার সুনিশ্চিত ভাবে মনে হচ্ছে লোকটা ওকে বলছে, 'প্রিয়তমা, সোনামাণ আমার!'

তীক্ষ্ণ থেকে আরও সুতীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে পাগলটার আর্তচিৎকার। রহস্যময় লোকটা ওর হাত ধরে ওকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে আর প্রতিরোধবিহীনভাবে সামিয়া তাকে অনুসরণ করছে। প্রত্যাশার মিষ্টি একটা আবেশ ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তার হাতটা ওর ভালোই চেনা। হাতটাকে কোথায় যেন আগে দেখেছে? হাজার চেষ্টা করেও ও কিছুতেই স্মরণ করতে পারলো না। ওরা দুজনে অতিক্রম করে গেলো বিশাল একটা সমতল, যেখানে একসঙ্গে মিশেছে শীতের তুষার, গ্রীষ্মের

সূর্যালোক আর বসন্তের ফুলদল। ওরা এসে পৌছলো জীর্ণ একটা বাড়ির সামনে। সামিয়ার মনে হলো বাড়িটাও ভীষণ চেনা। কোথায় যেন আগে এটাকে দেখেছে! কোথায়? কোথায়? ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে উঠতে লাগলো আঁধার, চকিতে ওর মনে হলো এটা সেই পোড়ো বাড়িটা, যেটা ওর শৈশবের দিনগুলোতে গলিতে ঢোকার ঠিক মুখেই ভুতুড়ে ছায়ামূর্তির মতো গুটিসুটি হয়ে বসে থাকতো।

সামিয়া হঠাৎ লোকটার দিকে তাকালো, দেখলো অনেক বদলে গ্যাছে। এখন সে আর তরুণ নয়, মাঝামাঝি বয়েসের একজন বলিষ্ঠ মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে ও লোকটাকে চিনতে পারলো। একদিন, যখন ওর বারোও পূর্ণ হয়নি, ও ঘরে ফিরে আসছিলো। সন্ধ্যে হয়ে আসায় রাস্তা দিয়ে ছুটতে শুরু করেছিলো। যখন পোড়ো বাড়িটার সামনে এসে পৌছলো, বয়স্ক একজন লোক ওর পথ আটকে দাঁড়ালো। নির্মম ভাবে ওর ছোট্ট হাতটা চেপে ধরে সে রুক্ষ গলায় বললো, 'চেঁচালেই খুন করে ফেলবো!'

তারপর লোকটা ওকে টানতে টানতে দ্রুত ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সমস্ত পোশাক খুলে নিলো। সে সময়ে ওর স্তন দুটো পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি, তবু তা আশ্চর্য মসৃণ আর নিটোল। লোকটার গায়ে নিভে যাওয়া আগুনের মতো গন্ধ। দীর্ঘক্ষণ প্রতীক্ষায় থাকার পর সামিয়া কামনাবিধুর চোখে বয়স্ক লোকটার দিকে তাকালো, ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে তার বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে দেয়। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ও তাকে বলতে শুনলো, 'চেঁচালেই খুন করে ফেলবো!' সামিয়া তাকে বাধা দেবার কোনো রকম চেষ্টাই করেনি। তীব্র কামনার অদ্ভুত একটা অনুভূতি তখন ফেনিয়ে উঠছিলো ওর বুকের অতল থেকে, চুপচাপ শুয়ে ও বয়স্ক লোকটার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো, যার গায়ের গন্ধ নিভে যাওয়া আগুনের মতো।

আবার সেই পাগলটার চিৎকার শোনা গেলো। উপেক্ষা করার জন্যে সামিয়া চোখ কান বুজে বিছনায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকার চেষ্টা করলো, কিন্তু আর্তনাদটা উত্তরোত্তর এমনই বন্য আর মর্মভেদী হয়ে উঠতে লাগলো যে ও আর কিছুতেই সহ্য করতে পারলো না। বিছনা থেকে ছিটকে জানলার কাছে এসে গলিটার দিকে তাকালো, দেখলো পাগলটা তখনও ধুলোর মধ্যে বসে নাপিত আর সব্জী বিক্রেতার সঙ্গে রীতিমতো ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে, কেননা একটুকরো সাদা কাপড় দিয়ে ওরা তার মাথার ক্ষতটা বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করছে আর পাগলটা বন্য পশুর মতো ক্রুদ্ধ গর্জন করছে।

জানলার সামনে থেকে সামিয়া সরে গেলো না। যদিও এই রকম কোনো মুহূর্তে ও ফিরে যেতে পারতো সেই নিভৃত পোড়ো বাড়িটায়, যেখানে সন্ধ্যার উতস নির্জ-

নতাটুকু কাটিয়ে দিতে পারতো বয়স্ক মানুষটার সঙ্গে। কিন্তু তার পরিবর্তে ও তাকালো পাগলটার দিকে, যে তখন মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে হাত-পা ছুঁড়ছে। ওর মনে হলো বয়স্ক লোকটা দূরে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। একান্ত সংগোপনেই ও কামনা করলো পাগলটা পরিণত হয়ে যাক একটা নগ্ন অসি-ধারায়, যেটা ধীরে ধীরে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে ওকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে, তারপর ওকে রেখে যাবে ওর সেই অতীত আতঙ্কটার মুখোমুখি।

বিছনায় ফিরে গিয়ে চোখ বন্ধ করে সামিয়া চুপচাপ শুয়ে রইলো। কোনো একদিন ও যখন বাড়িতে একা থাকবে, প্রলোভন দেখিয়ে পাগলটাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে আসবে, এতটুকু লজ্জা না পেয়ে খুলে ফেলবে সমস্ত পোশাক, তারপর পাগলটার মুখে তুলে দেবে স্তনভার। বোঁটাটাকে খুঁটতে দেখে ও আপ্লুত আবেশে হেসে উঠবে, মদির স্বরে কাতর মিনতি জানাবে ওর শরীরে দাঁত বসিয়ে দেবার, যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তের ধারায় ভিজে ওঠে তার ঠোঁট দুটো। তারপর লোভীর মতো নিজের পিয়াসী জিভ দিয়ে লেহন করবে তার ঠোঁট দুটো।

সহসা মুহূর্তের জন্যে থেমে গেলো কুড়ুলের আঘাত, পরক্ষণেই শোনা গেলো উঠোনে হুড়মুড় করে লেবু গাছটার আছড়ে পড়ার শব্দ, যা একটু পরেই আবার হারিয়ে গেলো।

চাঁদটার কথা মনে পড়তেই সামিয়ার ঠোঁটে ফুটে উঠলো হাসির রেখা। এখন থেকে ওটা আর কোনদিনই ওকে ভয় দেখাতে পারবে না, কেননা ও যে দেখতে পেয়েছে চাঁদের অনবগুণ্ঠিত মুখ।

অনুবাদ / অসিত সরকার

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থ

লীলা মজুমদার অনূদিত

গডফাদার/মারিও পুজো ৪০·০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরী ৩০·০০

দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত

রেবেকা/দাফন দ্যু মারিয়া ৩৫·০০

লরেন্সের সেরা প্রেমের গল্প ২৫·০০

স্বপ্ন নিয়ে/এরিখ মারিয়া রেমার্ক ৩৫·০০

হিচকক/এক ডজন ১৬·০০

ভ্যালি অফ দ্য ডলস/জ্যাকলিন সুশান ২৫·০০

মমের শ্রেষ্ঠ গল্প ২৫·০০

মপাসাঁর বাছাই গল্প ২০·০০

মপাসাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প ২০·০০

মোরাভিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প ১৮·০০

ক্রীতদাস/এরিক করডার ১৫·০০

আনা কারেনিনা/লেভ তলস্তয় ২৫·০০

এইচ. জি. ওয়েলস/দ্য আইল্যাণ্ড অফ ডক্টর মোরো ১৫·০০

সিদ্ধার্থ ঘোষ অনূদিত

লু শুনের শ্রেষ্ঠ গল্প ১৬·০০

অসিত সরকার অনূদিত

পাবলো নেরুদার শ্রেষ্ঠ কবিতা ২৫·০০

ড্রাকুলা/ব্রাম স্টোকার ১৮·০০

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

হারানো ট্রেন ১৫·০০

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

ব্ল্যাক অ্যারো ১৫·০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও আশীষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

শের জঙ্গ-এর

সেদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ১২·০০

রূপক মিত্র অনূদিত

রহস্য রোমাঞ্চ ভৌতিক ১৪·০০

শৈবাল চক্রবর্তী অনূদিত

জুল ভের্ণ কিশোর অমনিবাস ১৫·০০

কিশোরদের শার্লক হোমস ১৬·০০

অ্যারাউণ্ড দি ওয়ার্লড ইন এইটি ডেজ/জুল ভের্ণ ১২·০০

আমাদের পরিবেশিত

আগাথা ক্রিস্টি

ওরা দশ জন ১৫·০০

জেমস্ হেডলি চেজ

নিখোঁজ পাখির সন্ধানে ১৫·০০